দৃশ্যকাব্য

সূচীপত্র

সম্পাদনায় : সূত্রধার ও সুনীল দত্ত

প্রচ্ছদ ও স্কেচ : প্রণব শূর

দাম : ৩·৫০ পয়সা

প্রাপ্তিস্থান

জাতীয় সাহিত্য পরিষদ

১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,

আমাদের কথা

সুনীল দত্ত

নাট্যকার পরিষদের উদ্যোগে এই নাট্য-পত্রিকা প্রকাশের শুভলগ্নে সমস্ত নাট্যকার ও নাট্যশিল্পীদের আমরা আন্তরিক অভিবাদন জানাচ্ছি।

'নাট্যকার পরিষদ' নবীন প্রবীণ সকল নাট্যকারের নিজস্ব সংস্থা। উদ্দেশ্য —পারস্পরিক আলোচনা, সভা-সমাবেশ, সম্মেলন, নাট্য প্রযোজনা, নাট্যপত্র পত্রিকা প্রকাশ ও নাট্য সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার কাজের মধ্য দিয়ে নাট্য সাহিত্য ও নাট্য প্রযোজনা ক্ষেত্রের সামগ্রিক উন্নতি বিধানের প্রচেষ্টা চালানো। পরিষদ সম্প্রতি সোসাইটিজ্ এ্যাক্ট অনুযায়ী রেজিষ্ট্রিভুক্ত হয়েছে।

'দৃশ্যকাব্য' নাট্যকার পরিষদ'এর মুখ্যপত্র। ত্রৈমাসিক এই পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে আগামী ডিসেম্বরে। সম্পাদনার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে প্রবোধবন্ধু অধিকারী ও রমেন লাহিড়ীর ওপর।

আমরা আশা করি নাট্যকার পরিষদ নাট্যামোদী সাধারণের নিকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষণা ও সহযোগিতার মাধ্যমে তার বিঘোষিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সম্যক পরিপূরণে সক্ষম হবে। নাট্য আন্দোলনের প্রসার হোক! জীবন নাটকে ধ্বনীত হোক। অভিনয়ে জীবন সমৃদ্ধ হোক।

৭ই সেপ্টেমম্বর ১৯৫৫

সুনীল দত্ত
নাট্যকার পরিষদ

বিঃ দ্রঃ— দুঃখের সংগে জানান যাচ্ছে যে 'জনক জননী' নাটকটির শেষাংশ নাট্যকার পুনর্লিখনে রত থাকায় প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল না। পরবর্তী সংখ্যায় অবশ্যই প্রকাশিত হবে।

নাট্যশালা প্রসঙ্গে

শিশিরকুমার ভাদুড়ী

আমাদের দেশে বহু শতাব্দী থেকে নাট্য ছিল কিন্তু নাট্যশালা ছিল না। ইংরাজের দেখাদেখি এই যে ফ্রেমে-আঁটা রঙ্গমঞ্চ, এর বয়স শতাব্দী পার হতে এখনও দেরী আছে। অথচ চৈতন্যদেবের জন্মেরও পূর্ব হতে প্রতি বৎসর বর্ষা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রাওয়ালার দল তাদের নট, গায়িয়ে বাজিয়ে ও বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বাংলা দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভূস্বামীদের অঙ্গনে, মেলায় ও বারোয়ারীর মণ্ডপে কৃষ্ণলীলা ও দেবীমাহাত্ম্যের পালা গেয়ে বেড়াত। তাদের সকল পালায় বলা হত পুরাণের কথা, গাওয়া হত ভক্তিরসের গান। সকল পালারই মর্মের সুর ছিল আত্মনিবেদন। ভক্তের জন্য ভগবান অসাধ্য সাধন করেন, ভক্তের পরীক্ষাও সময় সময় কম দুষ্কর হতো না। ট্র্যাজিডির স্থান যাত্রার পালায় ছিল না। পুণ্যের জয় ও পাপের ক্ষয় গল্পের পরিণামে সুস্পষ্টভাবে দেখান হতো। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, হরিবংশ এই সবের কাহিনী থেকে পালার গল্পাংশ। যাত্রার অভিনয়ের ধরণ ছিল বাঁধা। একটা সুর দিয়ে খুব আবেগের সঙ্গে কথা বলা ছিল নিয়ম। রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি, সাধক বা ভক্ত ও সাধারণ লোক সকলেরি কথা শুনলে বোঝা যেতো তিনি কে? অভিনয়ের দিকে খুব জোর লক্ষ্য কারো থাকতো না। গানই ছিল যাত্রার প্রাণ। গানের সুর বিচিত্র ও ভাবের আবেদনের উপর পালার ভাল মন্দ বিচার হতো। এই ছিল নাট্য।

নাটুকে দলগুলি নিয়ন্ত্রিত হতো একজন অধিকারীর দ্বারা। এই অধিকারীই ছিলেন একাধারে মালিক ও নাট্যাচার্য। তাঁর ছিল বিশেষ খাতির। সমাজে তাঁর স্থান ছিল উচ্চে। সময়ে সময়ে তাঁদের অনেকে ভূমিসম্পত্তি অর্জন করে ছোটখাট জমিদারও হয়ে বসতেন; কিন্তু সাধারণ নট, যাঁদের নিয়ে দল, তাঁদের বিশেষ সামাজিক প্রতিপত্তি ছিল না। তাঁরা ছিলেন জনপ্রিয় কিন্তু সমাজে কলকে পেতেন না। যদিও মাঝে মাঝে মেয়ে-যাত্রা (মেয়েদের নিয়ে যাত্রার দল—যেমন বৌ-মাষ্টারের দল) দেখা যেত। যাত্রায় দলে স্ত্রী অভিনেত্রী মোটেই থাকতো না। কিশোর বালকদের দিয়ে স্ত্রী অংশ অভিনয় করান হতো। এই সকল যাত্রার দলের লোক ও যাত্রার দলের ছেলেদের সম্বন্ধে

লোকের মনে একটা অশ্রদ্ধাই ছিল। এই সাধারণের অশ্রদ্ধার মধ্যে আমাদের থিয়েটারেরও জন্ম। সেকথা পরে হবে।

যাত্রা অনেকদিন ধরে লোকের প্রীতি আকর্ষণ করে এসেছে। আজও দেশের অধিকাংশ লোক যাত্রাকেই চেনে। থিয়েটার তাদের কাছে ব্যয়সাধ্য বিলাস। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই দীর্ঘ শতাব্দীর পর শতাব্দী যাত্রার রূপ পরিবর্তিত হয়নি। সকল দেশেই দেখা যায় আদিতে নাট্যের বিকাশ মন্দির প্রাঙ্গণে এবং নাট্যের বিষয় মানব জীবনে দৈব্য প্রভাব। পুণ্যের জয় ও পাপের ক্ষয়, চিরন্তন ভাল মন্দের দ্বন্দ্ব প্রায় অধিকাংশ জাতির নাটকে প্রতিভাত। আমাদের দেশে আদিম কাল থেকে নাটকের ও নাট্যলীলার উদ্দেশ্য ধর্মের মহিমা কীর্তন, পুরাণের উপাখ্যানের মাধ্যমে। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় ছোটখাট সুখ-দুঃখ, আনন্দ ও ব্যথা আমাদের নাট্যের বিষয়ীভূত হয়নি। আমাদের প্রাচীন যাত্রায় খালি পুরাণ-কথাই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মানসগোচর করা হতো। ইংরাজিতে যাকে বলে 'Secular Drama' আমাদের যাত্রায় কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিল না। অবশ্য 'বিদ্যাসুন্দর'কে 'Secular Drama' ধরা হলে এ কথার ব্যতিরেক ঘটে। স্বদেশী আন্দোলনে দেশে যে সাড়া পড়ে সেই সময়ে অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন নট মুকুন্দ দাস যাত্রাকে রাজনৈতিক আন্দোলনের কাজে লাগান। থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পরেই ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটকের আরম্ভ যাত্রার দুর্ভাগ্য বাংলা থিয়েটার আজকালকার যাত্রাকে অত্যন্ত প্রভাবান্বিত করেছে। এইজন্যই আজ ত্রিশ বৎসর থেকে যাত্রার দল হয়ে দাঁড়িয়েছে 'থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টি'। তবুও যাত্রাই বাংলার খাঁটি নাট্য, একেবারে বাঙালীর নিজস্ব। আমাদের জাতীয় নাট্য বলে যদি কিছু থাকে সেটী হচ্ছে যাত্রা।

ইংরাজী শিক্ষার বহুল প্রচলনের ফলে আমাদের জীবনে অনেকগুলি বিলাতী 'রকম' প্রবেশ করেছে। একটা বড় 'রকম' হচ্ছে অবসর সময় কাটাবার জন্য ক্লাব। আমাদের দেশে ক্লাব ছিল গ্রামের হরিসভা, কীর্তনের আখড়া ও অব্যবসায়ী যাত্রার দল। এ সকলে চাঁদার বালাই ছিল না। গ্রামের বা পাড়ার সম্পন্ন লোকদের মধ্যে কেউ না কেউ তাঁদের চণ্ডি-মণ্ডপে বা বৈঠকখানায় স্থান দিতেন। পান তামাকের বন্দোবস্ত গৃহস্বামীই করতেন। অথচ দলের প্রত্যেক আড্ডাধারী জোরের সঙ্গে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতেন। ক্লাব শব্দের কোন বাংলা শব্দ নেই। তবে আমাদের দেশে এই সকল আড্ডাই ক্রমে ক্লাবে

রূপান্তরিত হয়। এই আড্ডাগুলিই বাঁচিয়ে রেখেছিল—সেকালের যাত্রাও আজও বাঁচিয়ে রেখেছে আজকালকার থিয়েটার। আড্ডা পরিণত হয়েছে—এমেচার ক্লাবে। এমেচার ক্লাবেরা তাদের আদর্শ নিয়েচেন চলতি থিয়েটার থেকে। অভিনেতারা অনুকরণ করচেন জনপ্রিয় থিয়েটারের অভিনেতাদের কথা বলার ভঙ্গী, প্রবেশ ও প্রস্থানের চমক, এমন কি Mannerism, এঁরা মুখে যাই বলুন, যতই Manuscripts নাটক মঞ্চস্থ করুন, ব্যবসাদারী থিয়েটার থেকে এঁদেরই প্রেরণা। এঁদেরই কল্যাণে থিয়েটারের প্রচার বাড়ছে' থিয়েটার লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। এঁরা অভিনয় খারাপ হলে বলেন যাত্রা হচ্ছে! যাত্রাকে এঁরা অশ্রদ্ধার চোখে দেখেন কিন্তু যাত্রাকে এঁরা নষ্ট করতে পারেন নি। যাত্রা বেঁচে রইল; এখনও বেঁচে আছে এবং বেঁচে থাকবেই।

যাত্রা ও থিয়েটারে প্রধান পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য, থিয়েটার হয় মঞ্চের উপর, যাত্রা হয় আসরে। থিয়েটারের অভিনেতা ও অভিনেত্রী মনে করেন তাঁরা যে চরিত্রের রূপ নিয়েছেন ঘটনার স্রোতের মধ্যে দিয়ে সেই চরিত্রের পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেন, যতক্ষণ তাঁরা রঙ্গমঞ্চে আছেন দর্শকের সঙ্গে তাঁদের কোন যোগ নেই। লোকে দেখছে, দর্শক সামনে রয়েছে, উদ্দেশ্য দর্শকের চিত্তে আলোড়ন তোলা, সবই সত্য কিন্তু অভিনয়ের সময় তাঁদের কাছে দর্শক নেই এটাই মনকে চোখ ঠেরে বোঝাতে হয়। এটাকে সম্ভব করবার জন্যই তাঁদের দর্শক থেকে আলাদা, পিছনে পট সাজিয়ে আলোকোদ্ভাসিত মঞ্চের উপর স্থান দেওয়া হয়। যাত্রায় কিন্তু সে বালাই নেই। আমি রাজা সেজেছি, আমি যতক্ষণ কথা বলি ততক্ষণ আমি রাজা, রাজার পোষাক কিন্তু আমাকে দর্শকের সম্মুখেই তামাক খেতে বাধা দেয় না, অবশ্য সে সময় আমার বলবার কিছু নেই। এই যে দর্শকের সঙ্গে সোজা বোঝাবুঝি, 'Taking the audience into confidence' এইটে যাত্রাতে সম্ভব হয় তার কারণ আসরের মধ্যে একেবারে দর্শকের কাছ ঘেঁসে তাঁদের স্থান, দর্শকদের থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন নন। যাত্রার এই রূপটা তখনকার (উনিশ শতাব্দীর মধ্যভাগের) সাধারণের কাছে ভাল লাগল না। ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে লোকের রুচি বদলাতে আরম্ভ হল। কৃষ্ণ, রাধা, নারদ-মুনি, জটিলা, কুটিলা, আয়ান ঘোষ, রাম, সীতা দেখে এক ঘেয়ে হয়ে আসতে লাগলো। সকলেরই মনে হতে লাগল যাত্রা সেকেলে। ওটা আর চলবে না······'হেথা হতে যাও পুরাতন'। যাত্রাকে যুগের উপযোগী করে নেবার কথা তাঁদের মনে হল না। ওদিকে ধনী ও

শিক্ষিতেরা যাত্রা পাঁচালী প্রভৃতির উপর বীতশ্রদ্ধ হওয়ায় যাত্রার অধঃতন হল; কিন্তু মৃত্যু হল না। সমাজের নিম্নস্তরের প্রিয় হয়ে বেঁচে রইল। বিশেষ যাত্রা প্রথম থেকেই ছিল ইংরাজিতে যাকে বলে Folkart—Folk Drama—এর সঙ্গে সাদৃশ্য পাওয়া যাবে ইউরোপের মধ্যযুগের 'Commedia della arte' এর সঙ্গে। Commedia-র অভিনেতারা ছিল আমাদের যাত্রাওয়ালাদের মত অর্ধশিক্ষিত। নাট্যের বিষয় ছিল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন। হাস্যরস ও Sentiment ছিল এর প্রাণ। এইখানে আমাদের যাত্রার সঙ্গে এদের পার্থক্য। যাত্রায় হাস্যরসের অভাব।

গিরিশচন্দ্র আক্ষেপ করে বলেছিলেন:

'লোকে কয় অভিনয়.কভু নিন্দনীয় নয়।
নিন্দার ভাজন শুধু অভিনেতা জনে॥'

যাত্রার লোকপ্রিয়তা ছিল, প্রশংসনীয় পালার নাম হতো, ভালো গায়িয়ে বাজিয়ের নাম হতো কিন্তু সামাজিক প্রতিপত্তি হতো না। সুধী সমাজে যাত্রার দলের লোক তা সে যত বড় শিল্পী হোক না কেন আদৃত হতো না। রাজপুরুষ, সাহিত্যিক, শিক্ষক, চিকিৎসক, স্থপতি প্রভৃতির সম্মান যাত্রার কোন শিল্পী কোন দিন পেল না। তার উপরে যাত্রার ভিতরে ঢুকলো সং ঢুকলো অশ্লীলতা। সামাজিক অনাদর ও অশ্রদ্ধার মধ্যে তারা দিন কাটাতে লাগলো।

তারপর এলো থিয়েটার। ১৮৭২ সাল থেকে থিয়েটারের আরম্ভ হলো। থিয়েটারে আমরা আসর তুলে দিলাম। নটদের তুলে নিলাম মঞ্চের উপরে। সচরাচর অক্ষম চিত্রকরের আঁকা দৃশ্যপটের অগ্রভাগে দাঁড়িয়ে পাত্র পাত্রী অভিনয় সুরু করে দিলেন। এই থিয়েটার প্রতিষ্ঠার কিছু পূর্বেই দেখি ধনশালী ও কৃতবিদ্য লোকেরা যেন দেশে বিলাতী ধরনের থিয়েটার না থাকাটা খুবই লজ্জার বিষয় এই মনে করে অর্থ ব্যয় করে দল জুটিয়ে দেশের এই অগৌরব মোচন করতে লেগে গেলেন। কিন্তু বিত্তশালী লোকেরা যখন নাট্যমোদে আকৃষ্ট হলেন তখন তাঁরা একটি পেশাদারী থিয়েটার গড়ে তুলবেন এ কল্পনা একবারের জন্যও করেননি; বহু অর্থ ব্যয় করে উপযুক্ত লোককে দিয়ে নাটক লিখিয়ে যথোপযুক্ত দৃশ্যপট ও সাজসজ্জার সঙ্গে উচ্চশ্রেণীর অভিনয় ও নৃত্য-গীতের একটা বিলাতী আদর্শ খাড়া করাই তাঁদের ইচ্ছা ছিল মনে হয়। তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন জাতির মধ্যে স্থায়ী নাট্যশালা স্থাপনের পথ সহজ করতে দেশে সুনাট্যের প্রসার বাড়াতে। এই সময় দেশে যুবকদের মধ্যে নাটকের

দলও নগরে, গ্রামে সর্বত্র গড়ে উঠেছিল। এই সকল দল একটা খুব বেশী উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়েছিল এই ধনীদের নানাবিধ নাট্য আয়োজন থেকে। বড়লোকদের দিয়ে যত নাটকীয় অনুষ্ঠান হয়েছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পাইকপাড়ার বাবুদের বেলগাছিয়া নাট্যশালা। এই নাট্যশালা বাংলার নাট্যশালার ইতিহাসে সহজেই অনেকখানি স্থান অধিকার করে থাকবে। পাইকপাড়ার রাজাপ্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ নিজেদের বেল-গাছিয়ার বাগানে ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। এঁদের সঙ্গে দেশের তৎকালীন নাম করবার মত প্রায় সকল গণ্যমান্য ব্যক্তি যুক্ত ছিলেন। বেলগাছিয়া নাট্য-শালা প্রভূত অর্থব্যয়ে দু'খানি নাটক মঞ্চস্থ করেন। রামনারায়ণের 'রত্নাবলী' ও মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা'। সাহেব অতিথিদের নাটক বুঝাবার জন্য রাজারা 'রত্নাবলী'র ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই অনুবাদ করেন মাদ্রাজ থেকে প্রত্যাগত মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বাবু গৌরদাস বসাক এই অভিনয় ব্যাপারে একজন মাতব্বর ছিলেন। তিনিই রাজাদের সঙ্গে মাইকেলের পরিচয় সাধন করেন। এর ফলে মাইকেল কবি প্রসিদ্ধ লাভ করবার পূর্বেই হলেন নাট্যকার। সংস্কৃত হতে অনূদিত নাটক অভিনয় মাইকেলকে অপ্রসন্ন করল। তিনি দাবী করলেন খাঁটি বাংলা নাটক অভিনয়ের প্রবর্তনা। কিন্তু নাটক লেখে কে? মাইকেল বললেন 'আমি লিখবো।' ফল বেলগাছিয়ার দ্বিতীয় অভিনয় শর্মিষ্ঠা'। শর্মিষ্ঠার অভিনয়ে সহরে একটা হুলস্থুল পড়ে গেল। চারদিকে সখের দল থিয়েটার করতে মেতে উঠল। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কথায় 'দেশে নাট্যশালা ব্যাঙের ছাতার মত গজাইয়া উঠিতে লাগিল।' ১৮৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শর্মিষ্ঠার প্রথম অভিনয় হয়। শেষ অভিনয় কবে হয় জানা নেই। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় আর কোন নাটক অভিনয় হয়নি। রাজাদের উপর আস্থা স্থাপন করে মধুসূদন তাঁর অপুর্ব ঐতিহাসিক নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' লিখলেন কিন্তু অভিনয় হল না। মাইকেলও নাটক লিখবার কলম গুটিয়ে নিলেন।

১৮৬১ সালে রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের অকাল মৃত্যুর সঙ্গে বেলগাছিয়া নাট্যশালার সমাপ্তি ঘটল। কিন্তু বেলগাছিয়ার নাট্যশালা যে অভিনয় ও নাট্য-প্রয়োগের আদর্শ স্থাপন করল তার স্মৃতি অমর হয়ে রইল। পাইকপাড়ার দুই রাজ-ভ্রাতার কাছে বাংলার নাট্যশালা অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী। মধুসূদনের এই কথা অতি সত্য—"যদি ভারতবর্ষে নাটকের পুনরুত্থান হয় তবে ভবিষ্যত যুগের লোকেরা

এই দুই উন্নতমনা পুরুষের কথা বিস্মৃত হইবে না, ইহারাই আমাদের উদীয়মান জাতির নাট্যশালার প্রথম উৎসাহদাতা" (ব্রজেন্দ্রবাবুর বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস)।

বেলগাছিয়া নাট্যশালার ন্যায় সহরে নানাস্থানে উচ্চশিক্ষিত ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে থিয়েটারের স্থাপনার চেষ্টা হয়; কিন্তু কোথাও নাট্যশালা দানা বাঁধলো না। ১৮৭২ সালে বাগবাজারের কয়েকটি মধ্যবিত্ত যুবক নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে শেষে সত্য সত্যই বাংলা নাট্যশালা স্থাপন করলেন। সেই নাট্যশালা আজও পর্যন্ত বর্তমান। গিরিশচন্দ্র ঘোষকেই আমরা নাট্যশালার জনক বলি। এই যে নাট্যশালা স্থাপিত হয়েছে তা জনপ্রিয় সন্দেহ নেই। দেশে ভাবের বন্যা এনেছে নিঃসন্দেহ। বহুকাল ব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলনে এই নাট্যশালার দাম কম নয়। কিন্তু এ নাট্যশালা আজও সমাজের অঙ্গ বলে স্বীকৃত নয়। দেশের গণ্যমান্য লোকেরা বিনা নিমন্ত্রণে থিয়েটার দেখেন না। থিয়েটারের নট একটা সম্মানের পদবী নয়। এখনও আমাদের দেশে নট ও নাট্যের আদর হয়নি। যাত্রার বেলায় যেমন, থিয়েটারের বেলায়ও তেমনি সত্বাধিকারীর সম্মান আছে পয়সার সম্মানে—কিন্তু সাধারণ নাট্যব্যবসায়ীর খাতির নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের মধ্যে নটের ব্যবসা অবলম্বন করতে কারো মন চায় না। নট, নটী একটা আলাদা জাত, কিন্তু উঁচু জাত নয়। পঁচিশ, ত্রিশ বৎসর আগে এ ভাবটি যত প্রবল ছিল এখন ততটা প্রবল নয় সত্য, কিন্তু অন্য পাঁচটা কাজের মত থিয়েটারের কাজটা লোকে এখনও সহজভাবে নিতে পারেননি। ত্রিশ বৎসর পুর্বে একজন ধনী জমিদারের ছেলে বর্তমান লেখককে প্রশ্ন করেছিলে—"থিয়েটারের দরকার কি?" "ওগুলো উঠে গেলে ক্ষতি কি?" উত্তর—"কাব্যের প্রয়োজন কি?" সংগীতের প্রয়োজন কি? সকল ললিত-কলাই আপনাতে আপনি সম্পুর্ণ। অপ্রয়োজনের মধ্যেই তার প্রয়োজন। নাট্যশালা উঠে গেলে বুঝতে হবে জাতির জীবনীশক্তি, জাতির সৃজনীশক্তি লুপ্ত হয়েছে।

বাংলার নাট্যশালা এখনও সর্বাঙ্গীন উন্নতিলাভ করেনি। জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিদের নাট্যশালার সঙ্গে হয়ত আমাদের রঙ্গমঞ্চ এখনও অনেক বিষয়ে তুলনীয় নয়। কিন্তু জাতির পরিচয় তার রঙ্গমঞ্চে; সুতরাং জগতে বড় জাতি বলে পরিচিত হতে হলে উন্নত নাট্যশালার প্রয়োজন। নাট্যশালাকে উন্নত করতে হলে সর্বাগ্রে মনের ভিতর থেকে নাট্যশালা সম্বন্ধে যে অনুদার ভাব আছে তাকে দূর করা দরকার। নাট্যশালা জাতীয় কৃষ্টির ধারক ও বাহক। এই নাট্যমঞ্চে এসে সকল কলা মিলিত হয়। নৃত্যগীত, অভিনয়, সাহিত্য, ইতিহাস, নাট্যে সকলেরই বিকাশ। সর্বজাতির শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা নাট্যকার। সাহিত্যের মুকুটমণি নাট্য। অভিনয় ব্যতিরেকে নাট্য সম্পুর্ণ হয় না। অতএব নাট্যশালার উৎকর্ষ আমাদের জাতীয় প্রয়োজন।

অভিনেতা-পরিচালক-নাট্যকার

অহীন্দ্র চৌধুরী

আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে অভিভূত চিত্ত 'সাজাহান' অর্দ্ধশয়ান ছিলেন। মুখে মৃদু হাসি ও গভীর বেদনার সংমিশ্রণে অসাধারণ এক ভাষাহীন ভাব। বয়স একাত্তর পেরুলো। পাদপ্রদীপের উজ্জ্বল আলোর সর্গ থেকে অবসৃত স্বগৃহে অন্তরীণজীবন যাপনে বাধ্য। নটসূর্যকে তাঁর বাহাত্তরতম জন্মদিনে শুভেচ্ছা ও নীরোগ দীর্ঘায়ু জানাতে সমবেত হ'য়েছিলাম আমরা।

অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধি, জ্ঞান আর কর্মের সমন্বয়ে গ'ড়ে ওঠে যে বোধ আর প্রজ্ঞা, নটসূর্যের প্রতিভাষণে ভাস্বর হ'য়ে উঠল তারই স্নিগ্ধ উজ্জ্বল প্রতিরূপ। তিনি বললেন,—প্রাজ্ঞ জনেরা যুগ যুগান্তের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়কে উজাড় করে দিয়ে রচনা করে গেছেন যে সব অমূল্য গ্রন্থরাজি—তা পাঠ করতে করতে বার বার মনে হয়েছে কি গভীর সত্য-দর্শন আর প্রত্যয়-নিষ্ঠায় মহান তাঁদের বোধের জগত। অভিনয় শুধু তো অভিনয়ই নয়—জীবন দর্শন যেন। অভিনয়ের মধ্য দিয়ে শিল্পী ব্যক্ত করছেন জীবনের চরম ও পরম সত্য উপলব্ধিগুলিকে। অভিনেতার প্রকৃত অস্তিত্বকে ছাড়িয়ে গেছে অভিনীত চরিত্রের অস্তিত্বের সত্য। একদিকে যা মিথ্যা, অপরদিকে তাই সত্য। আপাত মিথ্যাকে সত্যের স্বর্ণোজ্জ্বল দীপ্তিতে ভাস্বর করে তোলাতেই শিল্পীর সৃষ্টিক্ষমতার সকল তাৎপর্য নিহিত। অভিনয়ের জগতের মিথ্যা আবরণটা কোনও বাধাই নয়।

এবং এ সত্য চিরকালের। কবে সেই অভিনয়কলার জন্মের প্রথম লগ্নে ঠিক এই কথাগুলিই বলেছিলেন প্রাজ্ঞ দার্শনিক সোলোন। শিল্পী-শ্রেষ্ঠ থিস-পিসের কলা নৈপুণ্য দেখতে দেখতে অভিভূত হ'য়ে গিয়েছিলেন বৃদ্ধ দার্শনিক। অভিনয় শেষে ছুটে গেলেন শিল্পীর কাছে। সম্মোহিতের মত চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। বললেন—ঐ কথাগুলো বলতে তোমার লজ্জা করলো না!

—লজ্জা কিসের! সবিনয়ে নিবেদন করলেন থেসপিস।—আমি তো অন্যায় কিছু করিনি। একটি চরিত্রের ভাবনা বাসনা কামনাকে আমার অভিনয় দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছি মাত্র।

—সেইজন্তেই তো তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল। বললেন সোলোন।
—এমন জীবন্তভাবে, এমন অভ্রান্ত নিপুণতায় তুমি ওই কাল্পনিক চরিত্রটিকে অভিনয়ের মধ্যে মূর্ত করে তুললে যে তার প্রতিটি কথা আমাকে অভিভূত করে দিল। অভিনয় দেখতে দেখতে মনে হ'ল—জীবনের কোন অতলান্ত উপলব্ধির কেন্দ্র থেকে বিচ্ছুরিত হ'চ্ছে এই অভাবনীয় সত্যের আলোক রশ্মি। এ কখনো মিথ্যা হ'তে পারে না। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হ'লে—এ তো মিথ্যা। এ সবই মিথ্যা। তুমি তো অভিনেতা মাত্র। অভিনয় করছো! তাই বলছি, তোমার লজ্জা করলো না এভাবে আমাদের ঠকাতে!...

...এই-ই হ'ল অভিনয়ের মূল কথা। সত্যকে এমনভাবে মিথ্যার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হবে যাতে করে লোকে ভুলে যায় যে, আসলে সেটা অভিনয় মাত্র। সত্য নয়! Lies like truth.

মিথ্যাকে সত্যে রূপান্তরিত করা—এই-ই হ'ল অভিনেতার সাধনার বিষয়। যে অভিনেতা যত নিপুণভাবে এই রূপান্তরকর্ম সমাধা করতে পারবেন, তিনি তত সার্থক অভিনেতা। নইলে, নিছক প্যাঁচ পোঁচ মেরে আসর জমানোর চেষ্টাটা কোনও কাজের কথা নয়, অভিনয়ের মূল কথা তো নয়ই।

—আর নাটক সম্বন্ধে সত্য কথাটা কি?

—নাটক আর অভিনয় দু-ই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সংযুক্ত। অভিনেতার কারবারই তো নাটক নিয়ে। তিনি যে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চলেছেন, তা তো নাটকেরই সত্য। নাটকের মধ্যেই সেই সত্য নিহিত। সুতরাং অভিনেতাকে সব আগে মেনে নিতে হবে, নাটকে যে কাহিনী আছে, যে চরিত্র আছে, যে বক্তব্য আছে তা সম্পূর্ণ সত্য। তাঁকে নিষ্কুণ্ঠচিত্তে বিশ্বাস করতে হবে সে কথা। 'দুর্গেশনন্দিনী' অভিনয় করতে নেমে অভিনেতা যদি তার ঘটনা, তার চরিত্র, তার স্থানকাল সব কিছুর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হ'য়ে পড়েন, তা'হলে তাঁর পক্ষে সেই নাটকটিকে, নাটকীয় চরিত্রটিকে সম্পূর্ণ সঙ্গত ও বিশ্বাস্য ক'রে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হবে না কিছুতেই। নাট্যকারের ওপর আস্থা না থাকলে কোনও অভিনেতার পক্ষেই সম্ভব নয় নাটককে বিশ্বাসযোগ্য-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা।

—কিন্তু নাটক প্রতিষ্ঠিত করবে কোন সত্যকে? কোন আদর্শ হবে নাটকের প্রাণ?

—সত্য কি? আদর্শ কি? এ বড় কঠিন প্রশ্ন। আত্মগত বোধ আর

উপলব্ধির মধ্য থেকেই এর এক একটা উত্তর খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তবে আদর্শ বলতে ঠিক যা বোঝায়, অনেকের জীবনে তা কি আর কোথাও আছে? জীবনে যা নেই তাকে নাটকের মধ্যে খুঁজতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

—তবুও একটা কিছু আদর্শ তো থাকবেই?

—হ্যাঁ থাকবে। থাকা উচিত। সে আদর্শের রূপ কি তা এক কথায় বলা কঠিন। তবে এইটুকু বলতে পারি—নাটকের মূল আদর্শ হবে মানুষের কল্যাণ।...যাতে মানুষের কল্যাণ হয় সেই চেষ্টাতেই আত্মনিয়োগ করবেন নাট্যকার। এই আদর্শবোধই হবে তাঁর অনুপ্রেরণা। তবে এই কল্যাণের স্বরূপ এক একজনের কাছে এক একরকম হবেই। যে যেমনভাবে দেখবেন, তাঁর কাছে সেই রকম। ভাল অথবা মন্দ।

—নাট্যকার, অভিনেতা আর পরিচালক—নাট্যের সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে, এঁদের কার ভূমিকা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ?

—নিঃসন্দেহে নাট্যকারের। নাট্যকার যা লিখেন তার ওপরই তো নির্ভর করে চলতে হয় পরিচালক এবং অভিনেতাকে। নাট্যকারের ভাবনা ও বক্তব্যকে পরিচালক সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করবেন। এখানে একটা পরিষ্কার বোঝাপড়া থাকা উচিত। নাট্যকার যা বলতে চান পরিচালক যদি সেটা না মানেন, নিজের মত করে চলতে চান, তাহ'লে সেটা তো অন্য আর এক বস্তু হ'য়ে দাঁড়াবে। সুতরাং নাট্যকারের সৃষ্টির ওপর আস্থা রাখতে হবেই। এবং এই আস্থা আর পারস্পরিক বিশ্বাসই নাটককে সার্থক করে তুলতে পারে সহজেই।

'নটসূর্য' এবার শরীর এলিয়ে দিলেন আরাম কেদারায়। এই সামান্যক্ষণের আলাপচারীতেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন! অথচ 'এমন দিন গেছে যখন—। যাক সে কথা।

সব কথার পরও শেষ কথা থাকে। প্রবীণ আর নবীনের দ্বন্দ্ব চিরকালের। তবুও প্রবীণের অভিজ্ঞতায় নবীনের অভিজ্ঞান লাভের কথা কে অস্বীকার করতে পারে?

তাই শেষতম প্রশ্নটি নিবেদন করলাম।

—আদর্শ আজকের জীবনে পথভ্রষ্ট যদি, সত্য যে কল্যাণের মধ্যে নিহিত সেই কল্যাণবোধ যদি বিচলিত, তাহ'লে ভরসা কোথায়? আশা কোথায়?

—আছে। আশা করার অনেক কিছুই আছে বৈকি। সে কালের নাটকের মধ্যে ছিল একটা পরিপূর্ণ 'জমজমাট' ভাব। সেকালের এক একটা প্রহসন বা কমেডি নাটক ছিল আনন্দের প্রস্রবণ। গ্রীক মতে নয়, আমাদের নিজস্ব জীবনধারায় ছিল যে 'বিয়োগান্ত' পরিস্থিতির যন্ত্রণা সে কালের নাটকে আমরা তা-ও পেয়েছি। একালের নাটকেও হয়তো আছে। কিন্তু তেমনভাবে নেই। তাই বলে একথা বলবো না যে, একালের নাটকের মধ্যে সারবান, মূল্যবান কিছুই নেই। নিশ্চয়ই আছে। যুগ থেকে যুগান্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে জীবন। সাথে সাথে পরিবর্তিত হ'চ্ছে রীতি নীতি অনেক কিছু। তবুও মূলগতভাবে যা সত্য, যা বিশ্বস্ত, যা জীবন সম্পৃক্ত তার ধারা লুপ্ত হয়নি কখনও। এইটাই হ'লো আশার কথা। আর এই আশা নিয়ে বিশ্বাস নিয়ে আজকের নাট্য ধারাও জীবিত আছে। সৃষ্টির মধ্যে আশা করার যদি কিছু না থাকে তাহ'লে মানুষ বাঁচবে কি নিয়ে!

চুপ করলেন নটসূর্য। অবসন্ন দেহ। কিন্তু সেই পুরাতন 'গুরু-শিষ্য-শিক্ষালয়'এর পরিবেশের মধ্যে এই সামন্য-ক্ষণ কাটাতে পেরেও যেন অপার তৃপ্তি পেলেন তিনি। অনাবিল হাস্যে. আন্তরিক আশীর্বচনের বাণী উচ্চারণ করে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের ঘরে প্রবেশ করলেন 'নটসূর্য'।

মনে মনে বললাম আমরা—শতায়ু ভব!*

*নটসূর্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর বাহাত্তরতম জন্মদিন উপলক্ষ্যে গৃহীত সাক্ষাৎ-কারের বিবরণ। সাক্ষাৎকারে অংশ গ্রহণ করেন ও প্রশ্ন উত্থাপন করেন সর্বশ্রী সুনীল দত্ত, ডঃ বিভূতি মুখোপাধ্যায়, রমেন লাহিড়ী, বিদ্যুৎ গোস্বামী ও প্রবোধবন্ধু অধিকারী (সূত্রধার)।

'ওথেলো' নির্দেশনার-পরিকল্পনা : স্তানিস্লাভাস্কি

অনুসরণে : বিদ্যুৎ গোস্বামী

'ওথেলো, নাটক অভিনয়ের প্রথম প্রেরণা আমি পেয়েছিলাম বিয়োগান্ত নাটকের খ্যাতিমান অভিনেতা Tommaso Salvini ও তাঁর দলের ওথেলো নাটক অভিনয় দেখে। তাঁর অভিনয় সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা না করলেও এটুকু বলতে পারি ঐ নাটক দেখার পর থেকেই আমার সব সময়ের স্বপ্ন ছিল—ওথেলো। যখন ভেনিসে আমি ও আমার স্ত্রী বহু প্রদর্শনশালায় ঘুরেছি—প্রাচীনকালের বহু জিনিস দেখেছি, প্রাচীরচিত্র থেকে বহু পোষাকের প্যাটার্ণ এঁকে এনেছিলাম। আবার প্যারীতে গিয়ে কোন এক রেস্তোঁরাতে একজন আরবীয়কে তার জাতীয় পোষাকে দেখে তার সঙ্গে আলাপ করি। আধ ঘণ্টা আলাপের পর সে আমার অত্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠে। আমি তার পোষাক সম্বন্ধে আগ্রহ দেখাতে সে আমায় তার পোষাকের ওপরের অংশটা দিয়ে দেয়। তার কাছে আরবীয়দের চলাফেরার একটা শিক্ষা আমি গ্রহণ করি। সেইদিন রাত্রে হোটেলে ফিরে এসে প্রায় সারারাত আমার কাটে আয়নার সামনে—নিজেকে একজন সুরুচীপূর্ণ Moor রূপে প্রতিষ্ঠা করতে।

তারপর মস্কোয় ফিরে এসেই আমি ওথেলো নাটকের প্রস্তুতিতে হাত দিলাম। কিন্তু ভাগ্য আমার পথে বাধা দিল। একটার পর একটা বাধা আসতে লাগল। প্রথমতঃ আমার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তাই Desdemona'র পার্ট আর একজন সৌখীন অভিনেত্রীকে দিতে হল। আবার তার মন্দ ব্যবহারের জন্যে এমন একজনকে পার্টটি দিতে হল যে কোনদিন মঞ্চে অভিনয় করেনি। মঞ্চ ভাড়া করে মহলা দেবার মত আর্থিক ক্ষমতা তখন আমাদের ছিল না। তাই আমার বাড়িতেই মহলা চলতে লাগল। একদিকে অসুস্থা স্ত্রী—অপর দিকে সারারাত মহলার জন্যে প্রত্যেককে চা পরিবেশন, পরিচারিকার বিরক্তি ইত্যাদি অবস্থার মধ্যে মহলা চালাতে হয়েছিল। আমাদের দলে Iago করার মত অভিনেতা না থাকাতে বাইরে থেকে একজন অভিজ্ঞ অভিনেতাকে আনতে হয়েছিল। ড্রেস রিহার্সালের দিন Iago'র

'ওথেলো'র ভূমিকায় 'স্তানিস্লাভস্কি' (ভিতরের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)

আলোক শিল্পী

তাপস সেন

ফটো : ষ্টুডিও মার্বেন

'বাল্মিকি প্রতিভা'য় রবীন্দ্রনাথ
ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

রিজিয়া : তারাসুন্দরী

নট-সূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী

সঙ্গে মহলার সময় আমার ছোরার আঘাতে তার হাত কেটে গেল। অবশ্য এ ঘটনার কারণ আমার অভিনয়ে স্বাভাবিকত্ব। কিন্তু অভিনয়ের সময় মানসিক উত্তেজনার এ ধরনের অসংযমী আচরণের আমি নিন্দা করি। আবার আমার কোন এক বন্ধু মহলা দেখে আমাকে বলেছিলেন, "সম্রাটের প্রাসাদ থেকে তাঁর কন্যাকে অপহরণ করছে একজন তাতার, মস্কোতে এর পরিবেশনের ফলাফলের কথা ভেবেছেন কি?" এরূপ অনেক রকমের বাধার সম্মুখীন আমাকে হতে হয়েছিল। এমন কি শরীরকে উপেক্ষা করেও আমাকে পরিশ্রম করতে হয়েছিল। দীর্ঘ মহলার পর আমার মনে হত যেন হাঁপানী রুগীর মত আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। এইভাবে অনেক কষ্টের পর আমি 'ওথেলো' নাটক মঞ্চে পরিবেশন করি। কৃতকার্য হয়েছিলাম কিনা জানি না তবে নিজেকেই নিজে অনেক সমালোচনা করেছিলাম। কিন্তু পত্র-পত্রিকার দৃষ্টি ভীষণভাবে আকর্ষণ করেছিল। একজন সমালোচক বলেছিলেন, "Shakespeare-এর বিয়োগান্ত নাটক এভাবে প্রযোজিত হতে মস্কোর দর্শকরা কখনো দেখেনি।" Pushkin-এর ভাষায় Othello ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন না—বরং বিশ্বাসী ছিলেন—আমি Othello-কে সেই ভাবেই দেখেছি।

'Othello'-র অভিনয়ে কোন দৃশ্যকেই বাদ দেওয়া চলে না। কেননা দৃশ্যের পর দৃশ্যের অবতারণার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে নায়কের ক্রমবর্ধমান পর্বতপ্রমাণ বৃত্তি। তাই সামগ্রিক অংশটাই ছবির মত নায়কের সামনে থাকা উচিত। অনেক সময় Othello'র চরিত্রাভিনেতাকে স্বাভাবিক চাপ না দিয়ে তার বৃত্তির অভিজ্ঞতাকে আনবার চেষ্টা করেছি অভিনব কায়দার মাধ্যমে। যেমন চিত্রকর তুলির সাহায্যে রং থেকে রং-এ গিয়ে অর্থাৎ ফিকে গোলাপী থেকে ঘন সবুজ—পরে ফিকে নীল—তারপর লাল—এইভাবে চিত্রটিকে সাজিয়ে effect সৃষ্টি করে, নাটকের ক্ষেত্রে সেরূপ অভিনবত্বের প্রয়োজন। যেমন ভর্ৎসনার দৃশ্যটি অনেকগুলি পাতায় সীমাবদ্ধ। অতএব সেখানে মাত্র দুটি অংশ বেছে নিতে হবে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করার জন্যে। আর বাকী অংশটাতে শুধুমাত্র সংযোগ রক্ষা করা বা সুরটা বয়ে নিয়ে যেতে হবে। তা না হলে সম্পূর্ণ অংশটাই ঐভাবে অভিনয় করা অত্যন্ত কঠিন হবে। আর তাতে করে ফলও ভাল হবে না! যে সময়টা অভিনেতা সংযোগ রক্ষামাত্র করে চলেছেন—সেই সময়ে ক্রমশঃ ক্রমশঃ তার ভাবের গভীরতাও বেড়ে চলেছে। Desdemona'কে অভিযুক্ত করার জন্যেই আমি এই দৃশ্যটিকে চালিত করব।

Othello রুমালটির জন্য Desdemona-কে ভয় দেখাচ্ছে—তার হাতদুটো ধরে মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে—এই আশায় যে Desdemona তার নির্দোষিতা প্রমাণ করবে। Othello অত জোর দেবে কেননা সে শুনতে চায় যে সে ভুল করে অপবাদ দিচ্ছে। যখন পরিষ্কার হয়ে গেল যে রুমালটি হারিয়ে গেছে—সে সেটা পেতে চায়, ভয় দেখিয়েও পেতে চায়—কেবলমাত্র হতাশা থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না তারা মাত্র গতকাল পৌঁছেছে। আর আজই Desdemona সম্বন্ধে আবিষ্কৃত ঘটনা। সেই সময় সূর্য অস্ত যাচ্ছে, Othello চলে গেল Tower-এ—সেখানে সন্ধ্যা নেমে এল—তারা দেখা গেল আকাশে। অতএব প্রশ্ন আসে—কখন Othello Desdemonaকে দেখতে গিয়েছিল (রুমাল দৃশ্যে)। তিনি কি পরের দিন Desdemona'র কাছে গিয়েছিলেন—অর্থাৎ সারারাত কি তিনি ছিলেন না, তাদের দুজনের আরেকটি সাক্ষাৎ নিশ্চয় হয়েছিল; অতএব এই দৃশ্যটিকে সেই দিনেরই সন্ধ্যার ঘটনা না-করা ঠিক হবে কি? অবশ্য এখানে আরেকটি সন্দেহ জাগে—শেষ অর্থাৎ মৃত্যুর দৃশ্যের আগে Desdemona'র সঙ্গে আরও একটি রাত্রের দৃশ্য; আবার একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি করা কি ঠিক হবে?

আমি এ ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্তে কিছুতেই আসতে পারি না—কখনও মনে হয় ঠিক আবার কখনও মনে হয় ঠিক না।

আমার মনে হয় প্রতিজ্ঞার পর সন্ধ্যার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে Othello হঠাৎ খুব দুঃখিত হয়ে উঠলেন। তারপর প্রথম মুহূর্ত কেটে যাবার পর মনের গতি বিপরীত দিকে যেতে শুরু করল। যে মন নিয়ে তিনি Desdemonaকে ভালবাসতেন—সেই সুরই আবার বেরিয়ে আসতে চাইল এবং তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা শুরু করল যে Desdemona নির্দোষ। সেই সময়টা নিশ্চয় সন্ধ্যা অথবা রাত্রি হওয়া উচিত। কেননা বিপরীতে মনের গতি আসতে কিছু সময় চাই। অবশ্য Shakespeare দৃশ্যটা শুরু করেছেন বিদূষককে দিয়ে—অতএব সন্ধ্যার দৃশ্য হওয়া সম্ভব নয়—কিন্তু আমরা বিদূষকের ব্যাপারটা না ঘটিয়ে সন্ধ্যার দৃশ্য করাতে অসুবিধে নেই।

অবশ্য আর একটি অসুবিধে আছে। যে দৃশ্যে Desdemona'র ঘরটি আদেশে নির্মিত হয়েছিল এবং আমি জানিনা কি ভাবে, কেমন করে সেই

দৃশ্যেই হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল। অতএব উভয় দৃশ্যই শয্যাকক্ষে ঘটা দরকার। আমি বুঝি যে এটা ঠিক না; কিন্তু উপায় নেই।

যাহোক এটাকে এভাবে করা যায়—Desdemona'র ঘরটি গোলাকার—এই দৃশ্যে আমরা একই ঘরের বিভিন্ন অংশ দেখাতে পারছি! একই ঘরে
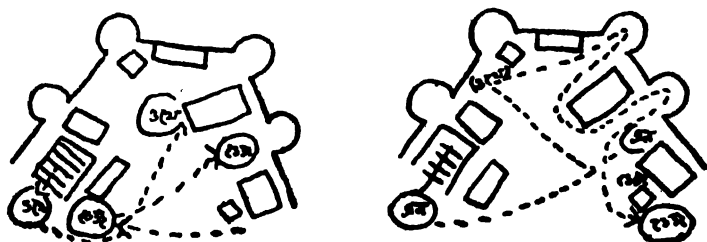
ওথেলো ও ডেসডিমোনার অভিনয়স্থল।

কেবলমাত্র যে সিঁড়িটা ওপরে উঠে গেছে—সেটা দর্শকদের ডান দিকে না হয়ে বাঁদিকে হবে এবং উপরে ওঠার সময় অভিনেতৃবৃন্দ দর্শকদের দিকে তাকাবে—আবার শেষ অথবা পঞ্চমাঙ্কে দর্শকদের দিকে পিছন করে উঠবে। দৃশ্যটি ভিন্নভাবে সাজাতে হবে। চাঁদের আলোটা দেখা যাবে যখন Desdemona শুতে যাবার সময় জানালাটা খুলবে।

নাটকের সঙ্গে সঙ্গে যদি এগিয়ে যাই দেখা যাবে Otheilo'র মানসিক আঘাত তীব্র থেকে তীব্রতর হতে চলেছে। অবশ্য Desdemona যেন পূর্বের মত আর নেই—স্বর্গীয় সুষমা সে যেন হারিয়ে ফেলেছে—সে যেন অপরাপর স্ত্রীলোকদের মতই কুহেলিকার জাল বুনেছে। এই কথাগুলো আর আর সকলের মতই Othelloকে আঘাত দিচ্ছে এবং তার প্রেম নষ্ট হতে বসেছে। অর্থাৎ সে ভুল করেছে। যা ছিল স্বপ্ন—যা ছিল তাঁর রঙীন কল্পনা—সবই যেন হতাশায় পর্যবসিত হয়েছে। ওপরে গিয়ে Desdemona'র শয্যায় অংশ গ্রহণের প্রশ্ন যেন নেই। গত রাত্রির ঐ পবিত্রতম প্রেম কোথায় যেন চলে গেছে ঝরা ফুলের মত। Desdemona'র প্রেম যেন প্রেম ছিল না—ছিল মোহ। "সে আর সকলের মত"—এই বাক্যটি Othello'র মনে অহর্নিশ জ্বালার সৃষ্টি করে চলেছে। শয্যাকক্ষ থেকে, মানুষের কাছ থেকে দূরে বহুদূরে চলে যেতে যেতে তিনি একটা দরজা খুললেন। অন্ধকারের মাঝে সারারাত সিঁড়িতে বসে কাটালেন। কিন্তু Iago ঠিক তাকে লক্ষ্য রাখলেন। ভোরবেলা যখন সবেমাত্র সূর্যের আলো পিছনের ছোট জানালা দিয়ে প্রবেশ

করেছে, Iago আস্তে আস্তে এসে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর সঙ্গে কথা শুরু করলেন। তিনি এখন নতুন পন্থায় চলা শুরু করলেন। তিনি Desdemona'র পক্ষ অবলম্বন করে তাঁকে ক্ষমা করার অনুরোধ জানালেন। Othello অবশ্য Desdemonaকে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করতেন না বলেই—Iago'র কথা শুনে আরও জ্বলে উঠতে লাগলেন। Desdemona যে অপর সকলের মত—একথাই জানা বা স্বীকার করে নেওয়া Othello'র পক্ষে সাংঘাতিক আঘাত। তার ওপর সে অন্যায়কারিণী একথা ভাবতে তাঁর পায়ের নীচে মাটি যেন সরে যেতে লাগল।

এখানে এখন মনে রাখা উচিত যে Othello—একেবারে Iago'র কব্জার মধ্যে। Iagoকে এখানে আমার যা মনে হয়েছে—যে মানুষের সকল রকম অপরাধে ভরা, প্রবৃত্তির জঘন্যতম বিকাশকে চাপা দিয়ে অভিনয় করে চলেছেন—প্ররোচিত করে চলেছেন। অবশ্য তাঁর মধ্যে সাহস আছে নিপুণতা আছে। তিনি মানুষকে হাসাতে জানেন,—প্রয়োজনে গান গাইতে পারেন—গল্প বলতে পারেন এবং পানভোজেরও আয়োজন করতে পারেন। যা কিছু করেন সমস্ত শক্তি দিয়েই করেন। কি মদ্যপানে, কি রসাল আলাপে, কি যুদ্ধক্ষেত্রে এবং এমনকি প্রতিহিংসা গ্রহণে—তাঁর যথাশক্তি চেষ্টা তিনি করেন। তাই Roderigoকে ক্রীতদাস এবং বিদূষকে পরিণত করতে—Othello'র সঙ্গে বিড়াল ইঁদুরের খেলা খেলতে তাঁর কোন অসুবিধা হয়নি। সেজন্য Cassioকে অসুবিধায় ফেলাতে Cyprus-এ রাজকর্মচারীদের সঙ্গে খিটিমিটিতে আমার পরিচালিত Iago সন্তুষ্ট নয়। তিনি দ্বীপবাসীদের জাগাতে চান, Othelloকে তাঁর ইচ্ছাধীন ক্রীতদাসে পরিণত করতে চান। কিন্তু Iago এসব চান মানে এই নয় যে তিনি শয়তানের চূড়ান্ত—আসলে তিনি শিল্পী, অভিনেতা, প্ররোচনার কাজে—অতি নিপুণ। তাই তিনি সুদূর কল্পনাপ্রয়াসী। Othello যখন ঘৃণায়, ক্ষোভে, মূর্চ্ছায়, শুকিয়ে যেতে লাগলেন—Iago তখন তা লক্ষ্য করে উপভোগ করতে লাগলেন।

Othello যখন ভাল হয়ে উঠলেন—Desdemona তাঁর সামনে তখন নতুনভাবে উপস্থিত—সে সকলের চেয়ে খারাপ। এই দৃশ্যের বক্তব্য এইটাই।

Cassio'র সঙ্গে দৃশ্যের পর Othello Desdemonaকে ঘৃণা করতে লাগলেন—প্রতিহিংসার শুরু সেখান থেকেই। তারপর থেকেই শুরু হল উদ্‌ঘাটন পর্ব।

এখন Desdemona ও Emilia'র দৃশ্যটা ধরা যাক। Cassio-কে ক্ষমা করার জন্য বার বার Desdimona'র অনুরোধ আমার ভাল লাগেনি। কারণ আমি দেখেছি Desdemona অন্যায় মুহূর্তেই ঐ অনুরোধটি করেছেন বার বার। তেমনিই Othello চরিত্র রূপায়ণে প্রবৃত্তি বা ঈর্ষাপরায়ণতার আশ্রয় সব সময়েই নেওয়া উচিত নয়। ফলে হয় কি, দর্শকরা নিজেকেই প্রশ্ন করেন—"কেনরে বাবা, Cassio সম্বন্ধে ক্ষমা চেয়ে নেবার আর সময় পেলে না?"

সেজন্যই Othello'র চরিত্রাভিনেতাকে এমন মুহূর্তের সৃষ্টি করতে হবে যে Desdemona ঐ প্রস্তাবটি রাখতে পারে। দ্বিতীয়তঃ কল্পনাশ্রয়ী হতে হবে আমার মত। আমার যদি Desdemona'র মত অবস্থা হয়। যে তরুণীটি বিপত্নীক পিতার সঙ্গে পরিচারিকাবেষ্টিত হয়ে বান্ধবী সমভিব্যহারে দিন কাটাচ্ছিল—তার পক্ষে সেই প্রাসাদও কত একঘেঁয়ে হয়ে উঠেছিল। তারপর হঠাৎ হল তার গোপন বিবাহ—স্বামীকে দিতে হল বিদায়। পরের দিন সে দেশ ছেড়ে যাচ্ছে—আক্রান্ত হল এক প্রবল ঝড়ের আবর্তে—এক দ্বীপে এসে নামল—স্বামীর সংবাদ পাবার জন্য বুভুক্ষিত অন্তরে অপেক্ষা করতে লাগল। সর্বশেষে স্বামীর সঙ্গে আবার মিলন এবং পরের দিন দেখলেন যে তিনি ঐ দ্বীপের অধিশ্বরী। বিরাট ভোজের আয়োজন হল। তারপর প্রথম রজনীর প্রেমের পালা শেষ হল। পরের দিনই তার কাছে আর্জি আসতে লাগল সাহায্যের কারণ সকলেই জেনেছে তার স্বামীর ওপর তার ক্ষমতার কথা। যা কিছু ঘটছে তাতেই তার আনন্দ—যেন আরব্য উপন্যাসের মত তার দিন যেতে লাগল। সে যেন নতুন জন্মের আস্বাদ পেল। সেজন্য নিজের ক্ষমতা আস্বাদনের নেশা তার মাঝে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। দ্বীপের অধিশ্বরী হিসাবে—নারী হিসাবে তার নিজস্ব সত্বার উপলব্ধির নেশায় সে উদ্দাম হয়ে উঠল।

তিনি কি আমায় অস্বীকার করবেন? এই সামান্য কাজটুকুও কি আমার জন্য তাঁর করা সম্ভব হবে না? তার এই প্রথম উদ্যমে প্রত্যাখ্যাত হলে তার অনুচরবর্গের কাছে তার সম্মান যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হবে।

কিন্তু আমি এর সঙ্গে আরও কিছু গভীরতর ব্যাপার যোজনা করে দিতে চাই। সেটা আমার কল্পনার ছবি। Desdemona কেবলমাত্র যে ভালবাসার ব্যাপারেই Othello'র সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করেছে তা'ত নয়; অনেক ব্যাপারে সুযোগ সুবিধে মত দেখা করেছে তাঁকে পরামর্শ দেবার জন্যে। স্ত্রীলোকেরা

পুরুষের ওপর তাদের ক্ষমতা আরোপ করতে ভালবাসে—পুরুষদের উপদেশ দিতে ভালবাসে, তাদের ভদ্র এবং দয়ালু করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে। আমি ধরে নিতে পারি যে Desdemona বই দিয়েছে Othelloকে পড়ার জন্যে। আমি দেখতে পাচ্ছি যেন ঐ বৃহদাকার ব্যক্তিটি সারারাত বসে আছে এবং স্কুলের ছাত্রের মত বাড়ির কাজে ব্যাপৃত পরীক্ষার্থী হিসাবে। না হলে পরদিন বোধ হয় Desdemona কথা বলবে না। বহু জিনিস তাঁর শেখার আছে স্ত্রীর কাছে, কেননা যোদ্ধজীবনে তিনি অনেক কিছুই শিখতে পারেন নি। ভালবাসা, বিবাহ, সহবাস, জনগণের প্রতি ব্যবহার, ভদ্রতা এবং অপরাপর বহু প্রশ্ন—বিশেষ করে Venice সভ্যতার অনেক আদবকায়দা তাঁর জানার আছে। ধর্ম সম্বন্ধে ত প্রশ্ন আছেই। Othello অবশ্য খ্রীষ্টান ছিলেন—কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে বিশেষ কিছুই জানতেন না। Desdemona—যদিও গোঁড়া ক্যাথলিক—তবুও অনেক কিছু স্বামীকে শেখাতে পারে।

কিন্তু অপরাপর দৃশ্যে আমি কি দেখি? স্ত্রীলোকের হাতে চুমু খেতে Othello শেখেননি—যেমন শেখেননি পার্থিব কায়দায় নমস্কার জানাতে। তাঁর চরিত্রে অনেক পাশব বৃত্তির প্রাধান্য আছে এবং Desdemona সেগুলোকে শোধরাবার ব্যাপারে খুবই যত্নবান। কি করে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে হয়, কিভাবে তাদের হাতে চুমো খেতে হয়—স্ত্রীর কাছে শেখার সময় Othello'র মাথার ঘাম পায়ে এসে পড়ে।

তিনি এসব পছন্দ করেন—যেহেতু তাঁর স্বভাবটি মিষ্ট ও সৎ। তাছাড়া ভদ্র ব্যবহার শেখায় তাঁর খুব আগ্রহ। এইভাবে Desdemona হয়ে উঠলেন তাঁর শিক্ষয়িত্রী আর সেজন্যেই সে প্রস্তাব করল যে Cassioকে ক্ষমা করতে হবে।

মানবিকতা থাকা উচিত এবং যদি কেউ বিশ্বস্ত হয় তাকে ক্ষমা করা উচিত। Desdemona'র কাছে সৈনিকোচিত শৃঙ্খলা বা নিয়মকানুনের কোন মূল্য নেই। আমি মনে করি যে Othelloকে বিরক্ত করার পেছনে একটা বিশেষ যুক্তি হচ্ছে এই যে সে প্রভাবান্বিত হয়েছে নিজেকে স্বামীর শিক্ষয়িত্রী মনে করার জন্যে।
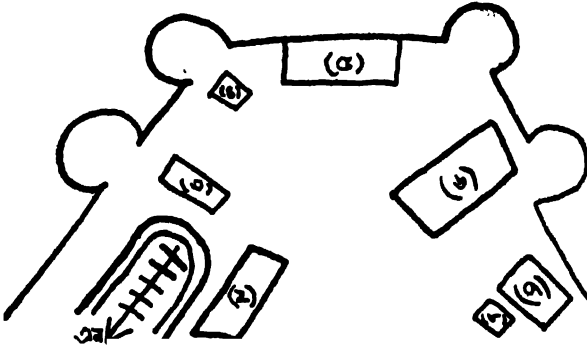
শয্যাকক্ষ

১। সিঁড়ি। শেষ অঙ্কে এটা ডানদিকে থাকবে এবং যারা উঠবে দর্শকদের দিকে তাদের পেছনটা দেখা যাবে। এই দৃশ্যে—যেহেতু বাঁদিকে যারা উঠবে দর্শকদের দিকে সামনে করে উঠবে।

২ ও ৩। বাক্স—Desdemona'র পোষাক-পরিচ্ছদ।

৪। ডেস্কের উপর Bible ও পাশে একটি ক্রুশে বিদ্ধ খৃষ্টের প্রতিমূর্তি।

৫। থালাবাসন রাখার আলমারী বা তাক। (Turkish)

৬। সরু লম্বা নীচু আসন (Turkish)—উপরে ঢাকা—ঢাকাটার এক কোণে লাল ভেলভেটের ওপর সোনালী এমব্রয়ডারী কাজ করা।

৭। আয়না সমেত পরিচ্ছদের table.

৮। রিভলভিং চেয়ার (Turkish).

Desdemona—আমার রুমালটা কোথায় হারালাম—Emilia?

[Desdemona রাতের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। রাত্রের নয় আবার দিনেরও নয় এমন একটা পোষাক পরে আছে। চুলটা বাঁধাই আছে। Emilia গহনাগুলো বাক্সে রাখছে। Desdemona ধীরে কথা বলছে Emiliaকে নিশ্চয়ই Othello'র কথা—কেননা স্বামীর জন্যে তার হৃদয়মন ভরপুর। কথাবার্তার মাঝখানে মনে পড়ে যায় রুমালের কথা। সে Dressing table, divan বা সিঁড়ির কাছে রুমালটাকে খুঁজলো। Emilia একটুও খোঁজ করল না। সে মনোনিবেশসহকারে কাজের ভাণ করল] *—চিহ্ন থাকলে থামতে হবে।

Emilia—কৈ আমি তো দেখিনি।

Desdemona—*বিশ্বাস কর—এর চেয়ে যদি অর্থের থলি হারাতাম, কিছু হত না।* * কিন্তু আমার প্রিয়তমের মনে কোন কপটতা নেই—ঈর্ষা নেই—তবে যদি কেউ সেটা জাগিয়ে দেয়—*

Emilia—তাঁর মনে ঈর্ষা নেই ?

[Emilia'র জবাবটা Desdemona'র কাছে এত মূল্যবান ছিল যে সে আবার রুমালটা খুঁজতে লাগল। যাতে করে Emilia'র কাছে প্রমাণ করা যাবে যে তার স্বামী ঈর্ষাপরায়ণ নয়]

Emilia—শোন—বোধহয় আসছেন।

[Emilia কান পেতে শোনে—সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়। ছুটে এসে Desdemonaকে জানায়। তার চলাফেরা অত্যন্ত সন্ত্রস্ত এবং উত্তেজনাপূর্ণ। বিবাহের প্রথম দিকে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সর্বসময়ের যে আকর্ষণ থাকে বলে Emilia বিশ্বাস করে—তার ভাল লাগে না তাই Othelloকে দিনের ব্যবহারের জন্যে। স্বামী আসছেন শুনে Desdemona একটু বেশবাস সেরে নেয়।]

[Emilia সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে—Othello ঢুকলেই যাতে নেমে যেতে পারে—কারণ তার ইচ্ছে নয় স্বামী-স্ত্রীর মিলনে বাধা সৃষ্টি করার।]

Desdemona—দেখ আমি ওঁকে কিছুতেই ছাড়ব না—Cassioকে ক্ষমা না করা পর্যন্ত। [এগিয়ে এলেন সিঁড়ির মুখে]

[Othello'র প্রবেশ] [Othello'র আসাটা একটু দেরী হবে। কেননা তিনি অত্যন্ত হাসিমুখে ও সহজভাবে ঢুকবেন—যাতে করে স্ত্রী তাঁর মনের ভেতরকার খবর কিছু না ধরতে পারে]

একি! প্রিয়তম! [দেয়ালে ঠেস দিয়ে জিজ্ঞাসা করে। দু'জনের মুখে মিলনের ঈষৎ হাসি—দু'জনে কিছুক্ষণ দু'জনের দিকে তাকিয়ে।]

Othello—হ্যাঁ প্রিয়তমে! (জনান্তিকে) ওঃ! কি গোপনতা!

[তিনি আনন্দমুখর থাকতে চেষ্টা করছেন। Desdemona তাঁকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে। Othello'র মুখ থাকে দর্শকের দিকে।]

কেমন আছ প্রিয়ে ? [Desdemona আলিঙ্গনাবদ্ধ নিশ্চল। Othello সে আলিঙ্গন সহ্য করতে পারছেন না। কিন্তু ধরা পড়ার ভয়ে নিজেকে তা থেকে মুক্ত করে নিতেও পার্চ্ছেন না। তাঁর বিষাদ মুখ দর্শকরা দেখছেন। অবশ্য এখানে জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করলে—কৃত্রিমতাটা বোঝা যাবে—

যেটা এই মুহূর্তে প্রয়োজন। Emilia অবশ্য Othello ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে গেছে। কিছুক্ষণের পর দু'জনেই মুক্ত হলেন আলিঙ্গনপাশ থেকে। Desdemona খুব খুশী। ঝর্ণার ধারার মত উচ্ছলতায় ভরা—তাঁকে টেনে এনে বসালো আসনে। (ছবিতে ১নং থেকে ৬নং-এ) কিন্তু যখন Desdemona'র চোখ স্বামীর মুখ থেকে সরে অন্যদিকে যাচ্ছে—তখনই Othello'র সমস্ত অন্তর নিঙড়ে জ্বালার প্রকাশ দেখা যাবে তাঁর মুখাবয়বে।]

Othello—কেমন আছ প্রিয়ে? [Othello'র হাতে চুমো খেয়ে হাঁটুতে গড়িয়ে পড়ে Desdemona উত্তর দেয়।]

Desdemona—অত্যন্ত ভাল— [Othello হাতটা সরিয়ে নেবার চেষ্টা করে।]

আচ্ছা, প্রিয়তম! [কিছুক্ষণ বাদে]

Othello—তোমার হাতটা দাও। * আমার হাতটা ভিজে উঠেছে।

[কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। Desdemona সোফায় পা তুলে দিয়ে বাবু হয়ে বসেছে এবং তার স্বামী তার হাতটা ধরে তার দিকে তাকিয়ে আছেন, একটু প্রফুল্লিত হবার চেষ্টা করছেন। একটা ভুল বোঝাবুঝি বিরাজ করছে। অবশ্য এই দৃশ্যের আরম্ভে অবশ্য একটা সাধারণ সাবধানবাণী আমি দিতে ভুলে গেছি। Othello এবং Desdemona—এখানে তাদের নানাভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ করবে নানারূপ action-এর মাধ্যমে। Othello'র ঈর্ষা এবং Desdemona'র ভয় ও স্তব্ধতা, এসবের action থাকবে। অবশ্য উভয়ে উভয়কে না দেখিয়ে দর্শকদের কাছে সেগুলো উপস্থিত করবেন। আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। এরপর স্বামীর হাতে চুমো খেল Desdemona. Othello একটা তপ্ততার স্পর্শে চঞ্চল হয়ে উঠলো। তিনি হাতটা নিয়ে যেন পরীক্ষা শুরু করলেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। তাঁর চোখদুটো যেন কি খুঁজছে। কিছুক্ষণ ধরে স্ত্রীর হাতটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে নানারকম চিন্তা আসে তাঁর মনে। তারপর হাতের সৌন্দর্যের প্রশংসা করে—তারপর Othello দেখেন যে তাঁর স্ত্রীর হাতটা ঘেমে উঠেছে। আরও চিন্তায় তাঁর মন ভরে উঠে—আরও প্রশ্ন তাঁর মনে জাগে—]

Desdemona—দুর্বলতা বা দুঃখ কিছুই আজও আমাকে স্পর্শ করেনি।

Othello—অন্তরের উদারতা তাতে বৃদ্ধি পায়।

[Othello গভীর ভাবের সঙ্গে কথাটা বলেন। যেন মনে হয় তিনি

Desdemonaর অন্তরের অন্তস্থল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছেন। এখানে কিন্তু দর্শকরা তাঁর মনের অবস্থা অনুভব করবে। সেজন্যে Othelloকে দর্শকদের সামনে এমন কতকগুলি অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে হবে—যা দেখে মনে হবে যেন তিনি কিছুতেই মনের ভাবকে চেপে রাখতে পারছেন না। নানাভাবে এই অভিব্যক্তিগুলো দর্শকদের সামনে তুলে ধরা দরকার। এমন কতকগুলো কথা বলা দরকার নিচু স্বরে যেগুলোর অর্থও তাঁর স্ত্রীর কাছে খুব পরিষ্কার হবে না।]

—তোমার হাতগুলো ঘেমে উঠেছে।

তোমার কোথায় যেন কে আছে যে বিদ্রোহী হয়ে উঠে এই সুন্দর হাতটিকে

ভিজিয়ে দিচ্ছে—এত সুন্দর ও সরল হাত—উপাসনা ও উপবাসে সেই বিদ্রোহীকে।

শাসন করতে হবে।

Desdemona—তুমি সেকথা বলতে পার। [উদাসভাবে]

এই হাতই তোমার কাছে আমার

মনকে নিবেদন করেছে।

Othello—সহৃদয় হাত : [বিদ্রূপের সুরে স্ত্রীর অগোচরে]

তাই শুধু হাতই আছে—অন্তর নেই।

Desdemona—কি জানি! যাকৃগে তোমার প্রতিজ্ঞার কথা মনে আছে?

[কঠিন ক্ষণ উভয়ের পক্ষে। যদি অবশ্য Othello মনের ভাবকে লুকিয়ে রাখতে পারেন স্ত্রীর দৃষ্টির আড়ালে—দর্শকদের মনে কোন ধাক্কা লাগবে না। না হলে Desdemona'র অবস্থা খুব সঙ্কটজনক—তাকে অন্ততঃ স্বামীর অভিব্যক্তি না দেখার ভান করতে হবে। এখানে Othello'র অভিনয়ের সাহায্য তার দরকার। অন্ততঃ এই দৃশ্যে যে কোনরকম মানসিক উত্তেজনায় না এসে পৌছয়।]

Othello—কিসের প্রতিজ্ঞা বল ত? [কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। কারণ Othello জানে তাঁর স্ত্রী কি বলবে।]

Desdemona—Cassioকে ডেকে পাঠিয়েছি

তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে। *

[এমন আগ্রহভরে বলবে—যেন দর্শকরা মনে মনে বলে ওঠে—আহা এখন বললে কেন?]

Othello—ইস্—কি সর্দি—রুমালটা দাও তো—

[আবার স্তব্ধতা। Othello'র চোখে পরীক্ষার দৃষ্টি। কিন্তু সর্দি সম্বন্ধে কিছু অসংলগ্ন কথা বলে চলল।]

Desdemona—দিচ্ছি—

[সে লাফিয়ে ওঠে ও dressing table-এর দিকে এগিয়ে যায়। Othello কল্পনা করছেন—এইবার বোধহয় রুমালটা পাওয়া যাবে—তাঁর সব সন্দেহের উপশম হবে। সেজন্য তিনিও পিছন পিছন গেলেন। রুমাল পাওয়া গেলে আবার তাঁর জীবনে নেমে আসবে গতকালের শান্তি, প্রেমের বন্যা। কিন্তু হায়! আশার ঝলকানি বিদ্যুতের মত তাঁর মনকে ছুঁয়ে চলে গেল—এক প্রচণ্ড হতাশা বজ্রের ন্যায় আঘাত হানল তাঁর বুকে। রুমালটা সেখানে নেই—অর্থাৎ সর্বৈব সত্য। কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। তিনি যেন ক্রমশঃ শুকিয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছেন। আর তাঁর পক্ষে মনের অবস্থা চাপা সম্ভব হল না। আবার স্তব্ধতা। নীচের কথাগুলো স্পষ্ট করে বলতে পারলেন না।]

Othello—যে রুমালটা আমি তোমায় দিয়েছিলাম। [প্রাণহীন ভাষায় কথাগুলো উচ্চারণ করে গেলেন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন স্ত্রীর দিকে।]

Desdemona—হ্যাঁ—সেটাই পাচ্ছি না। (হতবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে)

Othello—পাচ্ছি না— (অত্যন্ত নিম্ন স্বরে)

Desdemona—না—প্রিয়তম—

Othello—এটা অন্যায়। * এই রুমালটা [সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে]

একজন মিশরীয় আমার মাকে দিয়েছিল।

[এরপর রুমালটা বার করার জন্যে নতুন উপায় আবিষ্কার করলেন Othello, তিনি রুমালটির গোপন কাহিনীর অবতারণা করে বললেন যে ওটা যাদু-রুমাল। এমনকি ভয় পর্যন্ত দেখালেন—যদি রুমালটা বেরোয়। আর এতেও যদি না বেরোয় তো সব গেল। এখানে Othello'র মুখের চেয়ে চোখের ভাষা প্রকাশিত হল বেশী। এই রুমালের গল্পটিকে আমি প্রধান তিনটি স্তরে ভাগ করে দেব। প্রথমতঃ রুমালটা একজন মিশরীয় তাঁর মাকে দিয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ মিশরীয়টি মনের গোপন কথা বলে দিতে পারত। (* এ অংশটি সবচেয়ে

প্রয়োজনীয়)। তৃতীয়তঃ যতদিন রুমালটি তার কাছে থাকবে ততদিন সব ঠিকমত চলবে ; কিন্তু রুমালটি হারিয়ে গেলে সব শেষ হয়ে যাবে।]

সে ছিল যাদুবিদ্যায় পারদর্শী। মানুষের মনের কথা সে জানতে পারত! মাকে সে বলে দিয়েছিল যে রুমালটা তাঁর কাছে থাকলে বাবাকে বশে রাখা যাবে। কিন্তু যদি হারিয়ে যায় বা দান করেন ভালবাসার নেশা যাবে ছুটে—বাবা অন্য স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে "উঠবেন। * সে জন্য মৃত্যুকালে মা আমাকে এটা দিয়ে—["বা দান করেন"—কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। তারপর Othello দেখলেন যে তাঁর স্ত্রী বাক্সের (চিত্রে ২নং স্থান) দিকে এগিয়ে গেল—বাক্সটা খুলল—সব ওলট পালট করে কি যেন খুঁজতে লাগল। রুমালটা সেখানেও নেই। স্ত্রীর দিকে ক্রূর দৃষ্টিতে তাকালেন। স্তব্ধতা……। স্ত্রী আস্তে আস্তে মুখটা ঘুরিয়ে নিল।]

—বলেছিলেন—আমি যদি কোনদিন বিয়ে করি রুমালটা যেন তাকে দি। আমি তাই করেছিলাম। কত যত্ন করে কত সন্তর্পণে রুমালটাকে রেখে দিয়েছিলাম তোমাকে দেবার জন্যে। আর…এর ফল সব শেষ *

[Desdemona আবার ছুটে যায় বাক্সের কাছে (চিত্রে ৩নং স্থান) তন্ন তন্ন করে খোঁজে কিন্তু হায়—নেই—কোথাও নেই]

Desdemona—সেকি সম্ভব ?

Othello—(আরও জোরের সঙ্গে)—হ্যাঁ—সম্ভব—এর মধ্যে যাদু ছিল—এর বুননের মধ্যেই যাদু ছিল……যার গুণে তুমি আমার মন জয় করেছিলে…

Desdemona—সে কি সত্যি। (চিন্তায় ক্ষোভে সে ভেঙ্গে পড়েছে)

Othello—হ্যাঁ সত্যি। * এখনো ভাল করে দেখ।

[Desdemona ছুটে divan এর কাছে এসে ব্যাগটা তুলে নিয়ে এক নিঃশ্বাসে ব্যাগটা খুলে ফেলে দেখল—নাঃ নেই]

Desdemona—হা ভগবান! কোথাও তো পাচ্ছি না—[প্রচণ্ড হতাশায় ছিন্নমূল বৃক্ষের মত বসে পড়ল Desdemona.]

Othello—আঃ! গেল কোথায় ?

[এই প্রথম Othello তাঁর স্ত্রীকে প্রচণ্ড আক্রোশে অভিযুক্ত করলেন। তাঁর স্ত্রী কোনদিন ভাবেনি যে তার প্রতি স্বামী এত কর্কশ হবেন। এখানে Othello'র চরিত্রাভিনেতাকে ক্ষিপ্ত কিন্তু গাম্ভির্যপূর্ণ স্বরে কথা বলার দরকার। বেশী বাড়াবাড়ি হলে মুস্কিল আছে। হয়ত স্বামীর বীভৎস ক্রুদ্ধ অভিব্যক্তিতে

Desdemona নির্বাক হয়ে যেতে পারে। অতএব বেশী দূর এগোবে না অভিযোগের স্বর—অর্থাৎ একটা মাঝামাঝি অবস্থায় আবেগটাকে ধরে রাখতে হবে। এর পরে আরও দৃশ্য আছে যেখানে তিনি Emilia ও Desdemonaকে প্রশ্নবাণে তিক্ত করছেন। শেষ অঙ্কের কথাতো জানাই আছে। অতএব স্বামীর এই ক্রোধের অভিব্যক্তির সংগে পরিচিতি না থাকাতে Desdemona প্রথমে হতবাক হয়ে গেল। সে বিস্ময়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকাল...তারপর কিছুক্ষণ স্তব্ধতা]

Desdemona—তুমি অমনভাবে কথা বলছ কেন ? *

Othello—এটা কি হারিয়ে গেছে ? * বল...* হারিয়ে গেছে ? *

[Desdemona'র দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই—কিছুটা শান্ত (বাহ্যিক) হয়ে Othello বসে পড়লেন]

Desdemona—* ভগবান আমাদের রক্ষা করুন ! [হতভাগিনী সম্পূর্ণভাবে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। এভাবে তার সঙ্গে জীবনে কেউ কোনদিন কথা বলে নি। তার স্বামী যে ওভাবে কথা বলতে পারেন তা তার কল্পনার অতীত। তাই সে তার স্বামীর মুখের দিকে তাকাতে পারছে না। তার মনে হল যে পুরুষটা তার সামনে তিনি যেন Othello নন। এক অসহায় অবস্থায় সে যেন প্রচণ্ড অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যেতে লাগল]

Othello—* বল—* বল... [তিনি ছাড়বেন না—শুনবেনই]

Desdemona—হারায় নি*। কিন্তু কোথায় গেল ?

[সে স্বামীকে শান্ত করতে চাইল]

Othello—কেমন করে ?* [Desdemonaকে শেষ করতে না দিয়ে]

Desdemona—আমি বলছি হারায় নি— [স্বামীকে শান্ত করতে চায়। কিন্তু হারায়নি যখন গেল কোথায় ? এই সমস্যার সমাধান সে কোথায় পাবে ?]

Othello—আনো—আ-মা-কে দেখাও * (যেন দৃষ্টির সংগে দৃষ্টি কথা বলছে—ভাষা যেন ফুরিয়ে গেছে।)

Desdemona—কেন ? আমি পারি।* কিন্তু আমি দেখাব না।*

[কিন্তু সে জানে না কি করবে]

জানি—আমার কথাটা ঘোরাবার মৎলব তোমার।* Cassioকে ডাকার অনুমতি দাও। [এইবারে পথ খুঁজে পেয়েছে। অত্যন্ত মিষ্টি করে অনুরোধ জানায়। বহুবার সে আজ এই কথাটি বলেছে। আজ এর ওপর জোর দিচ্ছি কারণ মাত্র গতকাল তাদের ভালবাসা ছিল অটুট।]

Othello—রুমাল আনো *—আমি আর কোন কথা শুনতে চাই না।

[উঠে দাঁড়ায়]

Desdemona—লক্ষ্মীটি এস—Cassio'র মত ভাল লোক হয় না।

[সে যেন কিছুটা শক্তি ফিরে পেয়েছে]

Othello—রুমাল কৈ ?* [বাধা দিয়ে]

[এইভাবে তিনবার কথাটা উচ্চারণ করতে হবে। চাইবার গভীরতাটাকে প্রমাণ করা দরকার]

Desdemona—দয়া করে Cassio'র কথা বল। [আর থামা সম্ভব হচ্ছে না ; সম্পূর্ণ দৃশ্যে স্নায়ুর ওপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই সে বলেই চলেছে। তারপর হঠাৎ থেমে শরাহত পাখীর ন্যায় স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইল।]

Othello—রু—মা—ল।* [এই আশ্চর্যময়তার মধ্যেই নিহিত আছে আর একটি সতর্কবাণী। অর্থাৎ কৌশল করে ভোলালে চলবে না। মনে রাখা উচিত যে একমাত্র সত্যই হবে Desdemona'র জীবন রক্ষার উপায়। তাই তিনি সোজা, পরিষ্কার আর কোন কথা বলছেন না। অথবা তিনবার "রুমাল !" এই কথা বলাতে প্রথমবারে অর্থ করা যেতে পারে অনুনয় ; দ্বিতীয়বার উচ্চারণের অর্থ হবে সতর্কীকরণ আর তৃতীয়বার উচ্চারণের অর্থ হবে নির্দিষ্টভাবে অনুরোধ।]

Desdemona—[যতই হতাশ হয়ে পড়ছে ততই Cassio'র সম্বন্ধে প্রার্থনা জানাচ্ছে]

যে লোকটা সব সময় তোমার সংগে সংগে থেকেছে—তোমার বিপদে আপদে তোমার পাশে দাঁড়িয়েছে—

Othello—রু—মা—ল ! (গর্জন করে উঠল)

[কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। দু'জনেই হতবাক। দু'জনে ধীরে ধীরে মুখ তুলতেই চোখাচোখী হয়ে গেল। কেউ কারও দিকে তাকাতে পারছে না। Othelloই

আস্তে আস্তে শান্ত হবার চেষ্টা করলেন। সেই সময় সিঁড়ি দিয়ে লুকিয়ে Emilia এসে ঘরে ঢুকেছে।]

Desdemona—আজ * সুসময়ে তাকে বদনামী করছ—

[মেটাবার কিছুটা চেষ্টা করে। স্বামীর দিকে এগিয়ে যাবে মনে করে যেই ঘুরেছে]

Othello—* দূরে থাক! [প্রস্থান]

[যেন কোন আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে স্ত্রীকে থামালেন। নিজের সঙ্গে খানিকটা দ্বন্দ্ব। স্তব্ধতা। তারপর হঠাৎ যেন উৎসাহিত হয়ে সম্পূর্ণভাবে তাঁর অনুভূতির প্রকাশ। সবেগে প্রস্থান করা খুবই দৃষ্টিকটু, অনেকেই তাই করেন। সবচেয়ে ভাল হয় যদি দিক্‌বিদিগজ্ঞান শূন্য হয়ে চলাফেরা করেন—তারপর কোনরকমে নিজেকে টেনে টেনে বাইরে নিয়ে যান। এই সময় তাঁর মুখ দেখে যেন মনে হবে তিনি সকল যুক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। যেন পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। হয়ত' বা একবার ভুল দিকে চলে গেলেন। অবশ্য এটা চেষ্টা করে না দেখে বলা চলে না। তারপর তিনি বেরিয়ে যাবার পর কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। তাঁর স্ত্রী হতাশ অসহায়ভাবে বসে আছে। দু'জন স্ত্রীলোক মুখোমুখী বসে আছে]

Emilia—এই লোকটি কি ঈর্ষাপরায়ণ নয়?

[* চিহ্ন অর্থে চিন্তার জন্য থামা]

Desdemona—আগে কখন এমন দেখিনি।* নিশ্চয়ই রুমালটার কোন অদ্ভুতত্ব আছে। এটা হারিয়ে আমি খুব অসুখী।

[Emilia যেন কথাটাকে এড়িয়ে গেল]

Emilia—দু' এক বছরে কাউকে চেনা যায় না। [কিছু ভান করে এগিয়ে আসে—সোফায় বসে কয়েকটা কাপড় পাট করতে করতে] ওরা হচ্ছে জঠর আর আমরা খাদ্য। যখন ক্ষুধার্ত থাকে, আমাদের গ্রহণ করে। পূর্ণ হলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

[এই দৃশ্য শেষ করাই মুস্কিল। পর্দা না ফেলে পরবর্তী দৃশ্যে যাবার কথা সঙ্গে সঙ্গেই স্থির করতে হবে। ঘূর্ণায়মান মঞ্চের শব্দ ক্ষতিকর হবে এই দৃশ্যের পক্ষে। কি করা যায়? গীর্জার ঘণ্টা বাজানো পুরোণো হয়ে গেছে। কিন্তু যেহেতু রাত্রিকাল তাই খুব অসুবিধে। একটা কাজ করা যায়। মঞ্চ ঘোরার

সময় ঘড়ির ১২টা বাজানো। কিছুক্ষণ বাদে আবার ১টা। ইতিমধ্যে পরের দৃশ্যে ভোরের আলো প্রবেশ কোরবে। ঘড়িতে ২টো বাজবে। আরো একটু আলো আসবে। তারপর ৩টে-৪টে ঘড়িতে বাজবে আর ভোরের আলোও ক্রমশঃ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে Othello নিশ্চল বসে আছেন।

অবশ্য Emilia-কে না প্রবেশ করিয়ে Othello'র exit-এর পর Desdemona কে হতবাক অবস্থায় রেখে দৃশ্যটি শেষ করলে আমার মনে হয় আরও কার্যকরী হবে।]

শেষ

জনক জননী

প্রবোধবন্ধু অধিকারী

পূর্ণাঙ্গ নাটক

চরিত্র

মোহিনীমোহন, ভ্রমর, রতিকান্ত, মাধুরী, অবিনাশ, প্রতিভা, ঈশ্বর, চিরঞ্জীব।

এক

এখন সকাল। ভোরের আলো সবে ফুটতে শুরু করেছে।

দু' মুহূর্ত আগে এ-ঘরে গাঢ় ছায়া ছিল। ধীরে ধীরে সকাল হয়ে আসতে ঘর আলো হয়ে আসছিল; প্রথম রোদ ফুটতে ঘর ক্রমশ আলোকিত হতে থাকল। এবং দেখতে দেখতে রোদ চড়ল। পরদা প্রোজ্জ্বল হতে হতে অল্প হলুদাভ রোদের খানিক অংশ জানলার গরাদ পেরিয়ে মেঝেতে এসে লুটলো।

অল্প ছায়া যখন এ-ঘরে ছিল, মনে হচ্ছিল আবছা একটা মূর্তি এ-ঘরে আছে। তার হাতের জ্বলন্ত সিগারেটের আগুন অল্প ছায়া ছায়া অন্ধকারে জ্বলছিল। ঘর আলোকিত হতে মোহিনীমোহনকে দেখতে পাওয়া গেল। মোহিনীমোহন চাকলাদার। খুব কালো গায়ের রঙ, পেশীবহুল শক্ত-সমর্থ চেহারা, গায়ের সর্বত্র প্রায় লোমে ঢাকা। মাথার চুল খুব ছোট ছোট করে ছাঁটা। খাটো ঘাড়। মাথা নীচু করে আছে মোহিনী। নতুন একটি বেতের চেয়ারে বসা। বাঁ হাতের কনুই সামনের একটি বড় টিপয়ের ওপর, হাত মুঠো করে রাখা। মোহিনী সামনে অল্প ঝুঁকে সেই মুঠোয় কপাল রেখেছে। তার ডান হাতটি চেয়ারের হাতলে ছড়িয়ে আছে। আঙুলের ফাঁকে একটি সিগারেট। সিগারেটটি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

ঘরটি ছোট নয়, অস্বাভাবিক রকমের বড়ও না—মাঝারি ধরনের। প্রস্থের চাইতে দৈর্ঘ্যে সামান্যমাত্র বড়। ঘরের দেওয়ালগুলিতে ঈষৎ চড়া নীলাভ চুনকাম। পেছনের দরজার চার পাল্লাই আধুনিক জানলা। এর মাঝের অংশটি ডান এবং বাম দু'টি দিকের তুলনায় দ্বিগুণ বড়। এতে দু'টি পাল্লা

আছে। দু' পাশের দু'টিতে একটি করে জানলা—এখন বন্ধ। কেবল মাঝের জানলাটি খোলা। এর হালকা সবজে রঙের নেটের পরদার মাথা দু' দিকে এমনভাবে গুঁটিয়ে রাখা হয়েছে যেন ওটি ইংরেজি 'v' অক্ষর। এই গবাক্ষ-পথে অদূর কারখানার অস্পষ্ট আভাষ চোখে পড়ে। স্পষ্ট করে কেবল দেখা যাচ্ছিল দীর্ঘ লম্বা একটি চিমনি। ওই একটি ভিন্ন এ-ঘরে আর জানলা নেই।

ঘরের দু'টি দরজা আছে। একটি বাইরে যাওয়ার, অন্যটি ভেতরবাড়ির সঙ্গে সংযোগ। উভয় দরজাই খোলা। হলুদ এবং খয়েরী রঙের চেক-কাটা পাতলা পরদা দু'টো ভোরের বাতাসে অল্প অল্প নড়ছে। সমগ্র ঘরটি দেখলে মনে হবে অরক্ষণীয়া কোনো আটপৌরে মেয়েকে যেন সাজানো হয়েছিল কনের সাজে। বরপক্ষ অপছন্দ করে যাবার পর রাগে দুঃখে সে পোষাকের কিছু কিছু তছনছ করে ফেলেছে। পেছনের বড় জানলার ওপরে ঠিক গরাদ-মাপের একটি বড় তাক মতন রয়েছে। তাতে অল্পদামী, পুরনো এবং বাতিল ও প্রায়-বাতিল নানা টুকিটাকি জিনিস মোটামুটিভাবে সাজানো। ওল্ড ফ্যাসানের একটি বিবর্ণ টেবিলবাতি, কাচের ফুলদানি, বাতিল ডেটস্ট্যাণ্ড, এবং কিছু চেনা অচেনা যন্ত্রপাতি ওখানে আছে। একটা অচল পুরনো টাইমপিস ঘড়িকেই ওর মধ্যে বেশী করে চোখে পড়ছিল।

জানলার ডানপাশে, ঘরের কোণ ঘেঁসে একটি বড় টেবিল। হাতের কারুকাজ করা হালকা হলদে রঙের ঢাকনাতে ওটি আচ্ছাদিত। ওপরে বড়-সাইজের একটি রেডিও। রেডিওর ডানদিকে পেতলের নতুন ফুলদানিতে কিছু বাসি মিয়নো ফুল। বাঁদিকে একটি বড় আকারের ফোটো। ফোটোতে দু' জন লোক আছেন। একজন প্রৌঢ় পুরুষ। অন্যজন মহিলা। পুরুষটির চোখে মুখে প্রশান্তি ও আনন্দ। ত্রিশোর্দ্ধ বয়সের মহিলার মুখ বিমর্ষ।

মেঝের ঠিক মাঝখানে টিপয় ধরনের একটি নীচু টেবিলের ডান ও বাঁ পাশে দু'টি গদি দেওয়া নতুন বেতের চেয়ার। পেছনে, জানলার দিকে লম্বা ধরনের একটি পুরনো সোফা। সোফার ওপর টেবিল ক্লথটি মোচড়ানো অবস্থায় পড়ে আছে। এ্যাশট্রে উবু হয়ে পড়ে আছে মেঝেয়। কিছু কাগজপত্র, বিদেশী কারখানার ছবি-অলা ম্যাগাজিন এবং সিগারেটের অসংখ্য টুকরো মেঝেতে বিক্ষিপ্তাবস্থায় ছড়ানো ছিটনো। যা থেকে ধরে নেওয়া যায় এ-ঘরে উত্তেজনা-মূলক কোনো ঘটনা ঘটে গিয়েছে বেশ কিছুক্ষণ আগে।

ঘর আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কোথাও যেন একটি শব্দ শুনতে পেয়েছে

তা শোনবার ও দেখবার জন্যে মোহিনী মাথা তুলল। তাকাল। সে ভীষণ ক্লান্ত। তার মুখে চোখে তীব্র ধকল সওয়ার চিহ্ন। ঘাম শুকিয়ে আছে। অবসন্ন ও বিমর্ষতা তার চোখে মুখে ফুটছিল। মুখে সামান্য দাড়ির আভাস। কাঁচা পাকা। মোহিনী তাকাতে বোঝা গেল, ফটোর পুরুষটি সে নিজে। চেহারায় একটু বয়স বেড়েছে মাত্র।

মোহিনী প্রথমে ডাইনে তাকাল। পরে বাঁয়ে। শেষে পেছনের দিকে, বাইরে যাওয়ার দরজার দিকে মুখ ঘুরিয়ে, মুখ ফিরিয়ে নিল মোহিনী।

দরজায় ভ্রমর—ফটোর মহিলাটি। চুপচাপ এসে দাঁড়িয়েছে। তার চুল অবিন্যস্ত। মুখে রাত্রি জাগরণের চিহ্ন। চোখের ঈষৎ কালচে কোলে অশ্রু শুকনোর চিহ্নটি ফুটে রয়েছে।

ভ্রমর মোহিনীর দিকে তাকিয়েছিল। চোখে চোখ পড়তে মাথা নীচু করল।

মোহিনী চোখ সরিয়ে এনে প্রায় শেষ হওয়া সিগারেট মুখে তুলল। কপালের ভাঁজ দেখা যাচ্ছিল।

মোহিনী ॥ (অবাকের স্বরে, অল্প টেনে) তুমি···

[ভ্রমর মুখ তুলল না, কথা বলল না ; নীরব]

[মোহিনী সিগারেটে শেষ টান দিয়ে মেঝেয় টিপে আগুন নেভাল। ছুঁড়ে দিল। তারপর তাকালো ভ্রমরের দিকে।]

মোহিনী ॥ (আগের মতন টানা গলায়) তোমার তো ফিরে আসবার কথা নয়···

[ভ্রমর দু' পা এগিয়ে এল। তার দৃষ্টি করুণ। গলা ভারি।]

ভ্রমর ॥ তুমি কি তাই চেয়েছিলে ?

মোহিনী ॥ (অধৈর্য গলায়) হ্যাঁ চেয়েছিলাম··· (প্রায় চিৎকার করে) আমি তাই চেয়েছি ; চেয়ে আসছি··· (দৃষ্টি সরিয়ে আনল মোহিনী)

[ভ্রমর আরও দু' পা এগিয়ে এল।]

ভ্রমর ॥ (চোখ তুলে, তাকিয়ে) বেশ···(সামান্য চুপ) তুমি যদি তাই চাও, তাই চেয়ে থাক আমার কিছু বলার নেই। অবাক হবারও নেই কারণ তোমার চরিত্র···

মোহিনী ॥ (কথা কেড়ে নিয়ে, অবাক সুরে) আমার চরিত্র··· (মোহিনী স্ত্রীর দিকে তাকাল।)

ভ্রমর ॥ (শান্ত সংযত গলায়) হ্যাঁ তোমার চরিত্র··· (অকস্মাৎ অধৈর্য হয়ে পড়ে) তোমার চরিত্র স্বভাব আমার ভাল করে জানা আছে। এই ক- বছরে আমি তা জেনেছি ; জানছি···

মোহিনী ॥ (উপেক্ষার সুরে) কী জেনেছ তুমি আমার চরিত্রের ?

ভ্রমর ॥ (দৃঢ় গলায়) তুমি তা শুনতে চাও ?

মোহিনী ॥ (টানা গলায়) চা—ই।

ভ্রমর ॥ (অনেকটা বিদ্রূপের মতন করে) সে সাহস তোমার আছে ?

মোহিনী ॥ (থমথমে গম্ভীর প্রায় চিৎকার করে) আছে···

ভ্রমর ॥ (এগিয়ে আসতে গিয়ে দাঁড়ায় ; অনেকটা হতাশ হয়ে পড়ে) আমার বলার অপেক্ষা রাখে না—(অল্প অস্থির হয়) তুমি নিজেও জান কী ভীষণ গোঁয়ার তুমি। (দ্রুত গলায়) কী ভয়ঙ্কর একগুঁয়ে, রাগী, জেদি। তা নইলে নিজের স্ত্রীকে তুমি মধ্যরাত্রে··· (মাথা নীচু করে)

মোহিনী ॥ (কথা লুফে নিয়ে) হ্যাঁ, মধ্যরাত্রে আমি তোমাকে বাইরে বের করে দিয়েছি। (ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে) দিয়েছিলাম চলে যাবার জন্যে, ফিরে আসতে নয়···।

[নীচু মুখ তুলল ভ্রমর। তাকালো সোজাসুজি। তার চোয়ালে দৃঢ়তা ফুটছিল। জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।]

ভ্রমর ॥ (উত্তেজিত গলায়) তুমি শুধু গোঁয়ার নও, জেদি নও ; তুমি একটা পাষাণ। হৃদয় বলে তোমার কিছু নেই।

মোহিনী ॥ (গলা চড়িয়ে) না নেই ; হৃদয় আমার থাকবার কথাও নয়। (অল্প স্তব্ধতা। ঈষৎ নরম গলায়, টেনে টেনে) তুমি তো জানো আমি একজন অতি সাধারণ মানুষ। কারখানায় ছোট কাজ করতাম ; শ্রম করে, শরীর দিয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তবে আমি ফোরম্যান হতে পেরেছি। অশিক্ষিত বলে আমার কোনো লজ্জা নেই।

ভ্রমর ॥ সব অশিক্ষিত মাত্রেই হৃদয়হীন নয়। হৃদয় আছে বলে মানুষ মানুষ—সে জন্তু না...

মোহিনী ॥ জন্তু···(উপেক্ষা অবহেলার সুরে কথাটা বলে থামল মোহিনী। কী ভাবল। আর একটি সিগারেট ধরাল। পর পর টান দিল বার কয়েক।

যেন আপন মনে অথচ চড়া সুরে বলল) কে কাকে জন্তু বলছে আশ্চর্য ! (ঘাড় ঘুরিয়ে স্থির চোখে তাকালো। সিগ্রেট ধরা হাত বাড়িয়ে ভ্রমরকে দেখাচ্ছিল) তুমি নিজের বুকে হাত দিয়ে বলত দেখি…

ভ্রমর ॥ কী বলব ?

মোহিনী ॥ খুব সোজা কথা। (মোহিনী দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল)

ভ্রমর ॥ (অল্প জোরের সঙ্গে) কী সেই কথা ?

মোহিনী ॥ (ভ্রমরের দিকে অল্পক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে) না, কিছু নাঃ। (চোখ সরিয়ে এনে মোহিনী পড়া ছাইদানী তুলে টিপয়ে রাখল। রাখল জ্বলন্ত সিগারেটও। মাথা নিচু করে দু' হাতের তালুতে চোখ চেপে থাকল খানিক। দু' মুহূর্তের নীরবতা। তারপর টেনে টেনে) জ-ন্তু… (আচমকা মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে, চিৎকার করে) হ্যাঁ, আমি জন্তু, জন্তু ! (স্বর ঈষৎ নরম করে) কিন্তু এই জন্তু আমি ছিলাম না। (বিদ্রূপ করে) তুমি যাকে হৃদয় বলছ ? সেই হৃদয়, অনুভূতি আমাকে পশু করেছে, করছে বারবার। (ভেঙে পড়ে) ভ্র-ম-র, তুমি নিজের বুকে হাত দিয়ে বলতো, তুমি জন্তু না, তুমি পাষাণ না— হৃদয় বলে তোমার কি কিছু…

ভ্রমর ॥ (চমকে। বিস্ময়ে) আমি…

মোহিনী ॥ হ্যাঁ, তুমি, তুমি… (ক্ষিপ্ত হয়ে) ইউ ! (জেদের গলায়) পাড়ার বাচ্চাগুলো তোমার দু' চক্ষের বিষ। যোগেনবাবুর ওই ছোট ছেলেটাকে তুমি সেদিন যা করেছ, কোনো মানুষ তা করতে পারে ?

ভ্রমর ॥ আমি অন্যায় কিছু করি নি…

মোহিনী ॥ আলবাৎ করেছ।

ভ্রমর ॥ আমার দোষটাই দোষ, ওদের দোষ বুঝি দোষ না। ওরা যে সারাদিন ধরে হল্লা করে, বল ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয়…সেই বল রোজ কেন বাড়ির মধ্যে আসে ? কেন, কেন ? কেন সারাদিন ধরে ওরা জ্বালাতন করে আমাকে ? কেন ? (দ্রুত কথা শেষ করে কান্নায় ভেঙে পড়ে)

মোহিনী ॥ (থামিয়ে দিয়ে, নিরুত্তাপ গলায়) আঃ, ভ্র-ম-র… (মোহিনী উঠে দু' পা এগিয়ে এসে আক্রোশের চোখে তাকায় স্ত্রীর দিকে। পরে বিদ্রূপের গলায়) জন্তু দেখাবার জন্যে আঙুল তুললে। সেই আঙুল

এখন তোমাকেই দেখাবে, আমাকে নয়। (ক-পলক তাকিয়ে থাকে মোহিনী। শেষে ঘুরে দাঁড়ায়। জানলার দিকে যেতে যেতে টানা গলায় বলে) আমি জানি কেন তোমার এ-অবস্থা, কেন তুমি ছোট শিশু সইতে পারো না…

[ভ্রমর হঠাৎ অস্বাভাবিক রকমের বিচলিত হয়ে পড়ে, যেন ভয় পেয়েছে।]

ভ্রমর ॥ (নিশ্বাস চেপে) কী, কী জানো তুমি…

[মোহিনী জানলার পাশে এসে দাঁড়ায়। বাইরে তাকিয়ে থাকে।]

[অনেক পেছনে ভ্রমর উৎকণ্ঠা ভয় নিয়ে তাকিয়ে আছে।]

মোহিনী ॥ (টানা গলায়) ছেলে…

[ভ্রমর কেঁপে ওঠে।]

মোহিনী ॥ (ঘুরে দাঁড়ায়। ভ্রমরকে দেখে। টেনে টেনে বলে) তোমার যদি সন্তান থাকত, তুমি যদি মা হতে…

[ভ্রমর সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে কান ঢাকে।]

ভ্রমর ॥ (অনুনয় ও পরাজিতের গলায়) দোহাই, দোহাই তুমি চুপ কর। দয়া করে মুখ বন্ধ করো তোমার…

মোহিনী ॥ (হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে) না বন্ধ করব না। এ মুখ আর তুমি বন্ধও করতে পারবে না কোনোদিন। (মোহিনী এগিয়ে আসতে থাকে। আক্ষেপের গলা) চার বছর, চার বছর আমি অপেক্ষা করেছি (এগিয়ে এসে সোফার হাতলে বসে। জানলায় তাকায়। ভগ্ন আবেগজড়িত কণ্ঠে) প্রতি মুহূর্তে ভেবেছি, আশা করেছি—(ভেঙে পড়ে) কিন্তু সে শুধু আশাই, আকাশ-কল্পনা…

ভ্রমর ॥ (এগিয়ে আসতে আসতে) তার চেয়ে, তার চেয়ে (এসে সামনে দাঁড়ায় ভ্রমর। স্বামীর দিকে তাকায়। তার গলায় আবেগ, ভগ্নতা) তুমি আমায় বিষ এনে দাও। মেরে ফ্যালো…(কাঁদতে থাকে নীরব কান্না।)

[অধৈর্য রুষ্ট আশাহত মোহিনী ওঠে। পা বাড়ায়। স্ত্রীর দিকে না তাকিয়ে সোজা টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ায়। ফোটো দেখতে থাকে।]

মোহিনী ॥ (টানা সুরে) পারলে তাই করতাম। করলে বাঁচতামও— কিন্তু তা সম্ভব না (আকুল কণ্ঠে) তোমাকে, তোমাকে সইতে পর্যন্ত পারছি না। তুমি যাও, যাও—(সহসায় ঘুরে দাঁড়িয়ে আক্রোশে রাগে ক্ষোভে চিৎকার করে ওঠে) ইউ গেট আউট…

[ভ্রমরের চোথ ভেজা। সে আহত হয়। মাথা নীচু করে থাকে। পরে মুথ তোলে। তার গলার শিরা ফুটে উঠেছে। ঘাড় শক্ত। চোয়ালে অসম্ভব দৃঢ়তা ফুটছিল।]

ভ্রমর ॥ (আঁচলে চোথ মুছে নিয়ে সংযত স্থির গলায়) তুমি আমাকে রাস্তা দেখাচ্ছ…

মোহিনী ॥ (ডান হাতে টেবিলে ভর রেখে ভারী গলায়) হ্যাঁ, দেখাচ্ছি…

ভ্রমর ॥ তুমি আমায় চলে যেতে বলছ, সারাজীবনের জন্যে ?

মোহিনী ॥ বলছি। কারণ না বলে থাকতে পারছি না। (ঘুরে দাঁড়াল মোহিনী। আকুল গলা তার) একটা কথা বার বার তোমাকে শোনাতে হচ্ছে কেন ? তুমি বুঝছ না, জানো না আমার স্বভাব ?

ভ্রমর ॥ জানি।

মোহিনী ॥ (বিচলিত স্বরে অল্প আকুলতায়) জেনেও তুমি আমায় ঘাটাচ্ছ কেন ? তুমি কি চাও আমি গলা টিপে তোমায় হত্যা করি ?

ভ্রমর ॥ চাই…(অকস্মাৎ ছুটে এসে মোহিনীর পায়ের ওপর পড়ে। পা ধরে স্বামীর মুখের দিকে তাকায়) তাই কর। তুমি আমায় হত্যা কর, আমার জীবন নিয়ে তুমি শান্তি পাও…(পায়ে মাথা খুঁড়তে থাকে) তুমি আমায় নিষ্কৃতি দাও…

[কাঠের মতন দাঁড়িয়ে থাকে মোহিনী। নড়ে না। তাকায় না।]

মোহিনী ॥ (চিৎকার করে) না—। (এক মুহূর্ত কি ভেবে ফিরে দাঁড়ায় তাকায় স্ত্রীর দিকে। তারপর মুখ সরিয়ে নেয়।) হত্যা করার জন্যে তোমাকে আমি বিয়ে করে আনি নি। (টানা গলায়) যা পেতে এনেছিলাম, যা চাইলাম চেয়েছিলাম তার কিছুই দিতে পারো নি, তুমি, কিছু না…

ভ্রমর ॥ (স্বামীর মুখের দিকে তেমনি তাকিয়ে ভগ্ন কান্নার গলায়) আমি তোমার সংসার দেখেছি, তোমার সুখ আনন্দ, স্বাচ্ছন্দ্য…

মোহিনী ॥ না না না—

[লহমায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে মোহিনী। প্রথমে ফুলদানির ফুলগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে ফুলদানিটা তুলে নিয়ে প্রবল আক্রোশে বাইরের দরজায় ছুঁড়ে মারে। চড়া একটি ধাতব শব্দ ফোটে। তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে।]

মোহিনী ॥ না—(বোমা ফাটার মতন গোটা ঘর গমগম করে ওঠে) ও সব কিছুই চাইনি আমি, চাইবার ছিলও না। (পা বাড়ায় মোহিনী। সরে আসে) তুমি না থাকলেও, না এলেও এ-আমি পেতাম। এ পাওয়া আমার কেউ বন্ধ করতে পারত না।

[হাঁটতে হাঁটতে মোহিনী টিপয়টার পাশে এসে দাঁড়ায়। সোফায় বসে। দু'হাতের কনুই তুলে দেয় টিপয়ে। এবং হাতের দু'তালুতে চোখ ঢেকে ফেলে।]

মোহিনী ॥ (টানা গলায়) বিয়ের আগে ওসব আমি অনেক পেয়েছি, এখনও তার অভাব আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না।

[ভ্রমর এতক্ষণে তার বসা জায়গা থেকে উঠে দাঁড়ায়। তাকায় স্বামীর দিকে। চোখ মুছে নেয় আঁচলে। দাঁড়িয়ে কি ভাবে। তারপর আস্তে আস্তে সামনে পা বাড়াতে থাকে। এগিয়ে এসে দাঁড়ায় স্বামীর পেছনে। আস্তে করে হাত রাখে স্বামীর কাঁধে। তারপর মাথায়।]

ভ্রমর ॥ (ক্ষীণ নরম আদরের গলায়) শোনো…

[মোহিনী নীরব। উত্তর দেয় না।]

ভ্রমর ॥ এই, শুনছ…

মোহিনী ॥ (রাগে, স্ত্রীর হাতটি ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে) বলো।

ভ্রমর ॥ (বিষণ্ণ নরম ও কান্না-চাপা গলায়) তুমি আমায় পথ বেছে নিতে বলছো?

[তবুও মোহিনী নীরব। তাকাচ্ছে না। জবাব দিচ্ছে না।]

ভ্রমর ॥ (অনুনয়ের সুরে) কথা বলো; (রোরুদ্যমান গলায়) তুমি কি চাও

আমি এখুনি চলে যাই (দু' চোখ আবার জলে ভরে আসে) এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাই…

মোহিনী ॥ (তেমনি মাথা নীচু করে, না তাকিয়ে) আমি তোমায় থাকবার জন্যে সাধছি না।

ভ্রমর ॥ (আহত গলায় যেন দূর থেকে বলছে) তা সাধছ না, সাধবেও না জানি। চার বছর তুমি আমাকে খাঁচায় আটকে রেখে এখন ডালা খুলে আকাশ দেখাচ্ছ। কিন্তু (ভীষণ কান্নার ভাব চেপে) তুমি বিশ্বাস করো, আমার সে মনের জোর নেই। পাখায় শক্তি পাচ্ছি না; বুকে ভরসা নেই—যাওয়ার পথও আমি চিনতে পারছি না আর…

[মোহিনী উঠল। তার চোখেমুখে ব্যবহারে চাপা বিরক্তি প্রকাশ পাচ্ছিল। সরে এল মোহিনী। অধৈর্যের মতন ঘরময় পায়চারি করল। তাকে উত্তেজিত দেখাচ্ছে]।

[বার কয়েক ঘরময় পায়চারি করে মোহিনী বেতের চেয়ারে বসল। তার বুক ওঠানামা করছে। শিরার দপদপানি বাড়ছে। খবরের কাগজ টেনে নিল মোহিনী। সামনে মেলে ধরল। মুখ আড়াল করে পড়তে লাগল]।

[স্বামীর দিকে খানিকক্ষণ নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকল ভ্রমর। মোহিনীর ব্যবহার তাকে কষ্ট দিচ্ছিল। সে পা পা করে এগিয়ে এল বড় টেবিলের কাছে। ফোটোর দিকে মুখ করে দাঁড়াল। দেখছিল। ভ্রমর আস্তে ফোটোটি তুলে আনল। আঁচলে কাচ মুছল ; বুকে চেপে ধরে খানিক নিশ্বাস বন্ধ করে থাকল। চোখ বন্ধ ভ্রমরের। গাল গড়িয়ে অশ্রু নেমে আসছিল]।

[দু' মুহূর্ত ধরে গোটা ঘর যেন জলের তলার কোন ভারী বস্তুর মতন শীতল, নিস্তব্ধ।]

[চোখ খুলে ভ্রমর স্বামীর দিকে তাকাল। ফোটোটি আস্তে করে যথাস্থানে বসিয়ে, ধীর পায়ে স্বামীর কাছে এগিয়ে এল ভ্রমর। দাঁড়াল। কাঁধে হাত রাখতে গিয়েছিল, রাখল না।]

ভ্রমর ॥ (খুব ঠাণ্ডা নরম গলায়) সারারাত তুমি ঘুমোও নি। খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে, ভীষণ পরিশ্রান্ত···

. [মোহিনী সাড়া দিল না]

ভ্রমর ॥ ওঠো, বিশ্রাম করবে, চল।

[তবুও সাড়া নেই মোহিনীর।]

ভ্রমর ॥ (মোহিনীর পিঠে হাত রেখে) শুনছ, এই, তোমাকে দেখলে···

[আচমকা ক্ষেপে উঠল মোহিনী। ভ্রমরের স্পর্শ তাকে যেন তড়িতাহতের মতন ছিটকে সরিয়ে দিল। লহমায় হাতের সংবাদ-পত্রটি মুচড়ে ছিটকে গেল। সামান্য দূরে। অত্যধিক উত্তেজিত দেখাচ্ছিল তাকে। জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে। সমস্ত মুখে ভয়ঙ্কর বীভৎস ক্রুরতা ফুটছিল। মোহিনী মোচড়ানো কাগজটা প্রবল আক্রোশে ছুঁড়ে মারল· ভ্রমরের মুখে। কাঁপছিল।]

মোহিনী ॥ (আক্রোশে, হাঁপাতে হাঁপাতে ; চিৎকার করে) মিথ্যা, সব মিথ্যা ; মিথ্যার এক ষড়যন্ত্র করে তুমি···

ভ্রমর ॥ (অবাক সুরে) মিথ্যা···

মোহিনী ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, মিথ্যা...

ভ্রমর ॥ (সংযত দৃঢ় জোর গলায়) হোক মিথ্যা ; তবু এর চাইতে বড় সত্যের কথা আমার জানা নেই।

মোহিনী ॥ (শ্লেষ মাখানো কণ্ঠে, টেনে টেনে) গলা বড় করে তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ নাকি, অ্যাঁ···?

ভ্রমর ॥ (ঈষৎ ক্ষিপ্ত গলায়) ভয় দেখাব আমি···তোমাকে ?···তোমার মতন··· তোমার মতন···

মোহিনী ॥ (হাঁটতে হাঁটতে) বল বল, চুপ করলে কেন ; বলে যাও। বল, তোমার মতন জানোয়ারকে। (আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে চাপা আক্রোশে গর্জাতে গর্জাতে) হ্যাঁ, আমি জানোয়ার···আমি জানোয়ার···

ভ্রমর ॥ জানি···

মোহিনী ॥ (বীভৎস ক্ষিপ্তের মতন চিৎকার করে) না—জানো না। (মুখ বিকৃত করে, ভয়ঙ্কর ক্রুর নৃশংস কণ্ঠে) আসল জানোয়ারের রূপ তুমি দেখ নি।

ভ্রমর ॥ (জোর গলায়) দেখেছি। দু'বছর ধরে আমায় কম কিছু দেখাও নি। (আর্দ্র ভারী কণ্ঠে) প্রথমে ভেবেছিলাম এ তোমার আবেগ, ঝোঁক (দ্রুত গলায়) হয়ত বা সাময়িক উত্তেজনা অথবা খেয়াল। কিন্তু না; এ তোমার নির্দয় অত্যাচার। এই জন্যে তুমি আমায় কী না করেছ? (ঘন ঘন নিশ্বাস নেয়) কথায় কথায় মেরেছ, সারারাত বাইরে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড় করিয়ে রেখেছ, কথা বন্ধ করেছ—(আকুল কণ্ঠে টেনে টেনে) ঘৃণা, উপেক্ষা, অনাদর, তীব্র আক্রোশের বিষে আমি জরজর। (অল্প ক্ষিপ্ততায়) রাগ হলে তুমি মানুষ থাকতে শেখনি···

মোহিনী ॥ না আমি মানুষ না; মানুষ আমি ছিলাম না কোনোদিনই—

ভ্রমর ॥ এখন বুঝছি···

মোহিনী ॥ (কথা কেড়ে নিয়ে) বড় দেরিতে। (রুদ্ধ আক্রোশে) অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল, আমি মানুষ না। আমার মা সে-কথা জেনেছিল, বাবা জেনেছিল; কারণ আমি তাদের ছেড়ে কথা কই নি। (মোহিনী হাঁটতে থাকে। বাইরের দরজার দিকে) খেতে দেবার মুরোদ ছিল না, দু'য়ে মিলে জন্ম দিয়েছিল এক গুষ্ঠির। (বাঁ হাতে খপ্ করে সোফা ধরে ফেলে মোহিনী। আক্রোশে, উত্তেজনায়; ডান হাত মাথায় তোলে) এ চক্রান্ত, ভয়ঙ্কর চক্রান্ত—জীবন নিয়ে মানুষের চক্রান্ত। (হঠাৎ উত্তেজিত হয়, গলা চড়ায়) সেই চক্রান্তের প্রতিবাদে মা বাবার গায়ে পর্যন্ত আমি হাত তুলেছিলাম—

ভ্রমর ॥ (বিদ্রূপে ঘৃণায়) খুব গৌরবের কাজ করেছিলে···

মোহিনী ॥ গৌরব অগৌরবের কথা জানি না। (আবার টানা স্বরে) নীচু ঘরে জন্মেছি, মানুষ হই নি—তার জন্যও আমার কোনো ক্ষোভ নেই, লজ্জা নেই। আমি জানি আমার একটা জীবন আছে, এ-পৃথিবীতে তার কিছু অধিকার আছে—(দ্রুত গলায়) আতুর ঘরে যখন মরিনি, তখন সে অধিকার আমি আদায় করে নিতে জানি।

ভ্রমর ॥ (রুঢ় গলায়) ওই আদায় দাবি তোমাকে উন্মাদ করেছে।

মোহিনী ॥ (টানা স্বরে) ক-রু-ক···

ভ্রমর ॥ (তুলনায় গলা আরও চড়িয়ে) ওই দাবির ইতর হাত তুমি আমার দিকেও বাড়িয়েছ···

মোহিনী ॥ (অধিক ক্ষিপ্ত গলায়) বাড়িয়েছি, বাড়াব। বেঁচে যখন

আছি, আমার পাওনা আমি আগে বুঝে নিতে চাই; প্রতারিত হতে আমি জন্মাই নি।

ভ্রমর॥ (কিঞ্চিৎ শ্লেষের গলায়, জোরে) এ তোমার রোগ।···ব্যাধি—

মোহিনী॥ (বিস্ময়ের সঙ্গে অল্প টানা গলায়) ব্যাধি—! হয়তো তাই। (শ্লেষে ও বিদ্রূপের গলায়, মুখ বিকৃত করে) ব্যাধি না হ'লে তোমার মতন খারাপ মেয়েছেলেকে আমি ঘরে এনে তুলতাম না। বিয়ে করতাম না। (দ্রুত এবং জোর গলায়) রূপে মুগ্ধ হবার মতন বয়েস অনেক দিন আগে আমি পেরিয়ে এসেছিলাম।

ভ্রমর॥ (চোখ বন্ধ করে, চিবুক তোলে। যন্ত্রণার গলায় টেনে টেনে বলে) আমি খারাপ, নষ্ট অস্বীকার করব না। সব তুমি জানতে। জেনেও কেন তবে তুমি আমাকে জোর করে বিয়ে করেছিলে।

মোহিনী॥ (হাঁটতে হাঁটতে। আঘাত দেবার মতন স্বরে) পুজো করতে? না—। সুখ করতে? (মাথা নেড়ে জানায় 'তাও না'); জীবনে আমি অনেক সুখ করেছি। (সামান্য থামে। টানা গলায় বলে) চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত আমার সমস্ত শ্রমের পয়সা আমি সুখের পেছনে দিয়েছি। (অধৈর্য হয়ে ওঠে) মদ খেয়েছি, খারাপ পাড়ায় গিয়েছি, প্রতি রাত্রি কেটেছে আমার নতুন মেয়ের শয্যায়—তার জন্য তোমাকে আমার প্রয়োজন ছিল না।

ভ্রমর॥ (ঘৃণা আক্রোশে মুখ বিকৃত করে) তবে কি তোমার নির্যাতন অবহেলা, ঘৃণার বিষ প্রয়োগ করার জন্য আমার প্রয়োজন ছিল?

মোহিনী॥ না, তাও না।

ভ্রমর॥ (ত্বরিতে এগিয়ে আসে) তবে···

মোহিনী॥ (জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল, আকুলিতের মতন মুখ তুলল, দু'হাতে মাথা চেপে ধরল, গলা টানটান, চিবুক তোলা) আবার, আবার তুমি আমায় ঘাটাচ্ছ। সারাটা জীবন তীব্র ঝড়ের মতন কেটেছে আমার। অমানুষিক পরিশ্রম করেছি, জানোয়ারের মতন খেটেছি; অপর্যাপ্ত সুখ আমি আদায় করে নিয়েছি। (থামে, মুখ নামায়, নিশ্বাস বন্ধ করে থাকে। পরে আবার অস্থির হয়, আগের মতন আকুল হয়ে) চল্লিশের পরে আমি বুঝেছিলাম (চাপা ফ্যাসফেসে গলায়) এ-সুখ সুখ না (গলা অল্প চড়তে থাকে) আমি, আমি অন্য

কিছু চাই—আমি বাঁচতে চাই। (প্রায় ভেঙে পড়ে, অথচ গলা চড়া) মরার পরেও যে আমি বেঁচে আছি আমি তার প্রমাণ রেখে যেতে চাই। (হতাশ সর্বহারার মতন সোফায় বসে পড়ে, শরীর এলিয়ে দেয়, দু' চোখ ঢেকে ফেলে হাতের তালুতে। ভেঙে পড়ে। কান্না-চাপা গলা) ভ্র-ম-র, আমি সন্তান চাই; সন্তান। দু' বছরে এই একটি কথা হাজারবার তোমাকে স্মরণ করাতে হচ্ছে···

ভ্রমর ॥ (ধরা, কান্না চাপা গলায়) তোমার চাওয়াই কেবল চাওয়া? আমার, আমার বুঝি এ-সংসারে চাইবার কিছু নেই—

মোহিনী ॥ (হুঙ্কারের মতন বজ্রগম্ভীর স্বরে) না, নেই—থাকতে পারে না। (জেদি এক গুঁয়েমির গলায়) আমার পাওনা আমি আগে বুঝে নিতে চাই। (বলতে বলতে কাছে এসে দাঁড়ায় মোহিনী)।

ভ্রমর ॥ (শক্ত, কঠিন গলায়) তুমি স্বার্থপর।

মোহিনী ॥ হয়তো তাই···

ভ্রমর ॥ (প্রথমে তেমনি কঠিন গলায়) হয়তো না; সত্যি তাই। (চাপা নিশ্বাস ছাড়ে ভ্রমর। গলা আরও কঠিন হয়; ভীষণ মরিয়া ভাব ফুটে ওঠে তার ব্যবহারে) তোমার ওই একটি মাত্র চাওয়ার কাছে আমার নারীত্ব, মানুষ হিসাবে আমার সত্তা—সব বলি দিতে বলছ তুমি। (চোখেমুখে এক ভীষণ প্রতিবাদের আভাষ ফুটে ওঠে) আমার মনুষ্যত্ব, নারীত্ব নিগৃহীত হচ্ছে, তুমি তাকে অবমাননা করছ, অবহেলা করছ, লাঞ্ছিত করছ···

মোহিনী ॥ (আরও জেদের ভাব) করছি, করবও (সামান্য থেমে) কারণ আমি বিশ্বাস করি মাতৃত্বহীন নারীত্ব নারীত্ব না। তুমি মা হতে চাও না—ডাক্তারের কাছে যেতে তোমার আপত্তি, তাতে তোমার ভয়··· (মোহিনী আবার হাঁটতে থাকে। ভেতরের দরজার দিকে এগিয়ে যায়। টানা গলায় বলে) ···এই ভয় কেন, কিসের তা আমি জানি···

[ভ্রমরের চোখেমুখে শংকার ভাব ফুটে ওঠে। ভয়ে যেন জুড়িয়ে আসে।]

ভ্রমর ॥ জা—নো···!

মোহিনী ॥ (যেতে যেতে টানা গলায়) জানি—

[চোখমুখ কেমন ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে আসে ভ্রমরের। যেন ধরা পড়ে গেছে; মোহিনী তার জীবনের সবচেয়ে গোপন পাপের খবরটি জেনে ফেলেছে এই সন্দেহে ভ্রমর কেমন বিচলিত হয়ে পড়ে।]

ভ্রমর॥ (তবু সাহস করে, অপরাধী এবং শংকার গলায়) কী, কী, কী জানো তুমি…

মোহিনী॥ (টেনে টেনে) স—ব (দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে মোহিনী। তার মুখ অন্যদিকে) পাছে, পাছে তুমি ধরা পড়ে যাও…

[ভীষণ আতঙ্কে চোখ বিস্ফারিত হয়ে আসছে ভ্রমরের। গলা টানটান, শিরাগুলো ফুটে ওঠে। মুখে অস্ফুট আর্তনাদের মতন শব্দ ফুটি ফুটি হয়ে আসে, লহমায় মেলা হাতে নিজের মুখ নিজেই চাপতে যায় ভ্রমর।]

[ঘাড় ঘুরিয়ে মোহিনী ভ্রমরের ভয় পাওয়ার দৃশ্যটি দেখল। ঘুরে দাঁড়াল। যেন কাছে আসছে তেমনি করে এগিয়ে আসছিল। অথচ স্ত্রীর পাশে দাঁড়াল না মোহিনী। পাশ দিয়ে বাইরের দরজার দিকে এগোচ্ছিল।]

মোহিনী॥ (চলা অবস্থাতে) কিছুক্ষণ আগে যেন কী বলা হচ্ছিল… (আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে জোর গলায়) হ্যাঁ, রোগ। আমি রোগী। (দু' পা এগিয়ে এসে, হাত বাড়িয়ে, আঙুল দিয়ে ভ্রমরকে দেখিয়ে) কিন্তু তুমি? এ-তোমার রোগ না; এ তোমার প্রতারণা না? ‥

ভ্রমর॥ প্রতারণা…

মোহিনী॥ আলবাৎ প্রতারণা। (অধৈর্য রুক্ষ বীভৎস গলায়) এ এক জঘন্য ষড়যন্ত্র তোমার। (এক পলকের নীরবতা) তুমি আত্মসুখী, তোমার ভাষাতেই তুমি হৃদয়হীন, তুমি…

ভ্রমর॥ (কথার ওপর অনুনয়ে ভেঙে পড়ে) তুমি চুপ কর, চুপ কর…

মোহিনী॥ (রুক্ষ কর্কশ গলায় বিদ্রূপ করে) চুপ করব! কেন? না— চুপ করতে আমি শিখি নি; চুপ আমি করবও না। (রাগী শুওরের

মতন) নিজের পাওনা আদায় করে নিতে আমি মানুষ পর্যন্ত খুন করেছি। আজও তা করতে পারি…

[অত্যন্ত উদাস, হতাশ যুদ্ধে পরাজিত ক্লান্ত সৈনিকের মতন তাকায়। যেন সে ভীষণ অসহায়।]

ভ্রমর ॥ (আকুল, ভগ্ন গলায়) আমি…আমি তোমাকে কেমন করে বোঝাই…

মোহিনী ॥ (আক্রোশে ক্ষোভে দুঃখে ফুলতে থাকে) বোঝাবে…কী তুমি বোঝাবে আমাকে, কী…? (ঘৃণায় মুখ বেঁকে আসে) একটা নষ্ট মেয়ে, শয়তান, ইতর, বাঁজা, প্রতারক…

ভ্রমর ॥ (লহমায় দু' হাতে দু কান চাপা দিয়ে) না—না—না—

মোহিনী ॥ (গলা থেকে আরও ঘৃণা উপচে পড়ে, আক্রোশও) তুমি ডাইনী, তুমি কুলটা—বন্ধ্যা—

ভ্রমর ॥ (সমস্ত শক্তি দিয়ে ভয়াবহ চিৎকার করে ওঠে) না— (যেন ঘরে বোমা পড়ল। ত্বরিতে দু' হাতে মুখ ঢেকে ফেলল ভ্রমর। হাউ হাউ করে জোরে কেঁদে উঠল্।)

[তারপর চুপচাপ।]

[গোটা ঘর যেন বজ্রপাতের পর নিঃশব্দ এলাকার মতন থমথমে।]

[যেন যা ভাবছিল, তা সত্য নয় এমন ভাব নিয়ে মোহিনী যন্ত্রচালিতের মতন স্ত্রীর দিকে এগোতে থাকে। তার মুখ চোখে ভীষণ বিস্ময়। অবাক মোহিনী বোবা।]

[ক্রন্দনরতা ভ্রমরের সমস্ত শরীরের কাঁপন আস্তে আস্তে কমে আসে।]

মোহিনী ॥ (কাছে এসে, ভয়ঙ্কর ক্রুর দৃষ্টিতে তাকায়। বন্ধ নিশ্বাস ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে টানা গলায়) না—

[ভ্রমর তখনও কাঁদছে। নীরব কান্না। মুখের ওপর থেকে হাত নামাল ভ্রমর। ভেজা চোখে তাকাল স্বামীর দিকে। কিছু বলল না।]

মোহিনী ॥ তুমি কি তা হ'লে বলতে চাইছ, তুমি বন্ধ্যা নও ?

ভ্রমর ॥ (আহত ভগ্ন সামান্য উত্তেজিত স্বরে। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে) না—।

(সামান্য নীরবতা) তুমি যা বলছ, আমি তা নই···তা আমি ছিলাম না··· (মাথা নীচু করে ভ্রমর)

মোহিনী ॥ (দাঁতে দাঁতে ঘসে ক্রূরতায় আরও বীভৎস হয়ে ওঠে ! এগিয়ে আসে) ছিলে না···

[ভ্রমর আস্তে মুখ তোলে। সরাসরি তাকায় মোহিনীর চোখে। তার দৃষ্টি অল্প ঝাপসা। উদাস, পরাজিতের। মুখে এক করুণ ভাব।]

[মোহিনী দাঁড়িয়ে পড়েছে। তার চোখে আগুন জ্বলছে। সামান্য ক্ষণ নীরবে কাটে।]

ভ্রমর ॥ (কান্না কাঁপা করুণ ভেঙে পড়া গলায়) আমি···আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না, বলতে পারিনি, পারব না—কারণ, জানি, সে কথা তুমি সইতে পারবে না।

মোহিনী ॥ (অবাক বিস্ময়ে ও অল্প অধৈর্যভাবে অস্পষ্ট টানা গলায় সন্দেহের সুরে) পা-র-ব না...

ভ্রমর ॥ না।

মোহিনী ॥ (চীৎকারে ফেটে পড়ে) পা-রব। (সিগারেট ধরায়। আস্তে আস্তে ভ্রমরের দিকে এগোয়) আমি কি পারি না-পারি তুমি জানো না। আমি পারি—কারণ আমি খোকা নই। জীবনে অনেক আঘাত আমি সয়েছি ; দিয়েছিও···

ভ্রমর ॥ (অবিচলিত স্থির কণ্ঠে) এ-আঘাত তার চেয়েও অনেক বড়। শুনলে তুমি স্থির থাকতে পারবে না···

মোহিনী ॥ (হুঙ্কার ছাড়ে) পারব। (রাগে গজরাতে গজরাতে। অধৈর্য হ'য়ে) আমায় ঝুলিয়ে না রেখে তুমি বলো, বলতে পারো···

ভ্রমর ॥ (অনুনয়ের সুরে) না না, দোহাই ; তুমি শুনতে চেয়ো না। সেই ভীষণ কথা আমি বলতে পারব না, কিছুতেই পারব না···

মোহিনী ॥ (ভয়ঙ্কর ক্ষিপ্ত হ'য়ে চেঁচিয়ে ওঠে) ভ্র-ম-র ! (কাছে সরে আসে, দৃঢ় শক্ত গলায় বলে) বলতে তোমাকে হবেই··· (নৃশংসের মতন এগিয়ে যায় যেন ক্ষিপ্ত শ্বাপদ) না বলে তুমি নিস্তার পাবে না। (হাতের সিগারেট ফেলে দেয়)।

[ভয় পেয়ে ভ্রমর পিছু হটতে থাকে। চওড়া বিশাল কাঁধ তুলে শিকারী শ্বাপদের মতন এগোতে থাকে মোহিনী। তার গলা ঘাড় থেকে ঘাম ঝরছিল।]

ভ্রমর ॥ (পিছু হটতে হটতে শংকিত কম্পিত কণ্ঠে) তুমি…তুমি অমন করে এসো না, এসো না—আমার ভয় করে। শোনো…শোনো আমি বলছি, বলছি…

[মোহিনী থামে। দ্রুত নিশ্বাস নেয়। জলন্ত চোখে তাকিয়ে থাকে।]

ভ্রমর ॥ তুমি বিশ্বাস করো, কম চেষ্টা আমি করি নি। (আকুল টানা গলায়) তুমি চাও, আমি দিতে পারি না—এই দুঃখে লজ্জায় ক্ষোভে কী না করেছি আমি। সাধু সন্ন্যেসী ঠাকুর দেবতা মাদুলী…কিন্তু—

মোহিনী ॥ কিন্তু…

ভ্রমর ॥ কিন্তু নাঃ, (স্বামীর দিক থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়) তুমি বিশ্বাস করো, সন্তান আমার হবে না, হবে না (হাউ হাউ গলায় কেঁদে ফেলে) কোনোদিন হবে না…

[মোহিনী কাঠ। সে আহত ক্ষুব্ধ বিস্মিত। ক্রমে উত্তেজিত হতে থাকে মোহিনী। গা ফোলাতে থাকে।]

মোহিনী ॥ (প্রবল আক্রোশে) হবে না—(নৃশংসের মতন এগোতে থাকে) কিন্তু কেন, কেন হবে না, কেন ?

ভ্রমর ॥ আমি জানি না, জানি না।

মোহিনী ॥ (ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে) জানো, বলবে না। (চোখ বুঁজে ফেলে মোহিনী। অল্পক্ষণ এ-ঘর নীরব। আস্তে আস্তে সরে গিয়ে মোহিনী চেয়ারে ধপ করে বসে। দু'হাতের তালুতে মুখ ঢাকে। পরে আকুল অস্থির গলায়) ভ্র-ম-র—তুমি আমার সব স্বপ্ন ধূলিসাৎ করে দিলে। (ভেঙে পড়ে) আমার আশা কল্পনা আকাঙ্ক্ষা—অ-না-দি কালের বেঁচে থাকার কামনা—এ তুমি কী করলে ভ্রমর, এ তুমি কী করলে…(দু' হাতে নিজের চুল মুঠি করে ধরে ছিঁড়তে যায়)

ভ্রমর ॥ (স্বামীর কষ্টে দুঃখ পেয়ে, সান্ত্বনার সুরে) তুমি বিশ্বাস করো, আমি কিছু করি নি।…ঈশ্বর…

মোহিনী॥ ঈশ্বর···! না না, ও নাম তুমি মুখে এনো না। সব সইতে পারি আমি, ও-নাম বলে তুমি আমায় দুর্বল করে দিও না। ভ্রমর, ঈশ্বর আমি মানি না, মানি না—

ভ্রমর॥ (অল্প এগিয়ে আসে) আমি মানি। কারণ যারা না মানে এ-পৃথিবীতে তারাও শান্তিতে নেই।···আমি বিশ্বাস করি তার হাতে ভাগ্যের থলি আছে। তার এক আধকণা আমিও পেয়েছিলাম। ছিলাম গরীব, পিতৃহীন ব্রাহ্মণকন্যা, পেটের জ্বালায় হলাম কারখানার সাজানো হাসপাতালের দাই, মালিকের মনোরঞ্জনের পাত্রী—ওই থলি থেকে পড়া অনুকম্পা, দয়া আমাকে ঘর দিয়েছে, দিয়েছে সামাজিক মর্যাদা, দিয়েছে স্বামী···

মোহিনী॥ (প্রবল আক্রোশে দু' হাতে কান চেপে) স্টপ, স্টপ উইল ইউ? (ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে) স্বামী! কে তোমার স্বামী? আমি? (চিৎকারে ফেটে পড়ে) ও নো···। (হাঁপাতে থাকে) আমি তোমার স্বামী নই। (মোহিনী উঠে পড়ে। এগোয়। আস্তে আস্তে। দরজার দিকে) তোমাকে ঘরে এনে তুলেছিলাম এ-আমার খেয়াল। বিয়ে করেছিলাম বিনা উদ্দেশ্যে না (আবার ভেঙে পড়ে। আকুল গলায় বলে) এখন আমার অবস্থা সেই বাজা গরুর মালিকের মতন···

ভ্রমর॥ (দু'হাতে নিজের কান ঢেকে) হা ঈশ্বর, ঠাকুর—

মোহিনী॥ ভুল ভাঙলে মালিক বুঝতে পেরেছিল তার গাই গাই না—বল-দ···

ভ্রমর॥ আবার, আবার তুমি নোংরা ছুঁড়তে শুরু করেছ···

মোহিনী॥ (চিৎকার করে) ছুঁড়ছি, কারণ জানি এ-নোংরা নর্দমাতেই পড়বে, তার বাইরে নয়···

ভ্রমর॥ (হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উন্মাদের মতন আচমকা চিৎকারে ফেটে পড়ে) না, পড়ে না; পড়বে না। (অল্প চাপা আক্রোশের গলায়) ইতর ভাষার ক্লেদ তুমি আমাকেই ছুঁড়ছ। আমি নর্দমা? আর তুমি···তুমি... (ঘৃণায় মুখ বিকৃত হয়ে আসে)।

মোহিনী॥ আমি জন্তু।

ভ্রমর॥ (তেমনি ঘৃণার স্বরে) জন্তুরও আত্মজ্ঞান থাকে, তোমার নেই। ঈশ্বরের অশেষ করুণা সে স্বভাব দেখবার জন্য আয়নার সৃষ্টি করে নি। তা হ'লে দেখতে, দেখতে তুমি একটা নরক, নরকের কীট...

[আচমকা এ-ঘরে ঘটনাটা ঘরে যায়। লহমায় ক্ষিপ্ত মোহিনী লাফিয়ে ওঠে। এক ঝটকায় সামনের টিপয়টা উলটে ফেলে দেয়, প্রায় লাফিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ায় ভ্রমরের।]

মোহিনী ॥ (দু' হাতের থাবা বাড়িয়ে দেয়। রাগে ফুলতে থাকে) এই হাত দেখেছ? এ হাত না, যমের থাবা। নিজের অধিকার, দাবী কেড়ে নিতে অনেক মিল-মালিকের জীবন এই মুঠোর চাপে আমি হত্যা করেছি...। তোমাকেও করব।

(ভ্রমর বাইরে যাওয়ার দরজার দিকে পিছু হটতে থাকে। ভয়ে। মোহিনী থাবা মেলে এগোয় সঙ্গে সঙ্গে।]

ভ্রমর ॥ (ভয় পেয়ে, বিচলিতভাবে) আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি...

[ভ্রমর পিছু হটছিল; ভয়ে। আচমকা, প্রায় পলকের মধ্যে মোহিনী ছুটে গিয়ে বাইরের দরজায় দাঁড়াল। তার দু' হাত মেলা। অত্যধিক পরিশ্রমে তার বুক হাপরের মতন ওঠানামা করছিল। ঘাম দরদর করে পড়ছে। চওড়া প্রশস্ত বক্ষ মেলে বাঘের থাবার মত হাত প্রসারিত করে দরজায় দাঁড়িয়েছে যেন অতিকায় এক দানব।]

[ভ্রমর এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল।]

[মোহিনী আঙুলে কপালের ঘাম কাচিয়ে ফেলল।]

মোহিনী ॥ (উত্তেজনা, আক্রোশে হাঁপাতে হাঁপাতে) যাচ্ছ! কোথায়? (চিৎকার করে) না—। (ক্রুরতায় ফুঁসতে ফুঁসতে) যদি ভেবে থাক অত সহজে তুমি নিস্তার পাবে, তবে ভুল করেছ। (আবার চিৎকার করে ওঠে) আমি জবাব চাই।

[অপমানিত লাঞ্ছিত নিগৃহীত ভ্রমর যেন অসহ্য হয়ে প্রতিবাদ করার ভঙ্গিতে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার চোয়াল শক্ত, চোখ স্থির, বড়। কেবল ওষ্ঠ কাঁপছিল যেন অতি কষ্টে ভ্রমর ক্রোধ সংবরণ করতে চাইছে।]

ভ্রমর ॥ (ক্ষুব্ধ আহত গলায়, মুখ বিকৃত করে) জবাব! কিসের?

মোহিনী॥ কিসের তা তুমি ভাল করেই জানো। কথা ঘুরিয়ে তোমার ভাল হবে না—(আক্রোশে ফুঁসতে থাকে)

ভ্রমর॥ মন্দের শেষ চূড়ায় টেনে তুলে এনে তুমি ভালর লোভ দেখাচ্ছ? ভাল আমার দরকার নেই। সে সীমার বাইরে আমি চলে এসেছি। (আহত উত্তেজিতের মতন দ্রুত নিশ্বাস নেয়)

মোহিনী॥ (আঙুল দিয়ে দেখিয়ে) ওই বাইরে দাঁড়িয়েই তবু তোমাকে বলে যেতে হবে।

ভ্রমর॥ আমি তো বলছি...

মোহিনী॥ কী?

ভ্রমর॥ সন্তান, সন্তান আমার হবে না... (গলায় আকুলতা)

মোহিনী॥ (আগের মতন জোরে) জানি। সে কথা শুনছি। কিন্তু কেন হবে না তার কারণ আমি জানতে চাই··· (দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকে মোহিনী।)

ভ্রমর॥ (উপেক্ষা ঘৃণায় টেনে টেনে) কা-র-ণ? (দৃঢ় সংকল্পের গলায়) নাঃ, কারণ আমি জানি না—(মাথা নীচু করে জোরে জোরে নিশ্বাস নেয়)

মোহিনী॥ (হুঙ্কার ছাড়ে) হাজারবার জানো। (টেনে টেনে) এতকাল তোমার ষড়যন্ত্র, প্রতারণায় ভুলেছি—আর ভাঁওতা তুমি আমায় দিতে পারবে না, না— (গর্জাতে থাকে)

ভ্রমর॥ (অনুনয়ের সুরে, আবার ভেঙে পড়ে কান্নায়) তুমি আমায় যেতে দাও, দো-হা-ই, পথ ছেড়ে দাও—

মোহিনী॥ না—।

ভ্রমর॥ আমি প্রতিজ্ঞা করছি, শেষ প্রতিজ্ঞা—আমি যাব আর ফিরে আসব না। পৃথিবীতে এ-মুখ আর কেউ কখনও কোনোদিন দেখতে পাবে না—

মোহিনী॥ ও মুখ দেখার লোভ আমারও আর নেই। ও মুখ আমিও দেখতে চাইব না। যাবার আগে তুমি জবাব দিয়ে যাও—

ভ্রমর॥ (মরিয়ার মতন) জবাব আমি দেব না···

মোহিনী॥ (হুঙ্কার ছাড়ে) দেবে না···

ভ্রমর॥ (অধিক গলা চড়িয়ে) না—

মোহিনী ॥ সাপ নিয়ে তুমি খেলা করছ ··ভ্রমর···

ভ্রমর ॥ ছোবলকেও আমার ভয় নেই।

মোহিনী ॥ আসল ছোবল কাকে বলে তুমি জানো না···

ভ্রমর ॥ জানি সাপ সাপ, তোমার মতন পাষণ্ড ইতর বদমাসের ছোবলে—

মোহিনী ॥ ভ্র-ম-র···

[ক্ষিপ্তের মতন মোহিনী ছুটে আসে। লহমায় সে ভ্রমরের পিঠের দিককার আঁচলসুদ্ধ ব্লাউজ চেপে ধরে মুঠো করে, বাঁ হাতে। হেঁচকা টানে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়। কিল ঘুসি মারে পাগলের মতন। তারপর চুলের মুঠি ধরে টেনে এনে ডান হাতে কষে গালে চড় মারে। ভ্রমর অবাক, কাঠ। প্রথমে কিছু বলেনি ভ্রমর। পরে থামাতে যায়। ততক্ষণে মোহিনী তাকে ঘাড় ধরে জোর করে বসিয়ে দিয়েছে। পিঠের ওপর অজস্র কিল ঘুষি মারতে থাকে। শেষে সরে এসে পা তোলে, লাথি মারতে। আচমকা ভ্রমর ওঠে। তাকে কুৎসিত ও বীভৎস দেখাচ্ছিল। ভ্রমর প্রথমটা ধরেছিল মোহিনীকে। কিন্তু ভারী ওজনের একটা প্রচণ্ড চড় খেয়ে হাত ফসকে সরে যায় মোহিনী। ভ্রমরের কাপড় আলুথালু। গালের কষ বেয়ে রক্ত পড়ছে। তার চোখ বড়, বিস্ফারিত। প্রবল আক্রোশে সে মোহিনীকে ধরে। মারে। ঘরময় ভীষণ এক যুদ্ধদৃশ্য। ভ্রমর বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ে। মোহিনীর দু' কাঁধ ধরে দেওয়ালে জোরে ঠুকে দেয় বারকয়েক। মোহিনী সেই অবস্থাতেই হাত চালাচ্ছিল। চোখে আঘাত পেতে মোহিনী দু' হাতে বাঁ চোখ চেপে ধরে। ভ্রমর এই সুযোগে বাইরের দরজার দিকে প্রায় ছুটে আসে। এবং মোহিনী এক লাফে দরজা আগলে দাঁড়ায়। বাধা পায়, দাঁড়িয়ে পড়ে। মোহিনী দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিল। বাঁ হাত বাঁ চোখ চেপে ধরেছে। ডানহাতে দরজা আগলানো। তার মুখে চোখে ভীষণ প্রতিশোধস্পৃহা। বীভৎস।]

[ভ্রমর বাধা পেয়ে আরও ক্ষেপে ওঠে। তার সমস্ত শরীর ভীষণ কাঁপছিল। বুক হাপরের মতন ওঠানামা করছে। নিশ্বাসের শব্দ স্পষ্ট।]

ভ্রমর ॥ (এক পলক দেখে নিয়ে, মুখ বিকৃত করে। চোখ সরিয়ে এনে পাশে তাকায়। চাপা আক্রোশে, পরাজয়ের গ্লানিতে চাপা ফ্যাসফেসে গলায়) পথ ছাড়ো, আমায় যেতে দাও···

মোহিনী ॥ না—।

ভ্রমর ॥ (মুখে রুক্ষ, অসম্ভব এক কাঠিন্যতা এনে চাপা ফ্যাসফেসে গলায়) বেশ (নীরব) শুনতে যখন চাও, শোন। কিছুই আর লুকবো না আমি। আছে···আমার একটি সন্তান, ছেলে··· (কান্নার গলায়) এক নিরপরাধ শিশু···

[মোহিনী অবাক। তার চোখ ধরা হাত আলগোছে নেমে আসে। তড়িতাহতের মতন অবস্থা। ওষ্ঠ কাঁপছিল মোহিনীর। সে কথা বলতে পারছে না। মন্ত্রমুগ্ধের মতন দু' পা এগিয়ে এসে কথা বলে মোহিনী। তোতলায়।]

মোহিনী ॥ (তোতলাতে থাকে) তু-তু-তুমি কি বলছ, তুমি কী··· (অবাক নির্বোধের মতন ফ্যালফ্যাল করে ভ্রমরের দিকে তাকায়)

ভ্রমর ॥ ঠিক এই জন্যে, এই কারণে তোমাকে বিয়ে করতে চাই নি। কারণ আমি জানি, অনেকের এমন থাকলেও কোনো স্ত্রী তার স্বামীকে এত বড়, এত ভীষণ আঘাত দেয় না, দিতে পারে না। কিন্তু তুমি শুনলে না। জোর করে, জোর করে তুমি আমায় বিয়ে করেছ···

[ধীরে ধীরে, যেন অনেকটাই অজান্তে এগিয়ে আসে ভ্রমর। আস্তে আস্তে এসে সোফা আঁকড়ে ধরে নিজেকে পতনের হাত থেকে বাঁচায়। তার মাথা ঘুরছিল। গলা শুষ্ক। ভ্রমর পিপাসাপীড়িত।]

[মোহিনী কেমন উদ্‌ভ্রান্ত, উদাস সর্বহারার মতন নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে। বিস্ময় বাড়ছে চোখেমুখে···]

মোহিনী ॥ (কৃত্রিম, যান্ত্রিক গলায়) সন্তান···ছেলে···

ভ্রমর ॥ (খুব কষ্ট, যন্ত্রণাপীড়িত গলায়, নিজেকে কোনোরকমে যেন দাঁড় করিয়ে) তোমার এই তীব্র চাওয়া আমাকে কলঙ্কের পঙ্ক থেকে উদ্ধার করেছিল। বিয়ে করলাম···দু' বছর পার হ'তে তুমি সন্তানের জন্য পাগল হয়ে উঠলে···কিন্তু বিশ্বাস করো, (দ্রুত গলায়) তখনও জানতাম না, ওদের ভবিষ্যতের পথ নিষ্কণ্টক করতে প্রসবকালে আমাকে ওরা বন্ধ্যা করে দিয়েছিল (কান্নায় আকুল হয়ে আসে কণ্ঠ) তুমি বুঝবে না, বুঝবে না নারী হয়ে স্বামীকে সন্তান দিতে না পারার যন্ত্রণা কত বড়···কত ভীষণ··· (কান্নায় ভেঙে পড়ে। সোফায় এলিয়ে পড়ে)

[উদ্‌ভ্রান্তের মতন মোহিনী এগিয়ে আসে, খুব শ্লথ অত্যন্ত ধীর পায়ে; যেন দম ফুরিয়ে আসা কলের পুতুল থেমে থেমে এগোচ্ছে। অস্পষ্ট গলায় কী যে বলছে শোনা যায় না, কেবল ওষ্ঠ দু'টি নড়তে থাকে।]

[ভ্রমর মোহিনীর দিকে তাকাতে পারছিল না। সমস্ত শরীর দিয়ে সে কাঁদছিল। আবেগ সামান্য কমে এলে ভ্রমর এক পলক তাকাল, তাকিয়ে নিল।]

ভ্রমর ॥ (ধরা, ভগ্ন গলায়। চোখ নামিয়ে নিয়ে) অনেক, অনেক চেষ্টার পর ডাক্তার। সে আমায় পরীক্ষা করে সব বলে দিয়েছিল, স—ব। (আবার কান্না) আমার, আমার এ-যে কত বড় জ্বালা তুমি বুঝবে না—বুঝবে না, কারণ তুমি সন্তানের পিতা নও (যেন এই মুহূর্তে ভ্রমর সর্বস্ব হারাল)

[মোহিনী এগিয়ে আসছিল; তার অভিব্যক্তি আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে। যেন বজ্রপাতের মারাত্মক শব্দে সে সংজ্ঞাহীন চেতনাহীন হয়ে পড়েছিল, সেই শূন্য দৃষ্টি এখন বস্তু চিনতে পারছে। বাস্তব জানছে। মোহিনীর চোখে মুখে এমন ভাব, যেন সে এই মুহূর্তে কি করবে, খুন করবে, না, ভ্রমরকে জড়িয়ে ধরবে, ভেবে পাচ্ছিল না। মোহিনী এগোচ্ছে অল্প অল্প···]

মোহিনী ॥ তোমার (ঢোঁক গিলে) তোমার ছেলে আছে···ছেলে—

ভ্রমর ॥ ছোট ছেলে আমি সইতে পারি নি বলে রাগ করেছ, কিন্তু মা হয়েও ওদের সঙ্গে আমি খারাপ ব্যবহার করেছি। কারণ জানতাম, প্রশ্রয় দিলে এই আকাঙ্ক্ষা তোমার দিন দিন বাড়বে। [ভ্রমর কাঁদতে থাকে।]

[মোহিনীর মুখের ভাব বদলে কেমন ক্রূরতা ফুটে আসছিল। এতক্ষণে সে সম্পূর্ণ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে, তির্যক চোখে ভ্রমরকে দেখে নিল। পায়চারি করতে লাগল অত্যন্ত দ্রুততায়। মোহিনীর দু' হাত পেছনে, পিছ-কোমরের ওপরে ধরা।]

মোহিনী ॥ (পায়চারি করতে করতে, তীব্র যন্ত্রণা চেপে) তা হ'লে মা হ'য়েও তুমি এখন সন্তানহীনা···আর সে দোষ, সে দোষ আমার···

ভ্রমর ॥ (কাঁদছিল। তাকাল না)

[আরও দ্রুত পায়চারি করে আচমকা সামনে এসে দাঁড়ায় মোহিনী। তার চোখে মুখে জিঘাংসা ফুটে বেরোচ্ছিল।]

মোহিনী ॥ (নিঃশ্বাস বন্ধ করে। চাপা গর্জনের গলায়) কত···তার বয়স কত···

ভ্রমর ॥ (ভয় পেয়ে, চাপা, অস্পষ্ট ফ্যাসফেসে গলায় কোনো রকমে বলে) চৌদ্দ···

মোহিনী ॥ (যেন আক্রোশ চাপতে চাইছে) সে এখন কোথায় ?

ভ্রমর ॥ (ভয়ে, ইতস্ততের গলায়) আ-আশ্রমে···

মোহিনী ॥ (আবার নিশ্বাস চাপে) তুমি এতদিন কেন আমাকে সে কথা বলনি··· (উত্তেজিত হ'তে থাকে)।

ভ্রমর ॥ কী করে, কেমন করে বলি···

মোহিনী ॥ কেমন করে··· (আচমকা হাঃ হাঃ করে অট্টহাসি হাসে। সমস্ত ঘর হাসিতে ভরে যায়) কেমন করে···কেমন করে··· (মোহিনী হাসতে হাসতে এগিয়ে যায়, আচমকা ভ্রমরের হাত ধরে, প্রায় টেনে নামায়)

[ভ্রমরের চোখে মুখে তীব্র ভয়, সে কাঁপতে থাকে। তাকায়।]

মোহিনী ॥ কেমন করে··· (অট্টহাসি হাসতে হাসতে প্রায় জোর করে ভ্রমরকে টেনে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।)

[শূন্য ঘরে যেন অনেকক্ষণ ধরে ওই একটি হাসির তরঙ্গ ফুটে থাকে। ···কেমন করে···কেমন করে···।]

[আলোয় অচল ঘড়িটা চকচক করে। যেন সে চলবে।]

দুই

কানের কাছে, খুব কাছে যেন একটি ছোট ভোমরা ডাকছে—তেমনি টানা ঈষৎ ফোঁপানো অনুচ্চ কান্নার সুর ভীষণ বেদনার মতন হাওয়াকে ভারী এবং পরিবেশকে বিষণ্ণ করে তুলেছে। অন্য কোনো শব্দ নেই, কোথাও না। কেবল এই করুণ সুরের নির্বাধ কান্না একটি বিশেষ ছন্দে বাঁধা বেহালার সুরের মতো প্রবাহিত। গোটা ঘরটি শোকপ্রাপ্ত মানুষের মতন মুহ্যমান, স্থির।

এখন দুপুর। সময় সকালের বৃত্তাকার গণ্ডী অতিক্রম করে এইমাত্র দুপুর সীমারেখার ওপর পা রাখল। বাতি জ্বলছে না। বাইরের প্রখর নির্মেঘ এবং আলোকোজ্জ্বল দুপুর এ-ঘরে রোদ পৌছে না দিলেও পর্যাপ্ত আলোয় উদ্ভাসিত করে রেখেছে, ছায়ার চিহ্ন পর্যন্ত কোথাও লেগে নেই।

ঘরটি প্রশস্ত! যেমন দৈর্ঘ্য তেমনি প্রস্থ—নিখুঁত এক বর্গক্ষেত্রের মতন। গোটা দেওয়ালে অল্প সবুজাভ চুনকাম—এত নিষ্কলঙ্ক যে কোথাও একটি রেখা কি দাগ পর্যন্ত লেগে নেই। প্রশস্ত মেঝের মাঝখানে বরফির আকারে সোফা-সেট সাজানো। প্রতি দিকে একটি ডবল সীটেড সোফার পাশে একটি করে সিঙ্গল সীটেড সোফা। এগুলি শুধুমাত্র দামীই নয়, দুর্লভও বটে। বরফির যেন তিনটি দিক আছে, একটা পাশ খালি। এর ঠিক মাঝখানে হাঁটু সমান উঁচু বৃত্তাকার বৃহৎ টিপয়। ডান কোণে নতুন একটি এয়ার-সার্কুলেটর, বাঁ পাশে তিনদিক কাচে ঢাকা একটি টয়চেষ্টে দেশ বিদেশের নানা ধরনের দামী পুতুল, বিভিন্ন হাতের কাজ, মাটি কাচ চীনেমাটির মূর্তি ও অন্যান্য জিনিস সাজানো। ডানপাশের বুক-র‍্যাকে দামী মোটা নতুন বইয়ের সমারোহ। বোঝা যাচ্ছিল এ-বই কেবল মর্যাদাবৃদ্ধির সাক্ষী, কাদচ পড়বার জন্য নয়। নীচু ধরনের এই বুক-কেসের ওপর শ্বেতপাথরের এক নগ্ন মূর্তি। টয়চেষ্টের ওপরকার ভাসে' ফুল।

দু'টি মাত্র দরজা রয়েছে এ-ঘরে। একটি ডাইনে বাইরে যাবার, পেছনের দেওয়ালে, ভেতর-বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগের পথ। এ-দরজায় ফিকে কমলা রঙের মিহি সিল্কের পরদা। পরদাটি এত ফিনফিনে যে ও-পাশে কেউ দাঁড়ালে তাকে স্পষ্ট দেখা যায়। বাইরের দরজার পরদার রঙ অনেকটা এক কিন্তু মানের দিক থেকে আলাদা। এর সুতো মোটা, বুনন ঘন, কাপড় ভারী। মোট চারটি জানলার দু'টি বাঁ-পাশের দেওয়ালে। ডানদিকে একটি। পেছনের দেওয়ালেও একটি জানলা রয়েছে। এখন সেটি বন্ধ। এর পরদগুলি গাঢ় মেরুন রঙের, জানলাগুলির নীচের অর্ধেকটা কেবল ঢেকে রেখেছে। পেছনের দেওয়ালে একটি বড় ক্যালেণ্ডার ঝুলছে। কোনো বিলীতি মদের দেওয়ালপঞ্জী। ছবিটি এক বিদেশী অর্দ্ধ-নগ্ন মহিলার। বুকে বক্ষোবাসের নামান্তর, পরনে আটোসাটো খাটো জাঙ্গিয়া। এক পা ছড়িয়ে অন্য পা মুড়ে দেহ এলিয়ে দিয়ে মেয়েটি মদের গ্লাসের তলার দিকটা নাকের ডগা ছুঁইয়ে আবেশে স্বপ্নে চোখ বুজে রয়েছে। ঘরে কোনো ঘড়ি নেই। ফুলদানিতে রজনীগন্ধা।

কান্না তখনও একই সুরে এক ছন্দে বইছিল।

ঘরে দু' জন মানুষ আছে। একজন স্ত্রীলোক—ডানদিকে জানলায় দাঁড়ানো। তার মুখ দেখা যাচ্ছিল না, পেছন এবং বাঁ-পাশের পাশটা কেবল দৃষ্টিগোচর হয়। গ্রীবাদেশ খুব ফর্সা। পিঠময় ছড়িয়ে রয়েছে দীর্ঘ কেশরাশি একহারা শরীর থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। মহিলা তার বাঁ হাতের কনুই জানলার গরাদে রেখেছে। ডান হাতে আঁচল। সেই আঁচল তুলে মাঝে মাঝে সে চোখ মুছছিল। এ-ঘরের একমাত্র পুরুষটি অত্যন্ত ব্যস্ততায় পায়চারি করছিল। তার পরনে ফিনফিনে মিহি ধুতি, গায়ে দামী সিল্কের পাঞ্জাবী। লম্বা কোঁচা মেঝে ছুঁয়েছে। দীর্ঘকায় সুপুরুষ ধরনের চেহারা। চুলের ইতস্তত পাক ধরেছে। লোকটির হাতে মোটা চুরুট। থেকে থেকে ওটি সে ভীষণ অধৈর্যভাবে টানছিল। তার মুখেচোখে পুঞ্জীভুত বিরক্তি, ক্ষুব্ধতা, বীতরাগ এবং রুষ্টতা। মাঝে মাঝে থেমে গিয়ে লোকটি জানলায় দাঁড়ানো মহিলাকে দেখে নিচ্ছিল। কখনও সোজাসুজি তাকাচ্ছে, কখনও বা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিচ্ছিল।

কান্না তখনও একটানা বইছে।

এরা স্বামী-স্ত্রী। পুরুষ রতিকান্ত। মহিলা মাধুরী।

রতিকান্ত ॥ (স্ত্রীর দিকে সামন্য এগিয়ে, উত্তেজনা এবং রুষ্টতার ভাব চেপে, বিক্ষোভের গলায়) তোমাকে আমি কেমন করে যে বোঝাই···উফ্! (বাঁ হাতের প্রসারিত মুঠোয় চুরুট-ধরা ডানহাতের মুঠোর আঘাত করে প্রবল আক্রোশে।) এই একটা ব্যাপার নিয়ে (এগোতে গিয়ে থেমে যায়) এই একটা ব্যাপার নিয়ে তুমি আমাকে পাগল করে তুলেছ। (অগ্নীবর্ষী দৃষ্টিতে সোজাসুজি তাকাল, দাঁতে দাঁত চাপল—শক্ত চোয়াল ফুটে বেরোচ্ছিল। সারা মুখে অসম্ভব ক্রুরতা।)

[ও পক্ষের কোনো জবাব নেই। মাধুরী যেন শুনতে পারছে না কিছু অথবা উপেক্ষা করছে। সে তেমনি কেঁদে যাচ্ছিল। তার সমস্ত শরীরে থেকে থেকে ঢেউ উঠছে।]

[রতিকান্ত সরে এল। সোফায় বসল। ছাইদানিতে চুরুট রেখে, টিপয়ে কনুইয়ের ভর দিয়ে দু' হাতের তালুতে মুখ ঢাকল। তার শরীরের কাঁপন থেকে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধতা ও রুদ্র রোষ বোঝা যাচ্ছিল। অল্পক্ষণ তেমনি থেকে মুখ তুলল রতিকান্ত। সোজাসুজি তাকাল স্ত্রীর দিকে।]

রতিকান্ত ॥ তোমার এই ভীষণ জেদ, আমাকে অশান্ত, ক্ষিপ্ত করে তুলেছে। (যন্ত্রণার স্বরে) এ আমি চাই নি, চাই নি···। (রতিকান্ত উঠে দাঁড়াল। মাথা নীচু করে যন্ত্রণার তাড়নায় পায়চারি করছিল। স্ত্রীর দিকে এগোতে গিয়ে থামল। এক পলক তাকিয়ে নিয়ে ফিরে এল। হাঁটতে হাঁটতে) আগে বারবার করে বলেছি, এখনও বলছি (রতিকান্ত দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করল। তার চিবুক বক্ষ ছুঁয়েছে। চোখ কপাল গাল কুচকোনো।) কিন্তু তুমি এ—ত অবুঝ···

[কান্নার স্বর আচমকা থামল।]

মাধুরী ॥ (মুখ না ঘুরিয়ে, তেমনি দাঁড়িয়ে) অবুঝ···

রতিকান্ত ॥ (দূরে দাঁড়াল) নয়তো কি। সারা সময় ধরে শক্ত হাতে তুমি আমার টুঁটি চেপে ধরে বসে আছ···

[আস্তে ঘুরে দাঁড়াল মাধুরী। তার চোখের কোল বেয়ে তখনও অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। সারা মুখটি আর্দ্র।

[পদ্মকলির মতন অপরূপ মুখটি মলিন ফ্যাকাশে। মুখ ঘুরিয়ে মাধুরী নিস্পলক চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকল।

[চোখে চোখ পড়তে মাথা নীচু করল রতিকান্ত। তার ভেতরে অসম্ভব যন্ত্রণা। এই দৃষ্টি সে সইতে পারল না।]

রতিকান্ত ॥ (সোফার দিকে যেতে যেতে ক্ষোভের গলায়) আমার এই সুখের ঘর, আনন্দের সংসার আজ বিষের মতন। (অল্প থেমে) শান্তি কাকে বলে আমি ভুলে গেছি। (সোফায় বসে) চব্বিশটা ঘণ্টা ধরে এ-বাড়িতে অলক্ষ্মীর কান্না—(টেনে টেনে) এই কান্নার চাবুক মেরে প্রতি মুহূর্তে তুমি আমায় জানিয়ে দিচ্ছ, তুমি চাও চাও চাও···

মাধুরী ॥ (অধৈর্য রুষ্ট গলায়) হ্যাঁ চাই, চাইব ; এই চাওয়ার অধিকার আমার আছে···(রাগে কাঁপতে থাকে)

রতিকান্ত ॥ (সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে) তোমার অধিকার আমি অস্বীকার করি নি...

মাধুরী ॥ না কর নি, কিন্তু দিতেও পার নি কিছুই। সে ক্ষমতা তোমার নেই। মিথ্যে আশ্বাস আর স্তোকবাক্য দিয়ে আমাকে তুমি প্রতারিত করেছ, করছ। (তীব্র শ্লেষে এবং ঘৃণার গলায়) তুমি বুঝি ভেবেছ এ-বাড়ির খাট আলমারী আলনার মতন আমি একটা আসবাব···

রতিকান্ত ॥ মাধুরী...

মাধুরী ॥ তোমার সাড়ে তিন হাত চওড়া বিছানার শয্যাসঙ্গিনী ? না—(কান্নার গলায়) তোমার সাজানো ঘরের দামী আলমারীতে তুলে রাখা শখের পুতুল আমি নই···নই ··

[রতিকান্ত উঠল। বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে চুরুট ধরাল। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে দুবার পায়চারী করল। তারপর ঘুরে দাঁড়াল। এক পা এক পা করে এগিয়ে যাচ্ছিল স্ত্রীর দিকে।]

রতিকান্ত ॥ (বিদ্রূপ, উপেক্ষায় মুখ বিকৃত করে) আসবাব নও, পুতুলও না—তবে তুমি কী ?

মাধুরী ॥ আমি মানুষ, নারী···

রতিকান্ত ॥ (তীব্র শ্লেষের গলায়) মানুষ! কাকে মানুষ বলে তুমি জানো? (ঘৃণার সুরে) দু' বেলা দু' মুঠো অন্ন জুটত না পেটে; একটা ঘরে সতেরো জন মানুষ গরু-ছাগলের মতন গাদাগাদি করে থেকেছ, খেয়োখেয়ি করেছ—আবার বলছ তোমরা মানুষ! ছিঃ ছিঃ ছিঃ···

মাধুরী ॥ (প্রচণ্ড ধমকের গলায়) চুপ কর। (ব্যঙ্গসুরে) তাকিয়ে দেখ এই ছিটনো থুথু তোমার মুখেই পড়ছে। আমি গরু, আমি ছাগল কিন্তু সেই গরু ছাগলের পা চাটতে তোমার মতন মানুষই বারবার করে গোয়ালে ঢুকেছিল...

রতিকান্ত ॥ (তীব্র যন্ত্রণা-চাপা গলায়) হ্যাঁ, ঢুকেছিলাম। (অল্প নীরবতা) ভেবেছিলাম পঙ্ক থেকে আমি পদ্ম তুলে আনতে পারলাম। কিন্তু তখনও জানতাম না, এই ফুলে এত বিষ···এত তীব্র বিষ···

মাধুরী ॥ (ক্ষিপ্তের মতন কথা কেড়ে নিয়ে) বিষ! আমি বিষ! কিন্তু কে আমাকে এই বিষ করেছে? (ত্বরিতে সামনে এসে মুখোমুখি দাঁড়ায়। প্রচণ্ড রোষে তার মুখ বেঁকে এসেছে। মাধুরী অতি দ্রুত হাঁপাচ্ছিল) কই এসো, আমার সামনে এসে দাঁড়াও, চোখের দিকে তাকিয়ে বলো···(রতির দু' কাঁধের নীচ অংশ চেপে ধরে ঝাঁকুনি দেয়) বলো···বলো···(হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল মাধুরী)

[রতিকান্ত চুপ—যেন জুড়িয়ে গেছে, ভয় পেয়েছে। ধরাপড়া অপরাধীর মতন তার মাথা হেঁট; মুখে বিবেক দংশনের তীব্র জ্বালা। মাধুরী চায়, সে দিতে পারে না এই অক্ষমতার তীব্র আগুন রতিকান্তকে পোড়ায়।]

[অল্প সময় কারো মুখে কথা নেই। মাধুরীর করুণ কান্নার গমক আস্তে আস্তে আস্তে কমে আসে। সে ফোঁপাতে থাকে। ছেড়ে দেয় স্বামীকে এবং ধীর পায়ে জানলার দিকে এগোয়। এসে দাঁড়ায়। পেছন ফিরে চোখ মুছতে থাকে।

[এতক্ষণে মুখ তোলে রতিকান্ত। আগে নিজেকে দেখে। পরে ঘাড় ঘুড়িয়ে স্ত্রীকে। কোথায় বসবে

এমন ভাব নিয়ে রতি এগোয় কিন্তু বসে না। জানলার দিকে অল্প এগিয়ে দাঁড়ায় হেঁটমুখে। তারপর মুখ তোলে।

রতিকান্ত ॥ (স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে পরাজিত অক্ষমের মতন কাঁপা গলায়) মাধুরী...

[মাধুরী নিশ্চুপ।]

রতিকান্ত ॥ (সামান্য এগিয়ে গিয়ে অনেকটা সংযত গলায়) মাধুরী...

মাধুরী ॥ উঁ... (ফিরে তাকায় না, নড়ে না)

রতিকান্ত ॥ (অল্প আবেগে নরম গলায়) শোনো...

মাধুরী ॥ শুনছি

রতিকান্ত ॥ না তুমি শুনছ না। (রতিকান্ত এগিয়ে গিয়ে কাঁধে হাত রাখে, ধরে সোফার দিকে এগোয়) অতদূর থেকে আমার কথা তুমি কিছুতেই শুনতে পারছ না। চলো, আমার কাছে বসবে এসো... (মাধুরীর কাঁধের ওপর দিয়ে প্রসারিত বাহুর করপুট মেলে রতিকান্ত মাধুরীর গালে গাল রাখে, মুখ সরিয়ে এনে চোখের দিকে তাকায়) রাগলে তোমাকে খুব ভাল লাগে... (সোফায় এসে পাশাপাশি বসে) কার মতন দেখায় জানো?

মাধুরী ॥ কার...

রতিকান্ত ॥ আমার মা, মার

মাধুরী ॥ তুমি যে কী বলো...

রতিকান্ত ॥ সত্যি বলি, সত্যি

মাধুরী ॥ না, বলে না; ওসব কথা কখনও বলতে নেই...

(রতিকান্ত মাধুরীকে কাছে টানে। গায়ে হাত বুলোয়)

[এমন সময় শব্দ। দরজার বাইরের কড়াটা খুব জোরে কেউ নাড়ছিল। মাধুরী সরে গিয়ে দাঁড়াল। দু' জনে একসঙ্গে তাকাল দরজার দিকে। কড়াটা আবার খুব জোরে নাড়ার শব্দ বাজল। রতিকান্ত চুরুট ধরাল, ইশারা করতে মাধুরী গিয়ে দরজা খুলে দিল]

[দরজা খুলতে বাইরের সজোর ধাকায় পাল্লা দু'টো সশব্দে আছড়ে পড়ল। দু' পাশে দমকা হাওয়ার ঝাপটার মতন হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল মোহিনীমোহন। ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাকে আরো বেশি ক্লান্ত পরিশ্রান্ত এবং পোশাক ও চেহারায় বিপর্যস্ত বিশৃংখল দেখাচ্ছিল। অল্প হাঁপাতে হাঁপাতে মোহিনীমোহন গোটা ঘর দেখে নিচ্ছিল। মাধুরী ততক্ষণে ফিনফিনে পরদা টাঙানো দরজা পথে ভেতরে চলে গেছে]

[অবাক এবং বিস্ময়ের চোখে কাণ্ডটা দেখে নিচ্ছিল রতিকান্ত। সোফার ওপর সামান্য আলগাভাবে চুরুট হাতে সে বসেছিল। এবার উঠে টানটান হয়ে বসল। বার দু'য়েক নীরবে চুরুটে টান দিয়ে দরজায় তাকাতেই প্রচণ্ড বিস্ময়ের মধ্যে ভীষণভাবে চমকে উঠল যেন ভয় পেয়েছে।]

[দরজায় চৌকাটে ভ্রমর। ইতস্তত এবং কুণ্ঠার ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রতিকান্তর চোখে চোখ পড়তে সে দৃষ্টি নামিয়ে নিল। রতিকান্ত তার চোখ সরিয়ে এনে এই বন্য-স্বভাব আগন্তুককে খানিক দেখল। পরে আবার তাকাল ভ্রমরের দিকে]

রতিকান্ত॥ (বিস্ময়ে, চমকানোর ভাব লুকিয়ে কৃত্রিম সংযত গলায়) তুমি…

[ভ্রমর সোজাসুজি তাকাল রতিকান্তর দিকে। ঘাড় ঘুড়িয়ে মোহিনীমোহনও ভ্রমরকে দেখল]।

ভ্রমর॥ (এগিয়ে এসে মোহিনীমোহনের পাশে রতিকান্তর মুখোমুখি দাঁড়াল। তার শরীর যেন ভেঙে পড়তে চাইছে ক্লান্তিতে। তার মধ্যেও অল্প উত্তেজনা মিশ্রিত) হ্যাঁ আমি।

রতিকান্ত॥ কিন্তু এই কি কথা ছিল ?

ভ্রমর॥ না, ছিল না—

রতিকান্ত॥ (ত্বরিতে কথা কেড়ে নিয়ে) হ্যাঁ ছিল না—। (অল্প থেমে অধৈর্যভাবে) ছিল না, তবু তুমি এসেছ। তোমার প্রতিশ্রুতি প্রতিজ্ঞা…

ভ্রমর ॥ সব মনে আছে আমার। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো··· (অনুনয়ে গলা কাঁপে)

রতিকান্ত ॥ (উপেক্ষা ও ঘৃণার ভাব ছুঁড়ে দিয়ে) বিশ্বাস! (চুরুট রেখে দিয়ে সোজাসুজি তাকায়) বিশ্বাস আমি করতাম, করেছিলাম। কিন্তু এখন বুঝছি তা যোগ্য পাত্রে রাখা হয় নি। (উত্তেজিতভাবে দ্রুত গলায়) তুমি তা ভেঙে চুরমার করে ফেলেছ···

ভ্রমর ॥ (কাকুতি মেশোনো কণ্ঠে) আমায় আগে বলতে দাও, শোনো···

রতিকান্ত ॥ (মুখ বিকৃত করে) তোমার সঙ্গে শোনাশুনির পালা অনেক দিন আগেই আমার চুকে গেছে···

ভ্রমর ॥ (কষ্ট চেপে, অল্প যন্ত্রণাকাতর গলায়) হ্যাঁ গিয়েছিল···

রতিকান্ত ॥ গিয়েছিল··· (গলায় বিস্ময়ের ভাব ফুটে ওঠে) হোয়াট ডু ইউ মীন? হাত পেতে তুমি নাও নি? এক আধটা পয়সা নয়, একুশ হাজার টাকা আমি গুণাগার দিয়েছি তোমার জন্যে। (টানা গলায়) কলে ফেলে তুমি তা আদায় করে নিয়েছিলে···

মোহিনী ॥ (ক্ষিপ্তের মতন কথার ওপর হুঙ্কার ছাড়ে) স্টপ, স্টপ ইউ সোয়াইন··· (মোহিনী গোমরাচ্ছিল) নইলে ভদ্র মেয়েছেলের সঙ্গে কি করে কথা বলতে হয় আমাকেই তার শিক্ষা দিয়ে দিতে হবে।

ভ্রমর ॥ (সামান্য এগিয়ে অস্বস্তি চাপা গলায়) চুপ···চুপ···

[রতিকান্তর মুখচোখে রক্ত উঠে এসেছে। কোনোক্রমে নিজেকে সংযত করল সে। চুরুট তুলে নিল হাতে। সোফায় হেলান দিয়েছে।]

রতিকান্ত ॥ (ভ্রমরের দিকে তাকিয়ে) ও···তা হ'লে গুণ্ডা নিয়ে তুমি চড়াও হয়েছ?

মোহিনী ॥ (হিংস্র বাঘের মতন হুঙ্কার ছাড়ে) অ্যাই শালা শুওর···

[মোহিনী প্রায় লাফিয়ে পড়তে গিয়েছিল রতিকান্তর ওপর। কিন্তু পারল না। নিমেষে দু' জনের মাঝখানে ছিটকে সরে এল ভ্রমর। এসে মোহিনীমোহনকে আটকাল। ধরল। ও দিকের সোফায় বসাচ্ছিল। ভেতরের দরজার ফিনফিনে পরদায় একটি ছায়া ততক্ষণে ফুটেছে।]

ভ্রমর ॥ কী করছ তোমরা ছিঃ ছিঃ ! আমি আগে বলি, আমায় আগে বলতে দাও...শোনো...

[রাগী শুওরের মতন ফুঁসতে ফুঁসতে সোফায় বসল মোহিনীমোহন। তার অগ্নিদৃষ্টি তখনও রতিকান্তর ওপর নিবদ্ধ।]

ভ্রমর ॥ (কৃত্রিম হাসির রেশ মুখে টেনে এনে) পরিচয় হ'ল না, জানাজানি না তার আগেই তোমরা...এই যে, ইনি, ইনি আমার স্বামী মোহিনীমোহন চাকলাদার...আর উনি, উনি সেই, সেই...যার কথা বলেছিলাম তোমাকে ? আমার সন্তানের পিতা... (হৃদয় যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে এমন যন্ত্রণা চেপে) রতিকান্ত সমাজপতি—

[ফিনফিনে পরদার ওপাশের মূর্তিটা আচমকা সরে যায়। ভ্রমরের কথা শেষ হতে, মোহিনী দাঁতে দাঁত ঘষে। এমনভাবে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে রতিকান্তর দিকে তাকাচ্ছিল, যেন একটু সুযোগ পেলে ও তাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে।]

[ভ্রমর সামান্য পাশের দিকে সরে এল।]

ভ্রমর ॥ আমি আসতাম না, বিশ্বাস করো, আসতে আমি চাই নি...কিন্তু—

রতিকান্ত ॥ (কথা কেড়ে নিয়ে) কিন্তু তুমি এসেছ। কেন এসেছ, কি কারণে, সে কথা শোনবার আগ্রহ আমার একটুও নেই ; ধৈর্যও না...

ভ্রমর ॥ তা হ'লে অনাগ্রহ, অধৈর্যতা নিয়েই আমার কথাগুলো তোমায় শুনতে হবে।

রতিকান্ত ॥ আমি তো বারবার বলছি, আমি শুনব না—কিছুতেই না। কারণ তোমার মতলব আমি ধরে ফেলেছি।

ভ্রমর ॥ মতলব !

রতিকান্ত ॥ তা ছাড়া আর কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে তোমার আসার ?

ভ্রমর ॥ এ তুমি ভুল করছ, ভয়ঙ্কর ভুল...

রতিকান্ত ॥ ভুল ! তোমার মতন স্ত্রীলোকের কাছ থেকে সে শিক্ষাও আমাকে নিতে হবে না ? না, ভুল আমি করি নি, করিনা। তা যদি কেউ করে থাকে, তবে তুমি—আমি নই

ভ্রমর ॥ আমি...

রতিকান্ত ॥ (অত্যন্ত জোর দিয়ে) তুমি নও ?

ভ্রমর ॥ (আগে মাথা কাঁপিয়ে সম্মতিসূচক ইশারা করে) হ্যাঁ আমি··· (রোরুদ্ধমান গলায়) হ্যাঁ আমি··· (চোখ বুঁজে ভীষণ আকুলতা ও যন্ত্রণায় চিবুক তোলে। বন্ধ চোখের কোলে টলটল করছিল অশ্রু। নিশ্বাস চেপে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে। ভাঙা গলায় চিৎকার করে) হ্যাঁ আমি। (কান্নার গমক কমে এলে) হা ঠাকুর, পৃথিবীর সকল ভুলের বোঝা তুমি আমার ওপর চাপালে···। পেটের দায়ে চাকরী করতে আসা আমার ভুল, সামনে দাঁড়ানো এই শয়তানের নোংরা ইতর প্রস্তাবে অসহায় সম্মতি জানানো আমার ভুল···

[মুখে চোখে ভীষণ যন্ত্রণা ক্ষুব্ধতা এবং রুদ্ররোষ নিয়ে উঠে দাঁড়াল রতিকান্ত। বাইরের দরজার দিকে হাঁটছিল। মোহিনীর ক্রুর বীভৎস দৃষ্টি তখনও রতিকে অনুসরণ করছে।]

ভ্রমর ॥ কুমারী অবস্থায় ওর সন্তান গর্ভে ধরাও আমারই ভুল···এত ভুল তুমি—

রতিকান্ত ॥ (দাঁড়িয়ে বিরক্তি মাখানো গলায়) ভ্র-ম-র···

[খানিক সময় ধরে এ-ঘরে ভ্রমরের কান্নার রেশ জেগে থাকল। উচ্চগ্রাম থেকে নেমে আসা সুরটি তখনও প্রবাহিত। রতিকান্ত অস্থিরভাবে পায়চারী করছিল। মোহিনীর রক্তচক্ষু তখনও রতিকান্তর ওপর।]

[ততক্ষণে পরদার ওপাশে আবার ছায়াটা ফুটে উঠেছে।]

[নিজেকে সামলে নিতে খানিক সময় লাগল ভ্রমরের। আঁচলে চোখ মুছে নিল ভ্রমর। স্থির দৃষ্টিতে তাকাল রতিকান্তর দিকে।]

ভ্রমর ॥ (অল্প কাঁপা ঈষৎ সংযত গলায়) তুমি আমাকে বহুভাবে বিক্ষত করেছ ; আমি ভেবে পাই না মানুষ কী করে এত নীচ এতো হৃদয়হীন হতে পারে···

রতিকান্ত ॥ কথাগুলো অনেক পুরনো—, চোদ্দ বছর আগেও তোমার মুখ থেকে ঠিক এই কথাই আমি শুনেছি। আমি নীচ আমি হৃদয়হীন। কিন্তু অত বড় উদার হৃদয় যার তার হাত তো কই কাঁপেনি! নীচ, হীন মানুষের একুশ হাজার টাকাটা বুঝি অমৃত ছিল ?

ভ্রমর ॥ টাকা তুমি আমায় এমনি দাওনি। নিজের পথ নিষ্কণ্টক করতে, কলঙ্কের হাত থেকে মান মর্যাদা সম্ভ্রম রক্ষা করতে ওই টাকা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে ন'দিনের বাচ্চাশুদ্ধ তুমি আমায় রাস্তায় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলে···

রতিকান্ত ॥ আমি, আমি তোমায় অনুনয় করে বলছি, তুমি যাও, দয়া করে চলে যাও ; (ভীষণ চিৎকার করে) প্লী—জ লিভ মি···

[মোহিনী ঝাঁপিয়ে পড়তে যায়। ভ্রমর বাধা দেয়]

ভ্রমর ॥ তোমার মর্যাদা আমি ধুলোয় মিশিয়ে দিতে আসিনি আঘাত দিতেও না—তবু তুমি বারবার বাসি জলে জোর করে আমাকে ডোবাতে চাইছ। এ যে আমার কতবড় দুর্ভাগ্য, তোমার মতন একটা পাষণ্ডের সামনে এসে আবার আমাকে দাঁড়াতে হয়েছে···

রতিকান্ত ॥ (সোফায় এসে বসে) কী তুমি চাও, কী পেলে তুমি আমায় নিস্কৃতি দেবে ; টাকা··· ?

ভ্রমর ॥ (অল্প দৃঢ় গলায়) না।

রতিকান্ত ॥ (দ্রুত গমগমে গলায়) তবে তুমি কী চাও, কী ?

ভ্রমর ॥ (অল্প কাঁপা গলায়) আমার ছেলে।···

রতিকান্ত ॥ (অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে) ছেলে !···

ভ্রমর ॥ (নিশ্বাস এবং কষ্টের ভার চেপে অনুনয়-মেশানো আকুল গলায়) তাকে তুমি ফিরিয়ে দাও। হাত জোড় করে বলছি, তাকে···

রতিকান্ত ॥ (হাসি এবং উপেক্ষার ফুৎকারে কথা উড়িয়ে দিয়ে) বা-বা-বা, বাঃ ! চমৎকার, চমৎকার ষড়যন্ত্র—

মোহিনী ॥ (আচমকা হুঙ্কার ছাড়ে) অ্যাই রাস্কেল, মুখ সামলে। পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চালাকি ? ওসব চালাকিতে (বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে ভ্রমরকে দেখায়) ওই মেয়েছেলেরা ভুলবে ; আমি না। (দাঁতে দাঁত চেপে) ছেলে কোথায়—

রতিকান্ত ॥ (গোবেচারার মতন তাকায়) তার মানে...

ভ্রমর ॥ (ভীষণ ভয় পেয়ে চাপা ফ্যাসফেসে গলায়) তুমি, তুমি জানো না ?

মোহিনী ॥ (রাগে গর্জায়) সমাজপতি, আমি সোজা কথার মানুষ।

রতিকান্ত ॥ (উপেক্ষা ছুঁড়ে দিয়ে) উঁ তাই নাকি ? (চিবিয়ে চিবিয়ে লঘু গলায়) সোজা—কথার—মানুষ ? (গম্ভীর গলায়) বাইরের সোজা পথটাও দেখিয়ে দেবার জন্যে আশা করি আমাকে দারোয়ান ডাকতে হবে না।

ভ্রমর ॥ এ তোমরা কী করছ···ছিঃ ছিঃ ছিঃ। (অসম্ভব এক যন্ত্রণা ভ্রমরের মুখেচোখে)

মোহিনী ॥ দারোয়ান! (শব্দ করে চাপা উপেক্ষা এবং হাসির ফুৎকার ছুঁড়ে দেয়। শেষে টানা গম্ভীর গলায়) সমাজপতি, আমি মোহিনীমোহন চাকলাদার (মুখে নৃশংস ক্রূরতা উপচে পড়তে চায়। দাঁতে দাঁত ঘসে গুমরোনো গলায়) আমি যা চাই (মোহিনী উঠে দাঁড়াতে যায়।) 'তা আমি আদায় করে নিতে জানি (টিপয়ের ওপর প্রচণ্ড মুষ্টাঘাত করে উঠে দাঁড়ায়)।

ভ্রমর ॥ (আচমকা ছিটকে গিয়ে জাপটে ধরে মোহিনীমোহনকে) না না না, তুমি উঠো না, উঠো না—তোমাকে আমার বড় ভয়, ভীষণ ভয়···

[ক্ষিপ্ত উন্মাদ মোহিনী প্রচণ্ড আক্রোশে হাতের ঝটকানি মেরে ফেলে দেয় ভ্রমরকে। ভ্রমর হুমড়ি খেয়ে পড়ে পাশের সোফার ওপর। প্রচণ্ড আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও ভ্রমর নিমেষে উঠে দাঁড়ায়। দু'হাত দু'দিকে প্রসারিত করে পথ আগলে দাঁড়ায় মোহিনীর]।

ভ্রমর ॥ (অল্প হাঁপাতে হাঁপাতে রতিকান্তর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে) এখনও কি বুঝতে পারছ না, কেন আমি আবার তোমার সামনে এসেছি, আসতে বাধ্য হয়েছি...

মোহিনী ॥ (দাঁতে দাঁত ঘসে, শুওরের মতন একরোখা ভাবে চাপা ফ্যাসফেসে গলায় এক নিশ্বাসে) পথ ছাড়ো ভ্রমর...

ভ্রমর ॥ (মোহিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে, ব্যস্ত অনুনয়ের গলায়) তুমি শান্ত হও, কথা শোনো আমার। (এক চোখ মোহিনীর ওপর রেখে আর চোখে রতিকান্তর দিকে তাকিয়ে, ক্রমবর্ধমান উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে) কই, তুমি কেন চুপ করে আছ? বলো···বলো··· (হাত নামিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়)

রতিকান্ত ॥ (বিরক্ত কুপিত গলায় চিৎকার করে) আমি তো বলছি, আমি জানি না—

[মোহিনী চাপা হুঙ্কার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়েছিল ভ্রমর হাত বাড়িয়ে তাকে রুখলো। এবং ত্রস্ত্যে মোহিনীকে আড়াল করে সোজা তাকাল রতিকান্তর দিকে।

ভ্রমর ॥ (ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে গলা গম্ভীর, দৃঢ়) জানো।

রতিকান্ত ॥ (একগুঁয়ে জেদের মতন গলায়) না।

ভ্রমর ॥ (আরও উত্তেজিত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে একনিশ্বাসে) আমার হাতে প্রমাণ আছে।

রতিকান্ত ॥ প্রমাণ…

ভ্রমর ॥ (আরও উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে) হ্যাঁ, তাকে তুমি নিয়ে এসেছ…

রতিকান্ত ॥ (হাঁপাতে হাঁপাতে চিৎকার করে) অসম্ভব…

ভ্রমর ॥ (উত্তেজনার শেষ ধাপে পৌঁছে চরম হাঁপাচ্ছিল। ঢোঁক গিলল। দ্রুত গলায়) আমরা, আমরা আশ্রম থেকে আসছি (আবার ঢোঁক গিলে) গুরুজী…

রতিকান্ত ॥ (ক্ষিপ্তের মতন প্রচণ্ড চিৎকার করে) মিথ্যে কথা!

মোহিনী ॥ (রতিকান্তর কণ্ঠ ছাড়িয়ে চিৎকার করে) অ্যাই শুয়ার...

রতিকান্ত ॥ (আরও জোরে হুঙ্কার ছেড়ে) ইউ বাস্টার্ড...

মোহিনী ॥ বান্দচোৎ…

ভ্রমর ॥ (সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে) না—। (চিৎকার এ-ঘরে সশব্দে ফেটে পড়ে—যেন বোমা পড়ল। শব্দ করে জিভ-ঝোলা কুকুরের মতন হাঁপায়। একনিশ্বাসে মাথা নাড়াতে নাড়াতে) নাঃ নাঃ। (আস্তে আস্তে চিবুক তোলে, মুখে অসম্ভব যন্ত্রণা থৈ থৈ করছিল) আমি আর পারছিনা, না—। (চোখ বোঁজে। দু' চোখের কোল বেয়ে জল নেমে আসে। যন্ত্রণা, আকুলতার ভাঙা গলায়) ঠাকুর, একটা মানুষ আমি...আমাকে তুমি দু'টো ভাগে ভাগ করে ফেলছ... (হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে ভ্রমর)।

[ভ্রমরের আকুল অস্থির গলার কান্না ভেঙে ভেঙে নামতে থাকে। ঘর গমগম করে। অন্য কোনো শব্দ নেই।]

[রতিকান্ত যন্ত্রণায় পুড়ছিল। বসে থাকতে না পেরে রতিকান্ত উঠল। অত্যন্ত দ্রুত পায়চারি করছিল। মাঝে মাঝে নিশ্বাস চেপে নিজের হাতে মাথার চুল খাবলে ধরে। তারপর আস্তে আস্তে ফিরে আসে। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত যেন প্রায় ধুঁকতে ধুঁকতে বসে পড়ে সোফায়। শরীর এলিয়ে দিয়ে দু' হাতের তালুতে মুখ ঢাকে।]

[মোহিনীমোহন ওৎপাতা বাঘের মতন অপেক্ষা করছে।]

রতিকান্ত ॥ (হাঁপায়। তার বুক হাপরের মতন ওঠানামা করে। চাপা ধরা গলায়) হ্যাঁ হ্যাঁ— (একটু থেমে ঢোঁক গিলে) আমি এনেছিলাম...

ভ্রমর ॥ (চমকে ওঠে, ভয়ে মুখ পাংশু) এনেছিলে...!

রতিকান্ত ॥ (মুখের হাত নামিয়ে তাকায়) হ্যাঁ, এনেছিলাম—

ভ্রমর ॥ (কাঁপা ধরা অস্থির গলায়) তবে, তবে সে কোথায় ?

রতিকান্ত ॥ (মুখ ঘুরিয়ে পাশে তাকায়) জানি না...

মোহিনী ॥ (চাপা উত্তেজনা) সোয়াইন...তুমি তাকে খুন করেছ...

ভ্রমর ॥ (আর্তগলায় চিৎকার করে ওঠে) আ— — — —

রতিকান্ত ॥ (হাঁপায়, কথা বলে না। মাথা নেড়ে জানায়, না-না।)

মোহিনী ॥ (প্রচণ্ড রাগে ক্ষ্যাপা শুওরের মতন গো গো ক'রে) সমাজপতি...

রতিকান্ত ॥ (মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না, তবু কোনোক্রমে কয়েকবার মাথা নাড়ে, ঢোঁক গেলে) একটু চুপ কর তোমরা, একটু চুপ। (অল্প থেমে) আমায় নিশ্বাস নিতে দাও—আমি বলছি...বলছি...

[রতিকান্ত হাঁপাতে থাকে। তার মুখেচোখে যন্ত্রণা অনুশোচনা কষ্ট। সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে সে চোখ বুঁজল—সমস্ত মুখের চামড়া কুঁচকে এসেছে। হাপরের মতন ওঠানামা করছিল বুক।]

[গোটা ঘর নিঃশব্দ। বাইরে যাবার দরজার পরদা কাঁপছিল, ভেতরের দরজার পরদাও অস্থির। এ-পরদার ওপাশে ফুটে ওঠা ছায়াটাও দুলছিল। ভ্রমর এবং মোহিনী উদগ্রীব হয়ে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। অল্পক্ষণ পরে ভ্রমর পা বাড়াল। সামনে। আস্তে আস্তে সে এগিয়ে এল, এসে দাঁড়াল রতিকান্তর মাথার কাছে। মুখেচোখে তার মায়া মমতা বেদনার ভাব। ভ্রমর হাত বাড়িয়েছিল, রতিকান্তর মাথায় রাখতে—আচমকা তার চোখ মোহিনীর ওপর পড়াতে ভ্রমর হাত গুটিয়ে নিল।]

রতিকান্ত ॥ (টানা গলায়) আমি নির্দয় পাষাণ হৃদয়হীন ইতর—এই কটা দিকই মাত্র সবাই জানল, কিন্তু আমার যে যন্ত্রণা, দাহ ; আমিও যে কিছু চাই, চাইতে পারি—কেউ বুঝল না সে কথা, কেউ না... (ঘাড় হেঁট করে মোহিনী দু' হাতের কনুই হাঁটুর ওপর রেখে দু' হাতের মুঠিতে শক্ত করে নিজের চুল চেপে ধরে) তুমি তো জানো ভ্রমর, তোমাকে বিদেয় করে আমি নিস্কৃতি পেতে চেয়েছিলাম...

ভ্রমর ॥ (নরম কোমল মমতার গলায়)...হ্যাঁ...

রতিকান্ত ॥ (যন্ত্রণায় মুখচোখ কুঁচকে) কিন্তু পাই নি। (অল্প হাঁপাতে হাঁপাতে) তোমার পেছনে আমার লোক ছিল, তারা এসে খবর দিয়েছিল আমাকে। বলে দিয়েছিল সব কথা···

ভ্রমর ॥ (বিস্ময়ের গলায়) কথা...

মোহিনী ॥ (চিৎকার করে) আঃ, তুমি কেন বাধা দিচ্ছ? বলতে দাও... (রতির দিকে তাকিয়ে) কী, কী কথা বলে দিয়েছিল?

রতিকান্ত ॥ আশ্রম। (অল্প থেমে) আশ্রমের কথা। (ভ্রমরের দিকে চোখ তুলে) বোধ করি নার্সিংহোম থেকে বেরোবারও বেশ কিছুদিন পরে...

ভ্রমর ॥ হ্যাঁ, প্রায় দু' হপ্তা, দু'হপ্তা আমি ভেবে পাই নি কী করব।...শেষে...

[মোহিনী এতক্ষণে উঠল, সিগ্রেট ধরালো। একমুখ ধোঁয়া ছুঁড়ে দিয়ে সোফার পাশে এসে দাঁড়াল। স্থির চোখে লক্ষ্য করে যাচ্ছিল সামনের দু'জন মানুষকে]

রতিকান্ত ॥ (অল্প হাঁপাতে হাঁপাতে সামান্য উত্তেজিত গলায়) শেষে আশ্রমেই তুমি নির্বাসন দিয়ে এলে ছেলেটাকে। আমি আঁচল ভরে তোমাকে অর্থ দিয়েছিলাম। তবু···

ভ্রমর ॥ (উত্তেজনা চাপতে চেষ্টা করেও পারছিল না) তবু দিতে হয়েছিল। (বুক ওঠানামা করছে ভ্রমরের) তুমি ভুলে যাচ্ছ, আমি কুমারী ছিলাম। লোকে আমায় চিনত। তা ছাড়া ঐ ছেলে বড় হয়ে যখন শুধতো...

রতিকান্ত ॥ (অল্প থেমে) কী কুক্ষণে যে তোমার পেছনে আমি লোক লাগিয়েছিলাম, সেই আমার সর্বনাশ...

ভ্রমর
মোহিনী } সর্বনাশ...

রতিকান্ত ॥ হ্যাঁ ঠিক তাই। খবর পেয়ে প্রথম দু'একদিন আমি আশ্রমে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম আর যাব না। কিন্তু বিকেল হলে আমি স্থির থাকতে পারতাম না। আশ্রম আমায় টানত—কিছুতেই না গিয়ে থাকতে পারি নি আমি।—দুটো কচি হাতের ডাক, নিটোল পবিত্র নিষ্কলঙ্ক একখানি মুখ...আধো আধো হাসি...ফুটি ফুটি কথা...(দু' হাঁটুতে কনুই রেখে দু'হাতের তালুর অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে সমস্ত শরীরে ঢেউ তুলে নিরুচ্চার কান্নায় ভেঙে পড়ে)।

ভ্রমর ॥ ওঃ তুমি চুপ করো—বলো না, দোহাই বলো না…(কান্নায় ভেঙে পড়ে)

মোহিনী ॥ (হুঙ্কার ছেড়ে সোফার সামনে এগিয়ে যায়) না—বলবে। তুমি না সইতে পারো, বাইরে গিয়ে দাঁড়াও ; আমি শুনব। (কোমর ভেঙে নীচু হয়ে মুখ বাড়িয়ে দেয় রতিকান্তর দিকে। গলা কাঁপছিল মোহিনীর। স্বরে চাপা উত্তেজনার আভাষ) সেকি…সেকি—সমাজপতি বাবা বলে ডেকেছিল… (কাঁপতে থাকে মোহিনী)

রতিকান্ত ॥ (কথা না বলে যন্ত্রণা চাপে)

মোহিনী ॥ (উত্তেজনার মধ্যেও অল্প অনুনয়ের গলায়) স-মা-জ-প-তি…

রতিকান্ত ॥ (তালুতে মুখ ঢাকা অবস্থাতেই) হয়ত ডাকত (হাত আলগা করে মুখ তুলল রতিকান্ত। তার বুক বুঝি গুড়িয়ে যাচ্ছে। টানা গলায়) মুখে কথা না ফুটলেও তার স্বর আমি অন্তরে শুনেছিলাম… হ্যাঁ শুনেছিলাম, (দু'হাতের আঙুল চুলে গুঁজে দেয়) হ্যাঁ আমি (প্রাণপণে মুঠো করে ধরে চুল) শুনেছিলাম। (তীব্র যন্ত্রণায় মাথা নাড়তে থাকে। হাত ছেড়ে দেয়। আকুল টানা গলায়) যদি নাই শুনতাম তবে এমন করে আমি নিঃস্ব হয়ে যেতাম না ; না—। ঐ ডাক শক্ত হাতে ধরে বারবার আমাকে ঝাঁকুনি দিয়েছে… (রতিকান্ত উঠল, কোনদিকে যাবে ভেবে পাচ্ছিল না। বাইরের দরজার দিকে যেতে যেতে) আর সেদিন, আমি বুঝেছিলাম, আমি বাঁচতে চাই—আমার সন্তানের মধ্যে আমি জীবিত থাকতে চাই…

[প্রচণ্ড ব্যথায় যেন ভ্রমরের হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে যাচ্ছে। করুণ সহানুভূতির চোখে সে রতিকে দেখছিল, সমস্ত মুখে যেন দরদ এবং অনুতাপ ছড়ানো।]

মোহিনী ॥ (বিদ্রূপের গলায়) বাঁচার নেশা তা হ'লে মালিকের আসনও টলায় ?

রতিকান্ত ॥ টলিয়েছিল। (অল্প থেমে) অবৈধ সন্তানের হাত থেকে মুক্তি পেতে, বৈধ সন্তানের পিতা হবার জন্যে আমি বিয়ে করলাম (এগিয়ে এসে সোফার পেছনে, পেছন দিয়ে বসে) কিন্তু নাঃ, ততক্ষণে ঈশ্বর আমার বিচার করে ফেলেছিল। (অল্পক্ষণ মুখে কথা নেই।) যথেচ্ছাচারিতা, উচ্ছৃঙ্খলতার পাপ সমস্ত শক্তি কেড়ে নিয়ে আমাকে অশক্ত… (অসহ যন্ত্রণায় নীচের ওষ্ঠ কামড়ে ধরে বুকে চিবুক

রাখল রতিকান্ত। তার সাবা মুখে যন্ত্রণার এলোমেলো রেখা) আমি চাই, আমার স্ত্রী প্রতি মুহূর্তে চাইছে—কিন্তু আমি পারি না, পারি না—(যন্ত্রণায় ছেঁড়া ফ্যাসফেসে গলায় চিৎকার করে) আই কাণ্ট···

ভ্রমর ॥ (আকুল মানুষের মতন এগিয়ে যেতে যেতে গাঢ় দরদের গলায়) না-না, তুমি...

মোহিনী ॥ ইউ ব্লাডি, স্টপ (মুহূর্তে লাফিয়ে পড়ে ভ্রমরের পথ আটকায় শালা গিধরের সবটাই বুজরুকি...

ভ্রমর ॥ (থেমে গিয়ে) তুমি একটু থামবে?

মোহিনী ॥ থামব! ও, দরদ? ওসব দরদ সোহাগ যতখুশি পরে করো—আমি দেখতে আসব না; (দাঁতে দাঁত চেপে আক্রোশের সঙ্গে) ছেলে বার করতে বলো আগে...

ভ্রমর ॥ (অসহায় করুণ চোখে রতিকান্তর দিকে তাকায়) কই, তাকে একবার আনো...

রতিকান্ত ॥ (মাথা নেড়ে না করতে থাকে) সে নেই...

ভ্রমর ॥ (চিৎকার করে কেঁদে ওঠে প্রায়) নে—ই!

মোহিনী ॥ শালা মিথ্যাবাদী শয়তান...

[মোহিনী ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়েছিল, ভ্রমর ছিটকে এসে তার গতি রুখলো। পরদায় ততক্ষণে আবার ফুটে উঠেছে সেই ছায়াটা।]

ভ্রমর ॥ একটু আগে যে তুমি বললে, তাকে এনেছিলে...

মোমিনী ॥ এনে নিশ্চয় ও তাকে খুন করেছে—

ভ্রমর ॥ (হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে) খু-ন···

রতিকান্ত ॥ (ছিটকে সরে গিয়ে ভীষণ আতঙ্কে) না-না, আমি না খুন করি নি...না। (পেছন মাথায় দু' হাত মুঠি করে রতিকান্ত জোর করে মাথা নামিয়ে আনে। অল্প নীরবতা। আপনা থেকেই হাত আলগা হয়ে আসে। ঝুলে পড়া মাথা সোজা করে সোফার দিকে এগিয়ে আসে মুমূর্ষু রোগীর মতন) হ্যাঁ এনেছিলাম...এনেছিলাম। (সোফায় বসে। কয়েকটা নীরব মুহূর্ত পার হয়) সেদিন বৃষ্টি হয়েছিল বিকেলের দিকে। (একটু থেমে) সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে এলে তাকে আমি নিয়ে এলাম; তুলে দিলাম স্ত্রীর কোলে। ও খুশী হয়েছিল, আমি হয়েছিলাম—সে যে কতবড় সুখ আমি বোঝাতে পারব

না। কিন্তু (সামান্য নীরবতার পর) তখনও জানতাম না তার আয়ু মাত্র তিনটা দিন।···

ভ্রমর ॥ (কেঁপে ওঠে ভয়ে। ব্যস্ত দ্রুত আকুল গলায়) কার আয়ু, কা-র ?

রতিকান্ত ॥ তিনদিন পরে ও আমার কোলের ওপর ফেলে দিয়েছিল সেই ছেলেকে (আচমকা ঘুরে গিয়ে সোফায় মুখ গুঁজল রতিকান্ত, ঘষছিল মুখ) [অল্প বাতাসে কাঁপা পরদা সামান্য সরে গেল একপাশে। মাধুরী। ঘরে ঢুকে মাধুরী এক মুহূর্ত দাঁড়াল। তার চোখের নীচে এবং গালে অশ্রু শুকনোর চিহ্নটি তখনও লেগে রয়েছে। ভ্রমর এবং মোহিনী একসঙ্গে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে মাধুরীকে দেখছিল।]

রতিকান্ত ॥ (ঠিক তেমনি সোফায় মুখ ঘষতে ঘষতে) আমি ভাবি নি, ও তার পরিচয় জানতে চাইবে···

[মাধুরী ততক্ষণে রতিকান্তর সোফার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। যেন মানুষ না, শক্ত কাঠ মাধুরী। নিশ্বাস চেপে রয়েছে, গলার শিরাগুলো ফুলে উঠেছিল, নাসারন্ধ্র স্ফীত, চক্ষু স্থির—সারা মুখে ভীষণ দৃঢ়তা ফুটছিল।]

মাধুরী ॥ (দৃঢ় সংযত গলায়) শোনো···

রতিকান্ত ॥ কে! ভয়ে (চমকে উঠে তাকায়। মাধুরীকে দেখে জুড়িয়ে যায়। তোতলানো গলায়) তু···তুমি

মাধুরী ॥ (জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে) তুমি আগে কেন সব কথা আমায় খুলে বল নি ?

রতিকান্ত ॥ কী কথা···

মাধুরী ॥ (ক্রমবর্ধমান উত্তেজনায়) কী কথা তুমি জানো না ? (নীচের ওষ্ঠ কামড়ে উত্তেজনা চাপতে চাইল মাধুরী কিন্তু পারছিল না) কেন বল নি, সেই ছেলে তোমার···

রতিকান্ত ॥ আমি···আমি···

মাধুরী ॥ হ্যাঁ তুমি। তুমি শুধু অক্ষম না—তুমি একটা ইতর, শয়তান, প্রতারক। নিজের সন্তান নিয়ে পর্যন্ত তুমি প্রতারণা করতে পারলে ···ছিঃ ছিঃ ছিঃ (ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নিতে গিয়ে কেঁদে ফেলল মাধুরী)।

রতিকান্ত ॥ (ব্যস্ত ব্যগ্র কণ্ঠে প্রায় অনুচ্চারিত গলায়) মাধুরী···

মাধুরী ॥ একটা সন্তানের জন্যে বছরের পর বছর তোমার পায়ে আমি মাথা

খুঁড়েছি। তুমি দিতে পার নি, আমি রক্তকই চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি এমন পাষণ্ড নিজের পাপ ঢাকতে আপন সন্তানকে তুমি মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়েছ…

[রতিকান্ত উঠল। এত ঘৃণা এমন তীব্র শ্লেষ সে সইতে পারছিল না। উঠে সরে এল রতিকান্ত। চুরুট ধরালো। ক' মুখ ধোঁয়া ছেড়ে একবার দেখে নিল মাধুরীকে। তারপর হাঁটতে হাঁটতে]

রতিকান্ত॥ আমি জানতাম সব দোষ, সকল অপবাদ তুমি আমার ওপরেই চাপাবে। অথচ আমি নির্দোষ ছিলাম।

মাধুরী॥ (মুখ বিকৃত করে ঘৃণার সুরে) নির্দোষ ছিলে…

রতিকান্ত॥ (আগের মতন টানা গলায়। পায়চারি করতে করতে) ছিলাম। (আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রায় জেদি মানুষের মতন গলায়) তোমার মতন তার রক্ত নিয়ে অমানুষিক খেলা আমি খেলি নি?

মাধুরী॥ আমি খেলেছিলাম—কারণ আমি মা; তার রক্তের পরিচয় আমার জানা দরকার ছিল। (অল্প থেমে) অসৎ রক্ত শরীরে থাকলে ও তোমাকে খুন করতে পারত, হয়তো, হয়তো তোমার এই এত টাকা, বিপুল সম্পদ, অগাধ সম্পত্তি মাত্র দু' দিনে ফুৎকারে উড়িয়ে দিত… গুণ্ডা বদমাসের ঔরসে জন্ম হলে, কে বলতে পারে ওই ছেলে বড় হয়ে আমাকে রেপ করত না? (দ্রুত কথা বলে হাঁপাতে থাকে মাধুরী। ঢোঁক গেলে) সেই জন্যে তার পিতৃপরিচয় আমি জানতে চেয়েছিলাম। উত্তরে তুমি কি বলেছিলে মনে আছে?

রতিকান্ত॥ বলেছিলাম, আমি জানি না…

মাধুরী॥ সত্যি কি তুমি জানতে না?

রতিকান্ত॥ জানতাম।

মাধুরী॥ তবে, কেন বলেছিলে সে-কথা?

রতিকান্ত॥ বলতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম।

মাধুরী॥ না বাধ্য না, ওটা তোমার স্বভাব। এত লাম্পট্য করেছ, সারাটা জীবন মিথ্যার মধ্যে ডুবে থেকেছ, প্রতারণা করেছ কিন্তু আপন সন্তানের মুখ চেয়েও কি শেষ সত্যি কথাটা তুমি বলতে পারলে না?

রতিকান্ত॥ হয়তো পারতাম তবু বলি নি। কারণ আমার মনে হয়েছিল সত্যি কথা আমাদের জীবনকে আরও জটিল করে তুলবে।

মাধুরী ॥ (উত্তেজনায় ঘৃণায় ব্যঙ্গের সুরে) তোমার মনে হয়েছিল ?

রতিকান্ত ॥ (কথা না বলে মাথা নাড়ল—হ্যাঁ)

মাধুরী ॥ (তীব্র উত্তেজনায়) মনে হয়েছিল ?

রতিকান্ত ॥ হ্যাঁ...

মাধুরী ॥ (পলকে ছুটে গিয়ে রতিকান্তর দু' কাধ ধরে প্রচণ্ড আক্রোশে ঝাঁকুনি দিয়ে) কই, আমার কথা তো মনে হয় নি তোমার...আমি কি এতই ঘৃণার উপেক্ষার আনাদরের যে (আক্রোশে ক্ষোভে উন্মাদের মতন রতিকান্তর পাঞ্জাবী দু' মুঠোয় ধরে পড়পড় করে ছিঁড়ে ফেলে হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে ভেঙে পড়ে)

রতিকান্ত ॥ মাধুরী... (মাধুরীকে জাপটে ধরে পতন থেকে রক্ষা করে) মাধুরী...

[মাধুরী কোনোক্রমে ডান হাতে সোফা ধরে দাঁড়ায়। মুখ নীচু ; কাঁদছিল। কান্নার গমক উচ্চগ্রাম থেকে ধীরে ধীরে নেমে এলে)

মাধুরী ॥ শুধু নিজের মনটাই দেখতে শিখেছ এত স্বার্থপর তুমি...কোনোদিন আমার মনের ওপর তুমি চোখ রাখ নি। তখন যদি তুমি সত্যি কথাটা বলতে, আমার বুক ভরত, মন ভরে যেত—এ পৃথিবীতে বাঁচার অর্থ আমি খুঁজে পেতাম—কিন্তু ঐ একটা মিথ্যা কথার জন্য আমি যে সর্বহারা হয়ে গেলাম···।

[কোনোক্রমে সোফার পেছন দিক প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে দাঁড়াতে পারল মাধুরী। তার হাত কাঁপছিল, উত্তেজিত শ্রান্ত শরীর টলছে।]

[এই ঘটনা দৃশ্য অসম্ভব কষ্ট দিচ্ছিল ভ্রমরকে। সে বিষণ্ণ, বিভ্রান্ত ক্লান্ত। চোখে শূন্য দৃষ্টি, মুখে নিদারুণ যন্ত্রণার ছায়া। যেন মাধুরী ভিন্ন না—সে বুঝি ভ্রমরেরই আত্মা।

[যন্ত্রচালিতের মতন দু'পা এগিয়ে গিয়েছিল ভ্রমর, মোহিনী তাকে এক ঝটকায় পেছনে সরিয়ে আনল।]

[স্ত্রীর কাছ থেকে সামান্য সরে এসেছিল রতিকান্ত। সে স্তব্ধ হতবাক অল্প বিমূঢ়। মাধুরীর এই অবস্থা, তার অভিযোগ এবং সর্বহারার মতন আকুল কান্না রতিকান্তর হৃদয়কে পীড়ন করছিল। অনুতপ্ত পীড়িত পরাজিত রতিকান্ত অল্পক্ষণ হেঁটমুখে দাঁড়িয়ে থাকল। কিছু ভেবে

নিচ্ছিল এতক্ষণে মুখ তুলল। তার চোখমুখে ব্যবহারে ইতস্তত কুণ্ঠা এবং যন্ত্রণা ফুটছিল। অবশেষে রতিকান্ত তার ডান হাত বাড়িয়ে দিল স্ত্রীর কাঁধের দিকে।]

রতিকান্ত ॥ একটু শান্ত হও, চুপ করো—(স্ত্রীর কাঁধে হাত তুলে দিয়ে) মাধুরী…

মাধুরী ॥ (কাঁধের ওপর থেকে ঝটকায় স্বামীর হাত সরিয়ে দিয়ে আচমকা ঘুরে দাঁড়াল। উত্তেজিত ক্রুদ্ধ গলায়) সরে যাও, তুমি আমায় ছুঁয়ো না…

রতিকান্ত ॥ (অল্প সরে এসে) তুমি আবার উত্তেজিত হচ্ছ মাধুরী…

মাধুরী ॥ (তেমনি জোর গলায়) হচ্ছি, হবোও।…আমি জানি তুমি আমায় তিলে তিলে মারতে চাইছ…

রতিকান্ত ॥ তার অর্থ ?

মাধুরী ॥ অর্থ ? (প্রচণ্ড ঘৃণায় মুখ বেঁকে আসে) তোমার কি লজ্জাঘেন্না বলতে কিছু নেই ? (অল্প নীরবতা। উত্তেজিত মাধুরী মুখ নামায়। তার গলার স্বর ধরে এসেছে) তোমার অক্ষমতা আমার মনকে নোংরা করেছে, তোমার স্পর্শ আমার শরীর অপবিত্র করেছে, দিনের দিন তুমি আমার আত্মাকে পর্যন্ত করছ কলুষিত। আমি আর...আমি আর কিছুতেই ভাবতে পারছি না, সারাটা জীবন একটা শয়তানের ঘর আমি কেমন করে করব !

রতিকান্ত ॥ (খুব সংযত গলায়) আমি আমার বলছি মাধুরী, বেশি উত্তেজিত হওয়া তোমার ভাল না।

মাধুরী ॥ তোমার মতন প্রবঞ্চকের মুখ থেকে ও-কথা আমি শুনতে চাই না…

রতিকান্ত ॥ তবে বুঝি আর কারো মুখ থেকে…

মাধুরী ॥ তোমার মুখে কুষ্ঠ হবে, ইতর…

রতিকান্ত ॥ (আচমকা ক্ষেপে) হোল্ড ইয়োর টাঙ, ইউ বীচ…। দিনের পর দিন তুমি সীমা ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছ।

মাধুরী ॥ (প্রচণ্ড ক্ষিপ্ততা চেপে) সীমা… ? সীমা… ? (ভীষণ জেদির মতন) হ্যাঁ সীমা ছাড়িয়ে চলে যাব। আমি তোমায় বুঝিয়ে দেব, কতদূর আমি যেতে পারি…

রতিকান্ত ॥ (ব্যঙ্গ ঘৃণা মিশ্রিত গলায়) ক-ত-দূ-র...উ ? (সংযত টানা গলায়)

তুমি ভুলে যাচ্ছ মাধুরী, এ-বাড়ির দরজার চাবি আমার হাতে। আর যে কোনো মুহূর্তে আমি তা···

মাধুরী ॥ (ক্রমবর্ধমান উত্তেজনায়) বন্ধ করবে? করো···। (মুখ বিকৃত করে) কপাট বন্ধ করে তোমার মিথ্যে সম্মান তুমি কিছুতেই বাঁচাতে পারবে না। (ভীষণ জেদিভাবে) আমি তা ধুলোয় মিশিয়ে দেব।

রতিকান্ত ॥ (ভীষণ অধৈর্যের গলায়) মাধুরী··· (ভ্রমর এবং মোহিনীর দিকে বার বার তাকায়)।

মাধুরী ॥ ভয় দেখাচ্ছ?

রতিকান্ত ॥ (ক্রোধ এবং উত্তেজনা চেপে) তুমি, তুমি আমাকে কী পেয়েছ? (অত্যন্ত ব্যস্ত অধৈর্য হয়ে অসহায়ের গলায়) আমাকে দিয়ে তুমি কী বলাতে চাও, কী?

মাধুরী ॥ ছেলে···

রতিকান্ত ॥ (ভয়ে পেছনে সরে আসে আচমকা) ছেলে!

ভ্রমর ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, ছেলে···(অল্প এগোয়).

মাধুরী ॥ (ধরা গলায়) তাকে তুমি ফিরিয়ে দাও, দোহাই (অল্প এগোয়) আমি তোমায় পায়ে ধরে বলছি···

রতিকান্ত ॥ (ত্রস্তে পেছনে সরে যায়) না না, না না···

মোহিনী ॥ (অল্প এগোয়) স-মা-জ-প-তি···

মাধুরী ॥ (কান্নার গলায় এগোতে এগোতে) শুধু একটিবারের জন্য তাকে ফিরিয়ে দাও···

ভ্রমর ॥ আজ চৌদ্দ বছর, চৌদ্দ বছর তার মুখ আমি দেখি নি···(এগোতে থাকে)

রতিকান্ত ॥ (পেছাতে পেছাতে···ভয়ে বিচলিতভাবে) কিন্তু···কিন্তু···

মোহিনী ॥ (এগোয়) ছেলের হদিস না পেলে এখানে রক্তারক্তি হয়ে যাবে সমাজপতি।

মাধুরী ॥ (উদ্‌ভ্রান্তের মতন এগোতে থাকে) ফিরে এলে তাকে আর আমি ছেড়ে দেব না···সে আমার, সে আমার···

[রতিকান্ত পা পা ক'রে ভয়ে পিছু হটছিল, বাকি তিনটি মানুষ তাকে যেন ধাওয়া করছে]

ভ্রমর ॥ তুমি চুপ করে থেকো না।

মোহিনী ॥ (চাপা হুঙ্কার ছাড়ে) স-মা-জ-প-তি···

মাধুরী ॥ (কান্নার গলায়) সে আমার কোল আলো করবে···

ভ্রমর ॥ বলো তাকে নিয়ে তুমি তুমি কী করেছ ?

মোহিনী ॥ ঘেঁটি ছিড়ে ফেলব উল্লুকের বাচ্চা···

ভ্রমর ॥ বলো, বলো সে বেঁচে আছে তো···

মাধুরী ॥ সারাজীবন ধরে সে আমায় ডাকবে, মা...মা···মা···

রতিকান্ত ॥ কিন্তু···কিন্তু···

মোহিনী ॥ হাত্তেরি শালার কিন্তু···

মাধুরী ॥ (হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে, যেন পাগল হ'য়ে গেছে) খোকা, আমার খোকা···

ভ্রমর ॥ কই কথা বলছ না কেন ?

[যেন তিন পাশ থেকে তিনজন সশস্ত্র শত্রু ক্রমশ এগিয়ে আসছে, রতিকান্তকে ধরতে ; ভয়, উৎকণ্ঠা, যন্ত্রণা, অসহায়ত্ব নিয়ে বিভ্রান্ত রতিকান্ত পা পা করে পিছু হটছিল] ।

[এই নাটকের ৩য় বা শেষ অ শ অন্যত্র দেখুন]
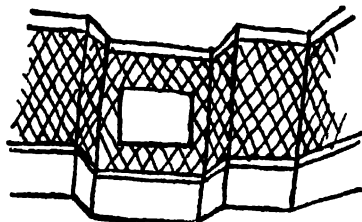
পূর্ণাঙ্গ নাটক

দৃশ্যের অতলে

[মরিস মেটারলিংক-এর The Sightless নাটকের বঙ্গরূপ]

অনুসরণেঃ **রমেন লাহিড়ী**

চরিত্র

গুরুদেব, তিনজন জন্মান্ধ লোক, বৃদ্ধতম অন্ধ লোক, পঞ্চম অন্ধ লোক, ষষ্ঠ অন্ধ লোক।

প্রার্থনারতা তিনজন অন্ধ স্ত্রীলোক, বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক, অন্ধ যুবতী একজন, একজন অন্ধ উন্মাদিনী।

উত্তরাঞ্চলের এক আদিম অরণ্য···যুগযুগান্তের সাক্ষী। মধ্যরাতের আকাশ চন্দ্রাতপে অসংখ্য তারার মালা। অরণ্যের মধ্যস্থলে বসে অতি বৃদ্ধ গুরুদেব, পরণে কালো আলখাল্লা। গর্তসংকুল, বিরাট এক প্রাচীন বটবৃক্ষের গায়ে হেলানো তাঁর মাথা ও শরীরের উপরের অংশ—একটু পিছন দিকে ঝোঁকা। মুখখানি তাঁর বিষণ্ণ···বিবর্ণ। রক্তহীন ঠোঁট দুটি ফাঁক হয়ে আছে। চোখের দৃষ্টি স্থির, নিষ্পলক—যেন বিশ্বচরাচরের সকল প্রত্যক্ষের সীমা পেরিয়ে কোন অনির্দেশ্য লক্ষ্যে নিবদ্ধ সেই দৃষ্টি অপরিসীম দুঃখ ও অনন্ত কান্নার রক্তাক্ত বেদনাকে নিঃশব্দে বহন করছে। মাথায় দুগ্ধশুভ্র চুলের রাশি··· জট পাকানো···কয়েক গুচ্ছ ছড়িয়ে পড়েছে···রাত্রির শব্দহীন অরণ্যের বিষণ্ণতার চেয়েও বিষণ্ণ, চতুষ্পার্শ্বের প্রত্যক্ষীভূত আর সব কিছুর চেয়েও উজ্জ্বল··· সেই মুখখানির ওপর। পরস্পর আবদ্ধ হাত দুখানি লুটিয়ে পড়েছে কোলে। ···ডানদিকে ছ'জন বয়স্ক অন্ধ লোক, কেউ বসে আছে পাথরের ওপর, কেউ গাছের গুঁড়ির ওপর আর কেউ বসে আছে শুকনো পাতার রাশির ওপর। বাঁদিকে, সমূলে উৎপাটিত একটি বৃক্ষ ও বৃহৎ পাথরের দ্বারা বিভক্ত আর একটি অঞ্চলে বসে রয়েছে ছ'জন স্ত্রীলোক। তারাও অন্ধ। পুরুষদের মুখোমুখি বসে তারা। তাদের মধ্যে তিনজন শুধু প্রার্থনা করে চলেছে আর নিস্প্রাণ স্বরে বিলাপ করছে···ছেদহীন···অবিরাম। অপর একজন অতি বৃদ্ধ। পঞ্চম মেয়েটিকে দেখলে মনে হয় যেন সে শুধু অন্ধ নয়··· ভাষাহীন

উন্মাদিনীও। তার কোলে একটি শিশু...ঘুমন্ত। ষষ্ঠ মেয়েটি সুন্দরী, উদ্ভিন্ন যৌবনা...মাথা থেকে এলিয়ে থাকা অসংখ্য চুলের রাশি তার সর্বাঙ্গ ঢেকে আছে। মেয়েদের এবং পুরুষদেরও পরিধানে প্রচুর পোষাক...একই বর্ণের। অধিকাংশই বসে আছে হাঁটুতে কনুইয়ের ভর দিয়ে...হাতের তালুতে চিবুকের ভর রেখে; এদিক ওদিক তাকানোর অভ্যাসটিকেও ভুলে গেছে তারা... দ্বীপের নৈঃশব্দের মধ্যে বিচিত্র কোনো শব্দ তরঙ্গ কানে শুনলেও এদিক ওদিক ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে না কেউ। জানা অজানা নানান বৃক্ষ আর লতাগুল্মের ভীড়ে স্থানটি ছায়াময়। গুরুদেবের আসন থেকে অনতিদূরে ফুটে আছে কিছু বিশীর্ণ বনমল্লিকা। পাতার ফাঁক দিয়ে এখানে সেখানে ছড়িয়ে পড়েছে চাঁদের আলো, তা সত্ত্বেও স্থানটিকে দেখাচ্ছে অন্ধকারাচ্ছন্ন...প্রাণহীন...

প্রথম অন্ধ লোক ॥ এখনও কি উনি আসেন নি !

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ আমার ঘুম ভাঙালে কেন তুমি ?

প্রথম অন্ধ লোক ॥ আমিও ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমিও।

প্রথম অন্ধ লোক ॥ এখনও কি উনি আসেন নি !

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ আমি তো শুনছিনে কোন পায়ের সাড়া।

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ এতক্ষণে নিশ্চয়ই সময় হয়েছে আতুরাশ্রমে ফেরবার।

প্রথম অন্ধ লোক ॥ আমরা জানতে চাই...কোথায় আমরা এসেছি।

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ উনি চলে যাবার পর থেকেই শীতটা যেন ঘন হয়েছে।

প্রথম অন্ধ লোক ॥ আমরা জানতে চাই...আমরা কোথায় এসেছি।

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ ওগো, কেউ কি তোমরা বলতে পারো...আমরা এসেছি কোথায়...

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ পথ চলতে চলতে কেটেছে দীর্ঘ সময়। আমরা নিশ্চয়ই আতুরাশ্রম থেকে এসেছি অনেক দূরে।

প্রথম অন্ধ লোক ॥ অহো, মেয়েরা রয়েছে ঠিক বিপরীতেই !

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ তোমাদের ঠিক বিপরীতেই রয়েছি আমরাও।

প্রথম অন্ধ লোক ॥ র'সো। আমি যাচ্ছি তোমাদের কাছেই। [সে ওঠে ও পথ হাতড়ায়] ওগো, কোথায় তোমরা কোন দিকে ? কথা বলো...যাতে আমি বুঝতে পারি তোমার রয়েছ' কোনখানে।

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ এই তো এখানে। পাথরের 'পরে বসে।

প্রথম অন্ধ লোক ॥ [কয়েক পা এগোয় সে। পথের ওপর পড়ে থাকা গাছ আর পাথরের ঢিবিতে পদে পদে বাধা পায়।] তোমাদের আর আমাদের মাঝে কি যেন সব পড়ে···

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ তার চেয়ে যে যেমন যেখানে আছি, তেমনি বসে থাকাই ভালো।

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ তোমরা 'কোথায় গা? কতদূরে? আসবে না কি আমাদের কাছে?

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ না গো! আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেও ভয় করে আমাদের।

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ উনি কেন আমাদের রেখেছেন এমন ভিন্ন ক'রে!

প্রথম অন্ধ লোক ॥ মেয়েরা যেন প্রার্থনা করছে!

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ তাই বটে! প্রার্থনা করছে। সেই অন্ধ স্ত্রীলোক তিনজন।

প্রথম অন্ধ লোক ॥ কিন্তু এতো এখন সময় নয়কো প্রার্থনার!

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ বলি, এখানে কেন? পুজোর ঘরে বসেই প্রার্থনা করলে পারে পালাক্রমে!

[অন্ধ স্ত্রীলোক তিনজন প্রার্থনা চালিয়েই যায়।]

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ আমি শুধু জানতে চাই, ঠিক কোনজনের পাশেই আমি রয়েছি বসে?

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ বোধ হয় আমার, আমিই রয়েছি তোমার পাশটিতে।

[চারপাশে হাত বাড়িয়ে তারা পরস্পরকে খুঁজতে থাকে।]

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ কি আশ্চর্য! আমরা তো কেউ ছুঁতে পারছি না কাকেও।

প্রথম অন্ধ লোক ॥ অথচ আমরা পরস্পরের থেকে ন'ইকো বেশী দূরে!

[সে নিজের চারপাশে হাতড়াতে থাকে। এক সময় তার হাতের ছড়িগাছা লাগে পঞ্চম অন্ধ লোকের গায়ে। অস্ফুট কাতর শব্দ করে ওঠে সে।] মনে হয় কানে শোনে না যে, সে-ই যেন রয়েছে আমাদের পাশটিতে!

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ আমি তো সাড়া পাচ্ছিনা সকলের। একটু আগেও আমরা সংখ্যায় ছিলাম ছ'জন।

প্রথম অন্ধ লোক ॥ আস্তে আস্তে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করি আমি। মেয়েদেরও প্রশ্ন করতে হবে। আমরা এসেছি কোথায়—সেই কথাটা জানা প্রয়োজন সবার আগে। সেই স্ত্রীলোক তিনজন এখনও তেমনই প্রার্থনা করে চলেছে—শুনতে পাচ্ছি। ওরাও কি আছে একসাথে ?

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ ওরা ব'সে আছে আমার ঠিক পেছনেই। একটা বড় পাথরের ওপর।

প্রথম অন্ধ লোক ॥ আমার পায়ের নীচে ঝরা পাতার রাশি।

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ আর সেই সুন্দরী ? সে কোথায় ?

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ সেও বসে আছে ওইখানে, প্রার্থনা করছে যারা তাদের কাছ ঘেঁসে।

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ আর সেই উন্মাদিনী আর তার ছেলে ? তারা কোথায় ?

অন্ধ যুবতী ॥ আহা ! শিশুটি ঘুমোচ্ছে। তার ঘুম ভাঙ্গিয়ো না যেন।

প্রথম অন্ধ লোক ॥ ওহো। আমাদের থেকে কত দূরে রয়েছো তুমি ! আমি ভাবছিলাম তুমি বসে আছো বুঝি আমার ঠিক পাশটিতে।

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ যা কিছু জানার ছিল জানা হলো। নিশ্চিন্ত। এসো, এবার যতক্ষণ না ফিরে আসছেন গুরুদেব, ততক্ষণ আমরা কথা বলে বলে সময়ের খেয়ায় পাড়ি দিই।

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ উনি বলে গেছেন, আমরা যেন তাঁর জন্যে নিঃশব্দ প্রতীক্ষায় সময় কাটাই।

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ কেন ? আমরা কেউ তো মন্দিরের মধ্যে বসে নেই ?

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ আমরা যে কোথায় তাও তো কেউ জানি না।

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ কেউ কথা না বললে আমার যে ভীষণ ভয় করে।

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ হ্যাঁগা, তুমি কি জানো গুরুদেব গেছেন কোথায় ?

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ মনে হচ্ছে যেন, কতক্ষণ হ'ল উনি চলে গেছেন আমাদের একলা বসিয়ে রেখে।

প্রথম অন্ধ লোক ॥ উনি ভয়ানক বৃদ্ধ হ'য়ে পড়েছেন। ওঁর দৃষ্টিও গেছে ক্ষীণ হ'য়ে। উনি মানতে চান না একথা, পাছে আর কেউ এসে স্থান করে নেয় আমাদের দলে। কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারি, উনি আর আদৌ দেখতে পান না চোখে। এবার অন্য আর কাকেও খুঁজে নিতে হবে, আমাদের নেতা হিসেবে। আমাদের কোনও কথাই উনি শুনতে চান

না। আমরা যেন দুর্বহ ভার হ'য়ে উঠেছি ওঁর কাছে। আতুরাশ্রমের সেবিকা তিনজন আর উনি—এই কজনেরই মাত্র আছে চোখে দেখার ক্ষমতা। ওঁরা সকলেই আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড়।—আমি নিশ্চয় ক'রে বুঝতে পেরেছি, উনি আমাদের সারাক্ষণ চালিয়ে নিয়ে এসেছেন ভুল পথে। এখন তাই উনি বেরিয়েছেন ঠিক পথটির সন্ধানে। কোথায় গেলেন উনি? এমন করে অজানা অস্থানে আমাদের ফেলে রেখে চলে যাওয়ার কোনও অধিকারই নেই ওঁর।

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক॥ উনি গিয়েছেন অনেক দূরের পথে। যাওয়ার সময়, মনে হ'ল যেন, মেয়েদের বলে গেলেন সেই কথাই।

প্রথম অন্ধ লোক॥ অহো! উনি তবে ইদানীং শুধু মেয়েদেরই বলেন সব কথা! আমরা তবে আর কেউ ন'ই? কিছু ন'ই? নাঃ, অবশেষে অভিযোগই আনতে হবে দেখছি ওঁর বিরুদ্ধে।

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক॥ কার কাছে যাবে তুমি তোমার অভিযোগ নিয়ে?

প্রথম অন্ধ লোক॥ সঠিক বলতে পারবো না তা। তবু চেষ্টা ক'রে যেতে হবে। চেষ্টা ক'রে যেতে হবে।...কিন্তু কোথায়ই বা যেতে পারেন উনি?... ওগো মেয়েরা, তোমাদেরই জিজ্ঞেস করছি—কেউ কি বলতে পারো কোথায় যেতে পারেন উনি?

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক॥ দীর্ঘ পথ হেঁটে এসে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলেন উনি। হ্যাঁ, বেশ মনে পড়ে—উনি যেন কয়েক মুহূর্ত আমাদের মধ্যে ব'সেও ছিলেন। সম্প্রতি দিন কাটছিল ওঁর মনের মাঝে অনেক যন্ত্রণা নিয়ে। দেহেও দেখা দিয়েছিল গভীর দুর্বলতা। রোগ নিরাময়কর্তা গত হবার পর থেকেই কি যেন এক বিষম অস্বস্তি পেয়ে বসেছিল ওঁকে। নিজেকে সর্বদাই অনুভব করতেন নিঃসঙ্গ ব'লে। বাক্যালাপেও জন্মেছিল অনীহা। কি যে ওঁর মনে হ'য়েছিল জানিনে, আজই আতুরাশ্রমের গণ্ডী ছেড়ে বেরিয়ে পড়বার কথা বারবার বলছিলেন উনি। উনি বলেছিলেন,...আসন্ন শীতের কুয়াশায় ঢাকা পড়বার আগেই এই দ্বীপটিকে শেষবারের মত দেখে নিতে হবে সূর্যের উজ্জ্বল আলোয়। উনি বলেছিলেন, এবারে শীত বোধ করি আরও তীব্র, আরও ঘন, আরও দীর্ঘস্থায়ী হ'য়ে দেখা দেবে। এরই মধ্যে উত্তরের বাতাসে ভর করে তুষারের কণা ছিটকে আসতে সুরু করেছে।...গভীর

উৎকণ্ঠায় ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিলেন উনি। কেননা শোনা যায় সম্প্রতি ব'য়ে যাওয়া প্রচণ্ড ঝড় আর বৃষ্টির দাপটে ধ্বস নেমেছে পাহাড়ে পাহাড়ে, নদীনালাগুলো গিয়েছে কানায় কানায় ভ'রে। আরও বলেছিলেন উনি,...সমুদ্রের অতলান্ত গাম্ভীর্যও যেন কোন অজানা আতংকে অস্থির হয়ে উঠেছে, অকারণ মত্ততায় ফুলে ফুলে উঠছে সমুদ্রের বুক,...উত্তাল ঢেউ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে এই দ্বীপের সুউচ্চ তটভূমির প্রান্তরেখা।...উনি নিজের চোখেই দেখতে চেয়েছিলেন, দেখেছিলেন, সবকিছু। কিন্তু কি যে উনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সে কথা বলেন নি কাউকেই। আমার মনে হয়, বেচারী পাগলী মেয়েটির জন্যে রুটি আর জলের সন্ধানেই গিয়েছেন উনি। যাবার সময়, আমাকে শুধু বলেছিলেন—ওঁকে যেতে হবে অনেক দূরের পথে। ওঁর জন্যে তাই অপেক্ষা করতেই হবে আমাদের।

অন্ধ যুবতী ॥ যাবার সময় আমার হাত দুটো ধরেছিলেন উনি। কি যেন এক অজানা আশংকায় তাঁর হাত দুটো কেঁপে কেঁপে উঠছিলো। তারপর আমাকে কাছে টেনে নিয়ে গভীর স্নেহে চুম্বন করলেন...

প্রথম অন্ধ লোক ॥ ও! ওঃ।

অন্ধ যুবতী ॥ আমি জানতে চাইলাম, কি হ'য়েছে। উনি বললেন,...কি যে হ'য়েছে তা আমিও সঠিক বলতে পারবো না...আরও বললেন—এবার বুঝি প্রাচীনের আধিপত্যের শেষ দিন ঘনিয়ে এলো... সম্ভবত...

প্রথম অন্ধ লোক ॥ এ কথা বলার উদ্দেশ্য? কেন উনি এমন কথা বললেন?

অন্ধ যুবতী ॥ আমিও ঠিক বুঝতে পারিনি সে কথার অর্থ। উনি শুধু বলেছিলেন...আমি চলেছি সেইখানে যেখানে রয়েছে বিশাল আলোকগৃহটি...

প্রথম অন্ধ লোক ॥ এদিকে কি কোথাও আছে কোনও আলোকগৃহ?

অন্ধ যুবতী ॥ হ্যাঁ আছে। এই দ্বীপের উত্তরে। মনে হয়, সে স্থানটি এখান থেকে বেশী দূরেও নয়। উনি বলেছিলেন, সেই আলোকগৃহ থেকে উৎসারিত পথ-নির্দেশী আলোর রেখা এখানকার গাছগাছালির পাতায় পাতায় এসে পড়েছে—তাও উনি দেখতে পেয়েছেন।

আজকের মত এমন বিষন্ন তাঁকে আর কখনও দেখি নি। কেন জানি না, আমার মনে হয়, সম্প্রতি ক'দিন ধ'রে উনি যেন কেবলই কাঁদতেন। ওঁকে দেখতে পেতাম না, তবু কেন জানিনা আমিও কাঁদতাম। উনি 'যে কখন চলে গেছেন, আমি তা মোটেই টের পাই নি। আমি ওঁকে আর কোনও কথাই জিগ্যেস করিনি। উনি যে ঘন ঘন চোখ মুচছেন আর সকলের জন্যে অখণ্ড শান্তি কামনা করছেন —শুধু এইটুকুই অনুভব করতে পারলাম আমি...

প্রথম অন্ধ লোক॥ আমাদের তো উনি এসব কিছুই বলেন নি!

অন্ধ যুবতী॥ উনি যখন কথা বলতেন, তখন তোমরা সবাই থাকতে অন্যমনস্ক হ'য়ে...

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক॥ উনি যখনই কথা বলতেন, তোমরাও শুরু করতে নিজেদের মধ্যে অকারণ কলগুঞ্জন।

দ্বিতীয় অন্ধ লোক॥ যাওয়ার সময়, আমি শুনেছি, উনি যেন বলেছিলেন— শুভরাত্রি।

তৃতীয় অন্ধ লোক॥ ওঃ—মনে হচ্ছে, সময়ের খেয়ায় ভর দিয়ে আমরা যেন অনেকখানি পথ পেরিয়ে এলাম।

প্রথম অন্ধ লোক॥ শুতে যাওয়ার আগে লোকে যেমন করে জানায় শুভরাত্রি, উনি চলে যাওয়ার সময় তেমনি করেই যেন বার দুই তিন বলেছিলেন... শুভরাত্রি। শুভরাত্রি। আমি অনুভব করতে পারছিলাম...শুভরাত্রি বলার সময় উনি চেয়েছিলেন আমারই দিকে। কেউ যখন কারও পানে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, তখন তার গলার স্বরও যায় বদলে!

পঞ্চম অন্ধ লোক॥ অন্ধজনে করুণা কর! অন্ধজনে করুণা কর!

প্রথম অন্ধ লোক॥ কে এমন কথাটা বললে বুদ্ধিহীনের মত!

দ্বিতীয় অন্ধ লোক॥ মনে হয়, কানে শুনতে পায় না যে, সে-ই বললে কথাগুলো।

প্রথম অন্ধ লোক॥ চুপ করো। এটা ভিক্ষার সময় নয়।

তৃতীয় অন্ধ লোক॥ ওগো, কেউ কি জানো—কোনদিকে গেছেন উনি জল আর রুটির সন্ধানে?

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক॥ উনি সমুদ্রের দিকেই গেছেন।

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ অতখানি বয়সে কেউ কি সমুদ্রের দিকে যেতে পারে হেঁটে !

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ আমরা কি সমুদ্রের কাছাকাছি এসে গেছি !

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ হ্যাঁ। চুপ করে বসো, কান পেতে শোন' নিবিষ্ট মনে…

[খুব কাছেই সমুদ্রের একটানা গর্জন আর তরঙ্গ ভঙ্গের শব্দ শোনা যায়।]

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ সেই অন্ধ স্ত্রীলোক তিনটির একটানা প্রার্থনার সুরই শুধু শুনতে পাচ্ছি আমি।

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ মন দিয়ে শোনবার চেষ্টা করো—ওদের প্রার্থনার সুর ছাপিয়ে শুনতে পাবে সমুদ্রের অশান্ত কল্লোল।

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ হ্যাঁ—অনতিদূর উৎস থেকে কি একটা শব্দ ভেসে আসছে যেন।

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ এতক্ষণ যেন ঘুমিয়ে ছিল ওই সমুদ্র। এবার বুঝি ঘুম ভাঙ্গছে ওর।

প্রথম অন্ধ লোক ॥ এখানে এইভাবে আমাদের ছেড়ে যাওয়া মোটেই উচিত হয়নি ওঁর ; ওই একটানা গর্জন শুনতে একটুও ভালো লাগছে না আমার।

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ তুমি তো ভালো করেই জানো—কত ছোট, কত সংকীর্ণ এই দ্বীপখানি। আতুরাশ্রমের চার দেওয়ালের গণ্ডীর বাইরে পা দিলেই শোনা যায় সমুদ্রের ঐ অবিরাম জলোচ্ছ্বাস।

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ আমি কখনও ঐ শব্দ শোনবার চেষ্টা করিনি।

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ মনে হচ্ছে, সমুদ্র যেন আজ আমাদের অনেক কাছে এগিয়ে এসেছে। এত কাছে বসে সমুদ্রের গর্জন শুনতে আমার একটুও ভালো লাগছে না।

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ আমারও না। তাছাড়া আতুরাশ্রমের গণ্ডী ছেড়ে বেরিয়ে আসতে কেউই চাইনি আমরা।

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ আজকের সকালটা ছিলো ভারী সুন্দর। উনি বলেছিলেন, সারাটা শীতকাল তো বন্দী থাকতে হবে আতুরাশ্রমের

চার দেওয়ালের গণ্ডীতে। তার আগে সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল শেষের এই ক'টি নির্মল দিন আমরা যেন পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করে নিই।

প্রথম অন্ধ লোক॥ আতুরাশ্রমে থাকতেই বেশী ভালো লাগে আমার।

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক॥ উনি বলতেন, এই যে ছোট্ট দ্বীপটিতে বাস করি আমরা, এর সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান আমাদের থাকা উচিত। উনি নিজেও কখনো দ্বীপটিকে সম্পূর্ণভাবে দেখে উঠতে পারেন নি। এই দ্বীপে নাকি এমন একটি পাহাড় আছে যার চূড়োয় আজ পর্যন্ত উঠতে পারে নি কেউই। এমন সব গভীর উপত্যকা আছে, যার বুকে পায়ের চিহ্ন পড়ে নি কারো। এমন সব গুহা আর গহ্বর আছে, যার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেনি কেউ। উনি বলতেন, কখন সূর্যের আলো এসে পৌঁছুবে তারই প্রতীক্ষায় মন্দিরের ছাদের নীচে নিষ্ক্রিয় হ'য়ে বসে থাকাটা অর্থহীন। উনি আমাদের সমুদ্রের তীরে উদার আকাশের নীচে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।...আজ উনি একাই সেখানে গিয়ে পৌঁচেছেন।

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক॥ উনি ঠিক কথাই বলতেন—বাঁচার মত বাঁচার কথা ভাবা উচিত সকলেরই।

প্রথম অন্ধ লোক॥ বাইরের জগতে দেখবার মত আছেই বা কি!

দ্বিতীয় অন্ধ লোক॥ আমরা কি এখন সূর্যালোকের মধ্যে বসে আছি?

তৃতীয় অন্ধ লোক॥ এখনও কি সূর্যের আলো আছে?

ষষ্ঠ অন্ধ লোক॥ নাঃ নেই। এতক্ষণে রাত অনেক গভীর হ'য়েছে।

দ্বিতীয় অন্ধ লোক॥ এখন ক'টা বাজে?

অন্য সকলে॥ আমি জানিনা। আমরা কেউই জানিনা।

দ্বিতীয় অন্ধ লোক॥ এখনও কি দিনের আলো আছে? (ষষ্ঠ অন্ধ লোককে) ওহে, যে তুমি এখনও কিছু দেখতে পাও—কোথায় সেই তুমি? কাছে এসো। এসো!

ষষ্ঠ অন্ধ লোক॥ আমার মনে হয়, রাত এখন গভীর হ'য়েছে। দিনের বেলায় আমার চোখের পাতার নীচে সরু একটা বেগুনি আলোর রেখা দেখতে পাই। অনেকক্ষণ আগে সেই বেগুনি আলোর রেখাটিকে আমি দেখেছি। এখন আর দেখতে পাচ্ছি না কিছুই।

প্রথম অন্ধ লোক॥ আমার যখন খুব খিদে পায়, তখনই বুঝতে পারি আমি রাত গভীর হয়েছে। এখন আমি ভীষণ ক্ষুধার্ত।

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ একটিবার তুমি আকাশের দিকে মুখ তুলে চাও না: কিছু না কিছু তাহ'লে চোখে পড়বেই।

[জন্মান্ধ তিনজন বাদে আর সকলেই চায় ওপরের দিকে। জন্মান্ধরা চেয়ে রইলো মাটীর দিকে।]

ষষ্ঠ অন্ধ লোক ॥ মাথার ওপরে আমাদের আকাশ না আর কিছু তাহ-ই তো বুঝতে পারছি না।

প্রথম অন্ধ লোক ॥ আমরা কথা বললেই তার প্রতিধ্বনিও উঠছে, শূন্য গুহার মধ্যে বসে কথা বললে যেমন হয়।

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ আমার মনে হয় এখন সন্ধ্যা নেমেছে—তাই আমাদের কথার প্রতিধ্বনি উঠছে।

অন্ধ যুবতী ॥ মনে হ'চ্ছে যেন, চাঁদের আলো এসে পড়েছে আমার হাতের তালুতে।

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ মনে হ'চ্ছে যেন আকাশে তারা ফুটে রয়েছে। তারা ফোটার শব্দ শুনতে পাচ্ছি আমি।

অন্ধ যুবতী ॥ আমিও।

প্রথম অন্ধ লোক ॥ আমি তো কিছুই শুনতে পাচ্ছি না!

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ আমাদের নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাচ্ছি না আমি।

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ আমার মনে হয় মেয়েরাই ঠিক বলেছে।

প্রথম অন্ধ লোক ॥ আমি তো কখনও তারার শব্দ শুনিনি!

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ আমিও না। আমিও না।

[এক ঝাঁক নিশাচর পাখী গাছের ওপর এসে নামে।]

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ শোন! শোন! ও কিসের শব্দ আমাদের মাথার ওপর! শুনতে পেলে?

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ আকাশ আর আমাদের মাঝখান দিয়ে কি যেন সব উড়ে গেল।

ষষ্ঠ অন্ধ লোক ॥ আমাদের মাথার ওপর আমাদের নাগালের বাইরে দিয়ে কি যেন সব উড়ে গেল!

প্রথম অন্ধ লোক ॥ কি যে এসব ঘটছে কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি আতুরাশ্রমেই ফিরে যেতে চাই।

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ আমরা জানতে চাই, আমরা এসেছি কোথায় ?

ষষ্ঠ অন্ধ লোক ॥ আমি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু হাত বাড়িয়ে দেখলাম আমার চারপাশে শুধুই কাঁটা আর কাঁটা। হাত দুটো প্রসারিত করার সাহসও আর নেই আমার।

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ আমরা জানতে চাই, আমরা এসেছি কোথায় !

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ আমরা তা কোনমতেই জানতে পারবো না।

ষষ্ঠ অন্ধ লোক ॥ আমরা নিশ্চয়ই আমাদের আস্তানা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। এখানকার একটা শব্দকেও মনে হ'চ্ছে না চেনা বলে।

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ অনেক অনেকক্ষণ ধরে আমি শুধু পাতা ঝরার শব্দই শুনতে পাচ্ছি।

ষষ্ঠ অন্ধ লোক ॥ আমাদের মধ্যে কেউ কি আগে কখনও দেখেছো এই দ্বীপটাকে ? বলতে পারো কি আমরা কোথায় এসেছি ?

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ আমরা যখন আসি এই দ্বীপে তখন সকলেই ছিলাম দৃষ্টিহীন।

প্রথম অন্ধ লোক ॥ আমরা তো আজন্ম দৃষ্টিহীন।

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ মিথ্যে মিথ্যে এত ভাবনা করার কোনও মানে হয় না। উনি ফিরে আসবেন শিগগিরই। আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ অপেক্ষা করাই শ্রেয়। কিন্তু ভবিষ্যতে আর কোনওদিন আমরা বাইরে বেরুবো না ওঁর সঙ্গে।

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ আমরা তো একাকী যেতেও পারবো না কোগাও।

প্রথম অন্ধ লোক ॥ আমরা আর কখনোই বাইরে বেরুবো না। আস্তানা ছেড়ে বাইরে বেরুনো আমি পছন্দ করি না।

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ বাইরে বেরুবার না ছিল আমাদের ইচ্ছে, না কেউ বলেছিল আমাদের বাইরে বেরুতে।

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ এই দ্বীপে আজকের দিনটা ছিল ছুটির দিন। এমনই সব বড় বড় ছুটির দিনেই আমরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি বাইরে।

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ আমি তখন ঘুমিয়েছিলাম। উনি এসে আমার গায়ে ঠেলা দিয়ে বললেন…"জাগো, জাগো, সময় হ'য়েছে ঘুম ভেঙে জেগে ওঠবার। সূর্য উঠেছে যে।"…সূর্য কি কখনও ছিলো? আমি তা জানি না। জীবনে কখনও সূর্যের মুখ দেখিনি আমি।

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ আমি সূর্য দেখেছিলাম—একেবারে বাল্যকালে।

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ আমিও। সে অনেক, অনেককাল আগের কথা। আমি তখন একেবারেই শিশু ছিলাম। সে সব দিনের কথা এখন আর স্মরণেই আসে না ভালো ক'রে।

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ সূর্য উঠলেই উনি আমাদের বাইরে বেরিয়ে আসতে বলেন। কিন্তু কেন? কি এমন বিশেষত্ব আছে তাতে? আমি তো পথে বেরিয়ে বুঝতেই পারি না—তখন মধ্যদিন অথবা মধ্যরাত!

ষষ্ঠ অন্ধ লোক ॥ মধ্যাহ্নের আলোতেই পথে বেরুতে ভালো লাগে আমার। বিশ্ব চরাচরে তখন যে সর্বত্র এক আশ্চর্য্য ঔজ্জ্বল্য বিরাজ করে, আমি তা অনুভব করতে পারি মর্মে মর্মে। বন্ধ চোখ দুটো খোলবার চেষ্টায় প্রাণপণ করি আমি তখন।

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ আমার ভালো লাগে নিজেদের বসবার ঘরটিতে জ্বলন্ত চুল্লীর উষ্ণ আরামের মধ্যে শুধু বসে থাকতে। আজ সকালে আমাদের চুল্লীতে উত্তাপ ছিলো অনেক।

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ বাইরের রোদে আমাদের নিয়ে আসার অভিপ্রায়ই যদি ছিলো ওঁর, তাহলে আশ্রমের উঠোনে নিয়ে বসিয়ে রাখলেই পারতেন। তবুও তো আমরা চার দেওয়ালের মধ্যে চেনাজানা পরিবেশে থাকতাম। সেখানে নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারতাম আমরা। সেখানকার দরজা যতক্ষণ বন্ধ থাকে ততক্ষণ ভয়ের কোনই কারণ থাকে না। আমি সব সময় দরজা বন্ধ করে রাখতাম। একি! আমার বাঁ কনুইটা ছুঁলে কেন?

প্রথম অন্ধ লোক ॥ আমি তোমাকে ছুঁই নি। তোমার থেকে অনেক দূরে রয়েছি আমি।

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ আমি বলছি, কে যেন ছুঁয়েছে আমার বাঁ কনুইটা।

প্রথম অন্ধ লোক ॥ আমাদের মধ্যে কেউ নয়।

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ আমি চলে যেতে চাই এখান থেকে।

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ ঈশ্বর! ঈশ্বর! বলে দাও আমরা এসেছি কোথায়?

প্রথম অন্ধ লোক ॥ আমরা এখানে প্রতীক্ষায় বসে থাকতে পারবো না অনন্তকাল।

[বহুদূরে কোনও এক ঘড়িতে বারোটা বাজার শব্দ শোনা গেল]

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ অহো! আতুরাশ্রম থেকে কতদূরেই না এসে পড়েছি আমরা!

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ এখন মধ্যরাত।

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ মধ্যদিন। হ্যাঁগা, কেউ কি বলতে পারো, সঠিক করে?

ষষ্ঠ অন্ধ লোক ॥ ঠিক বলতে পারি না, তবে আমার মনে হ'চ্ছে—আমরা রয়েছি যেন বিশাল একটা ছাউনির নীচে।

প্রথম অন্ধ লোক ॥ আমি বুঝতে পারছি না কিছুই। অনেকটা সময় আমরা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছি।

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ আমি বড় ক্ষুধার্ত!

অন্য সকলে ॥ আমরা সকলে ক্ষুধার্ত আর তৃষ্ণায় কাতর।

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ আমরা কি এখানে বসে আছি অনেকক্ষণ!

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ মনে হচ্ছে যেন যুগ যুগান্ত ধরে আমি বসে আছি এখানে।

ষষ্ঠ অন্ধ লোক ॥ আমি যেন ক্রমশঃ বুঝতে পারছি, আমরা এসেছি কোথায়…

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ যেদিক থেকে মধ্যরাতের ঘণ্টার শব্দ ভেসে এলো…সেইদিক লক্ষ্য করেই চলতে সুরু করা উচিত আমাদের।

[নিশাচর কতকগুলো পাখী হঠাৎ ডানা ঝাপটালো।]

প্রথম অন্ধ লোক ॥ শুনলে! শুনলে! তোমরা শুনলে!

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ আমরা তবে সঙ্গীহীন ন'ই!

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ অনেকক্ষণ ধরেই সন্দেহ হচ্ছিল আমার—কেউ যেন আড়ি পেতে শুনছে আমাদের সব কথা।…উনি কি তবে ফিরে এলেন!

প্রথম অন্ধ লোক ॥ শব্দটা কিসের তা বলতে পারবো না, তবে মনে হ'ল যেন ওপর দিক থেকেই এলো।

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ তোমরা আর কেউ কি শুনতে পাওনি কিছুই ?…তোমরা সব সময় এমন চুপ ক'রে থাকো কেন!

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ আমরা এখনও কান পেতে আছি।

অন্ধ যুবতী ॥ পাখীদের ডানা ঝাপটানোর শব্দ শুনতে পেলাম আমি।

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ ঈশ্বর! ঈশ্বর! বলে দাও আমরা কোথায় এসেছি!

ষষ্ঠ অন্ধ লোক ॥ আমি যেন ক্রমশঃ বুঝতে পারছি—কোথায় এসেছি আমরা

…বড় নদীটার ঠিক অপর পারে আমাদের আতুরাশ্রম…নদীর ওপরের জীর্ণ সেতুটা পার হ'য়ে আমরা এসেছি। উনি আমাদের নিয়ে এসেছেন দ্বীপটার উত্তরে। নদী থেকে খুব বেশী দূরে আসিনি আমরা। কান পেতে শুনলে নদীর কলধ্বনিও শুনতে পাবো।…উনি যদি ফিরে না আসেন তাহ'লে আমরা যাব' ওই নদীর কিনারায়। নদীর বুক দিয়ে দিনরাত বড় বড় জাহাজ চলাচল করে...কোনও না কোনও সময় নদীর তীরে দাঁড়িয়ে থাকা আমাদের দেখতে পাবেই নাবিকরা। …আবার এ-ও হ'তে পারে, আলো ঘরটার চারপাশে আছে যে ঘন জঙ্গল, আমরা এসে পড়েছি তারই মধ্যে। কিন্তু এখান থেকে বাইরে বেরোনোর পথটা চিনি না আমি।…কেউ কি রাজী আছো আমার সাথে আসতে ?

প্রথম অন্ধ লোক ॥ তার চেয়ে যেমন আছো তেমনি বসে থাকো সবাই। অপেক্ষা করো। বড় নদীটা যে ঠিক কোনদিকে তা আমরা জানি না। মনে রেখো, আমাদের আতুরাশ্রমের চারদিকেই ছড়িয়ে আছে বিরাট বিরাট পাথর আর কাঠের গুঁড়ি।...তার চেয়ে এসো আমরা অপেক্ষা করি। অপেক্ষাই করি শুধু। উনি ফিরে আসবেন...ফিরে আসতে উনি বাধ্য।

ষষ্ঠ অন্ধ লোক ॥ কেউ কি বলতে পারো, আমরা এসেছি কোন পথ ধরে ? আমরা যখন হাঁটছিলাম, তখন তো উনি এই পথের বিবরণ দিতে দিতেই আসছিলেন।

প্রথম অন্ধ লোক ॥ ওঁর কথা শোনায় মন ছিলো না আমার।

ষষ্ঠ অন্ধ লোক ॥ আর কেউ কি শুনেছো ওঁর কথা ?

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ ভবিষ্যতে ওঁর সব কথা আমরা শুনবো মন দিয়ে।

ষষ্ঠ অন্ধ লোক ॥ আমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছো যার জন্ম হ'য়েছে এই দ্বীপে !

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ তুমি তো ভালো করেই জানো আমরা সবাই এসেছি ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে।

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ সমুদ্রের অপর পার থেকে এসেছি আমরা।

প্রথম অন্ধ লোক ॥ নদী পার হবার সময়ই আমার যে মৃত্যু হ'ল না কেন

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ আমারও সেই ভাবনা। আমরা দুজনে ছিলাম একই সঙ্গে।

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ আমরা তিনজন একই গ্রামের লোক।

প্রথম অন্ধ লোক ॥ কেউ কেউ বলে, আকাশ যখন পরিষ্কার থাকে তখন এখান থেকে দেখা যায় আমাদের সেই গ্রামটিকে। মাঝে তো কোথাও চড়াই উৎরাই নেই।

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ দৈবে আমরা এসে পড়েছি এইখানে।

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ আমার নিবাস ভিন্ন আর এক দেশে।

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ কোন দেশ থেকে এসেছো তুমি?

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ সে কথা ভাবতেও সাহস পাই না আর। মনে হয় যেন সব কিছুই হারিয়ে গেছে বিস্মরণের কোন অতলে।··· আজ থেকে সে অনেক, অনেকদিন আগের কথা...এখানকার চেয়ে আরো অনেক ঠাণ্ডা ছিল সেই দেশ···

অন্ধ যুবতী ॥ আমি এসেছি আরো অনেক দূরের দেশ থেকে...

প্রথম অন্ধ লোক ॥ কোথায় তোমার দেশ?

অন্ধ যুবতী ॥ সে কথা বলতে পারবো না আমি। সে দেশের বর্ণনা করা আমার সাধ্যের অতীত। এখান থেকে অনেক দূরে আছে সেই দেশ··· সাত সমুদ্দুরের পারে। দৈর্ঘে প্রস্থে বিরাট সেই দেশ···হাত নেড়ে নেড়ে আমি বোঝাতে পারি কিছুটা। কিন্তু কেউ তো আমরা দেখতে পাই না চোখে। আমি দীর্ঘদিন ঘুরে বেড়িয়েছি এদেশ সেদেশ ·· আমি দেখেছি সূর্যকে··· দেখেছি জলের রূপ... অগ্নির শিখা আর পাহাড়ের চূড়া। দেখেছি অগণিত মানুষের মুখ আর কত না নাম না-জানা ফুলের সৌন্দর্য্য! এই দ্বীপে সে সব কিছুই নেই। এখানে সব কিছুই যেন বিষণ্ণ, সন্তপ্ত আর কনকনে ঠাণ্ডা। চোখের দৃষ্টি হারাবার পর আর কোনদিন পাই নি সেই চেনা সুবাসের ঘ্রাণ।···আর আমি দেখেছি আমার মাকে, বাবাকে আর বোনেদের··· তখন আমি এতই ছোট যে যেখানে আমরা বাস করতাম তার সম্বন্ধে কোনও ধারণাই জন্ম নেয়নি মনে। আমি তখন শুধু খেলা ক'রে বেড়াতাম সমুদ্রের কূলে।···তবুও, কত স্পষ্ট মনে পড়ে... সেদিন আমার চোখে দৃষ্টি ছিল!...একদিন এক পাহাড়ের উঁচুতে দাঁড়িয়ে আমি চেয়েছিলাম বরফ ঢাকা প্রান্তরের বুকে। আর ··সেই সময়

থেকেই জীবনকে যা কিছু করে সুখহীন—সেই চরম অশুভের অস্তিত্বকে অনুভব করতে সুরু করলাম চেতনার গভীরে…

প্রথম অন্ধ লোক ॥ এ কথার অর্থ কি ?

অন্ধ যুবতী ॥ সেই সুখনাশক অশুভের অস্তিত্বকে আজও অনুভব করতে পারি আমি নানান সংকেতের মাঝে… সেই অশুভের চিন্তা যখন ঢেকে থাকে না আমার মনকে… আমার চেতনায় আমি সহজেই ফুটিয়ে তুলতে পারি অনেক স্মৃতির কুসুম…

প্রথম অন্ধ লোক ॥ স্মৃতিশক্তি নেই আমার একটুও ! আমি…

[গাছপালার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক সামুদ্রিক পাখি ডানা ঝাপটে উড়ে গেল ।]

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ আকাশের তল দিয়ে আবার কি যেন সব উড়ে চলেছে !

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ এখানে এলে কেন তুমি ?

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ কার সাথে কথা বলছো তুমি ?

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ আমাদের তরুণী বোনটির সাথে ।

অন্ধ যুবতী ॥ ওরা বলেছিলো, উনি আমাকে সারিয়ে তুলতে পারবেন । উনি বলেছিলেন, একদিন না একদিন আমি আবার ফিরে পাবো দৃষ্টিশক্তি । …তখন আমি চলে যেতে পারবো এই দ্বীপ ছেড়ে ।

প্রথম অন্ধ লোক ॥ এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যেতে পারলে আমরা সবাই সুখী হবো ।

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ চিরটাকাল আমাদের পড়ে থাকতে হবে এই দ্বীপে !

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ উনি তো ভীষণ বৃদ্ধ হ'য়ে পড়েছেন । আর কি সময় পাবেন উনি আমাদের সারিয়ে তোলবার !

অন্ধ যুবতী ॥ আমার চোখের পাতা বন্ধ, তবুও আমি বুঝতে পারি আমার চোখের তারায় প্রাণ আছে ।

প্রথম অন্ধ লোক ॥ আমার চোখের ঢাকনা খোলা…

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ আমি ঘুমোই চোখের পাতা খুলেই…

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ আমাদের চোখ নিয়ে আর না-ই বা কথা বললে !

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ তুমি কি এখানে অনেকদিন হ'ল এসেছো ?

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ এক সন্ধ্যায়, প্রার্থনার সময়, মেয়েদের দলে একটি অচেনা মেয়েলি স্বর শুনতে পেলাম আমি…সে স্বর তোমার…তোমার স্বর শুনেই

আমি বুঝতে পেরেছি, তোমার বয়েস অনেক কম…তোমার স্বর শুনে তোমাকে চোখে দেখতে ইচ্ছে হয় খুব…

প্রথম অন্ধ লোক ॥ আমি তো কখনও এটা খেয়াল করিনি।

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ উনি আমাদের কোনোদিন বুঝতে দেন নি কিছুই।

ষষ্ঠ অন্ধ লোক ॥ সবাই বলে তুমি নাকি দেখতে খুব সুন্দর…সেই সব সুদূর দেশের মেয়েদের মতই ?

অন্ধ যুবতী ॥ কেমন ক'রে বলবো ? আমি তো নিজেকে কখনো চোখে দেখিনি।

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ আমরা কেউই কাউকে দেখিনি চোখে। পরস্পরকে প্রশ্ন করি আমরা...উত্তর দিই। পরস্পরকে ভালোবাসি, বাস করি একত্রে ...কিন্তু আমরা কেউই জানি না কার কেমন রূপ…দুহাত দিয়ে একে অন্যকে স্পর্শ করতে ভালো লাগে খুব…কিন্তু চোখের দেখায় চেনা জানার সুযোগ আরো ব্যাপক, আরো অনেক সুখের।

ষষ্ঠ অন্ধ লোক ॥ দিনের বেলায় যখন সূর্যের আলো এসে পড়ে তোমাদের শরীরে...তখন তোমাদের শরীরের ছায়াগুলিকে আমি আবছা আবছা দেখতে পাই।

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ যে বাড়ীতে আমাদের বাস সেটাকেও আমরা দেখিনি কখনো…জানালা দরজা দেওয়াল...এ সব কিছুকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে আনন্দ পাই…তবু যেখানে আমাদের বাস সেইস্থানটাকে আমরা কখনো দেখিনি চোখে…

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ লোকে বলে আমাদের বাড়ীটা নাকি আসলে একটা কেল্লা…ভারী পুরোনো…সংকীর্ণ…অন্ধকার আর বিষণ্ণ। কেল্লার একেবারে ওপর তলায় যেখানে গুরুদেবরা থাকেন, সেখানে ছাড়া আলোর চিহ্ন নেইকো কোথাও।

প্রথম অন্ধ লোক ॥ চোখেই যারা দেখে না আলোয় তাদের কি দরকার ?

ষষ্ঠ অন্ধ লোক ॥ আতুরাশ্রমের চৌহদ্দির মধ্যেই ভেড়া চরাতাম আমি…যখন সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসতো…কেল্লার শীর্ষে জ্বলা আলোটিকে অনুসরণ করে ভেড়াগুলো ফিরতো আস্তানায়, আর আমিও তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে আসতাম ঘরে। ভেড়াগুলো কোনোদিন আমাকে নিয়ে যায় নি বিপথে।

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ আমরা একসঙ্গে বাস করছি কত দিন কত না বছর···
তবু আমরা কেউ কেউকে চোখে দেখিনি! এ তো নিঃসঙ্গ জীবন কাটানোরই সামিল। পরস্পরকে ভালোবাসার সম্বন্ধে বাঁধবার জন্যেই চোখে দেখতে পাওয়ার প্রয়োজন...

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি···আমি যেন দেখতে পাচ্ছি চোখে!

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ যখন স্বপ্নের ঘোরে থাকি তখনই কেবল সব কিছু দেখতে পাই আমি।

প্রথম অন্ধ লোক ॥ নিয়মমত আমিও স্বপ্ন দেখি···মধ্যরাত্রে।

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ কর্মশক্তিই নেই যাদের তারা স্বপ্ন দেখবে কিসের?

[এক ঝলক কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস ব'য়ে যায়···শুকনো পাতার রাশি ঝর ঝর ক'রে ঝ'রে পড়ে।]

পঞ্চম অন্ধ লোক ॥ একি! আমাকে স্পর্শ করলে কে!

প্রথম অন্ধ লোক ॥ কি যেন সব ঝ'রে পড়ছে আমাদের চারপাশে?

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ ওপর থেকে ঝরে পড়ছে···কি যে এগুলো তা বুঝতে পারছি না।···

পঞ্চম অন্ধ লোক ॥ কে ছুঁয়ে দিলে আমার হাত?···বেশ ঘুমোচ্ছিলাম আমি ···ঘুমোতে দাও আমকে!

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ কেউ তোমার হাত ছোঁয় নি।

পঞ্চম অন্ধ লোক ॥ কে আমার হাত ধরেছিলে?···উত্তর দাও···জোরে কথা বলো···কানে যে কম শুনি আমি···

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ কেউই জানিনা আমরা সে কথা···

পঞ্চম অন্ধ লোক ॥ ও, ওরা তবে আমাদের সতর্ক ক'রে দিতে এসেছে?

প্রথম অন্ধ লোক ॥ উত্তর দেওয়া নিরর্থক···ও কানে শোনে না কিছুই।

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ এ কথা মানতেই হবে, যারা কানে শোনে না, তারা বড়ই অভাগা!

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ বসে থেকে থেকে আমি বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি।

ষষ্ঠ অন্ধ লোক ॥ এখানে থাকাটাই আমার কাছে হ'য়ে উঠেছে ক্লান্তিকর···

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ আমার মনে হচ্ছে, পরস্পরের কাছ থেকে আমরা যেন

বড় দূরে দূরে রয়েছি। আরো কাছে কাছে স'রে এসো সবাই। বেশ ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে।

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ উঠে দাঁড়াতেই সাহস পাই না আমি। যে যেখানে আছি, তেমনি থাকাই ভালো।

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ আমাদের আশেপাশে কি যে সব রয়েছে তার কিছুই ঠিক ঠিকানা নেই।

ষষ্ঠ অন্ধ লোক ॥ মনে হচ্ছে, আমার দুটো হাত থেকে যেন রক্ত ঝরে পড়েছে। আমি দুহাতে ভর দিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছিলাম কিনা।

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ তুমি ক্রমশঃ আমার কাছে স'রে আসছো, আমি বুঝতে পারছি।

[অন্ধ পাগলিনীটি ভীষণ ভাবে গোঙায়। চোখ রগড়াতে রগড়াতে এগিয়ে চলে গুরুদেবের মৃতদেহটির দিকে।]

প্রথম অন্ধ লোক ॥ আরো কিসের যেন শব্দ শুনতে পাচ্ছি···

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ অভাগী পাগলী বোনটি আমাদের চোখ রগড়াচ্ছে বোধ করি···

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ তা ছাড়া আর কিছুই সে করে না···প্রতি রাত্রে আমি এই একই শব্দ শুনি···

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ ও পাগল···কোন কথাই বলে না কখনো...

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ ওর ছেলেটা ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে কোনওদিন আর কথাই বলে নি ও···ওর মনে সদা সর্বদা কিসের যেন আতংক লেগেই আছে···

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ এখানে তোমাদের ভয় করছে না কারো ?

প্রথম অন্ধ লোক ॥ কার কথা বলছো তুমি ?

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ আমাদের আর সকলের কথা।

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভয়ে বুক কাঁপছে আমাদের।

অন্ধ যুবতী ॥ অনেকক্ষণ ধরেই আমরা ভয়ের মধ্যে আছি।

প্রথম অন্ধ লোক ॥ এ কথা জানতে চাইছো কেন তুমি ?

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ কেন জানতে চাই ?···বলতে পারবো না সে কথা··· কেমন যেন সব গোলমেলে ঠেকছে···একি ! কার যেন কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

প্রথম অন্ধ লোক ॥ ভয় পাবার মত কিছু নেই…মনে হয় পাগলী মেয়েটি কাঁদছে…

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ এ ছাড়া আরো কিছু আছে…আরো কিছু আছে ভাবনার বিষয়, আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি…আমি যে শুধু আমার ভয়ের কথাই বলছি তা নয়…

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ ওর সন্তানটিকে দুধ খাওয়াবার সময় হলেই কান্না সুরু করে ও…

প্রথম অন্ধ লোক ॥ আমাদের মধ্যে ও-ই কেবল কাঁদে অমন করে।

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ লোকে বলে ও নাকি এখনও সময় সময় দেখতে পায় চোখে…

প্রথম অন্ধ লোক ॥ কান্নার দৃশ্য কেউ কখনও শুনতে পায় না…দেখতে পায়…

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ লোকে কেমন করে কাঁদে এটা দেখতে হ'লেও চোখ চাই…

অন্ধ যুবতী ॥ আমাদের চারপাশে কি যেন সব ফুল ফুটেছে—আমি তার সুবাস পাচ্ছি…

প্রথম অন্ধ লোক ॥ আমি শুধু মাটীর বুকের সোঁদা গন্ধেরই ঘ্রাণ পাচ্ছি!

অন্ধ যুবতী ॥ আমাদের কাছে, খুব কাছেই রয়েছে ফুল…অনেক ফুল!

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ আমি শুধু মাটীর গন্ধই পাচ্ছি!

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ এইমাত্র আমি বাতাসে ফুলের গন্ধ পেলাম…

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ শুধুই মাটির গন্ধ পাচ্ছি আমি!

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ মনে হয়, মেয়েরা, তোমাদের কথাই ঠিক।

ষষ্ঠ অন্ধ লোক ॥ ফুলগুলো কোথায় বলো না গো—আমি দুটি ফুল তুলবো।

অন্ধ যুবতী ॥ তোমার ঠিক ডান দিকে…ওঠো, উঠে দাঁড়াও।

[ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় অন্ধ লোকটি। হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে চলে বন মল্লিকার ঝোপের দিকে। ফুল সমেত গাছগুলিকে দু'পায়ে মাড়িয়ে দলিত পিষ্ট করে এগিয়ে যায়।]

অন্ধ যুবতী ॥ থামো…থামো…। আমি শুনতে পাচ্ছি, ফুলের বদলে তুমি সবুজ ডালপাতাগুলিই ছিঁড়ে ছিঁড়ে তুলছো…

প্রথম অন্ধ লোক ॥ ফুলের ভাবনা রাখো…এখন ঘরে ফেরার কথাই ভাবো!

ষষ্ঠ অন্ধ লোক ॥ যে পথে এলাম সেই পথ দিয়ে ফিরে যেতে সাহস হচ্ছে না আমার !

অন্ধ যুবতী ॥ ফিরো না···ফিরো না···তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছো···সেইখানেই থাকো। (সে উঠে দাঁড়ায়) ওহো! পায়ের নীচের মাটি কি ঠাণ্ডা! পা দুটো যেন জমে যাচ্ছে! (প্রায় বিধ্বস্ত সেই বন মল্লিকা ফুলের ঝোপটির দিকে নির্দ্বিধায় এগিয়ে চলে সে, কিন্তু ফুলের কাছাকাছি এসে কতকগুলো কাঠের গুঁড়ি আর পাথরের বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়ায়) এইতো···ফুলগুলি রয়েছে এইখানেই। আমি যেতে পারছি নে ফুলগুলির কাছে···ফুলগুলি রয়েছে বুঝি তোমার দিকেই—

ষষ্ঠ অন্ধ লোক ॥ এই তো, আমি কতকগুলো ফুল তুলতে পেরেছি বোধহয়। ··· (হাতড়ে হাতড়ে অবশিষ্ট ফুলগুলির কয়েকটিকে সে তোলে...অন্ধ যুবতীকে দেয়। রাতের পাখীরা উড়ে যায়।)

অন্ধ যুবতী ॥ মনে হয়, আমি যেন একদিন এই ফুলই দেখেছি চোখে... এদের নাম আমি ভুলে গেছি···কিন্তু এগুলো মনে হচ্ছে যেন বড় বিশীর্ণ···এদের বোঁটাগুলি যেন কেমন ভাঙ্গা ভাঙ্গা। এগুলি কি ফুল তা মনে পড়ছে না আমার...মনে হচ্ছে যেন মৃতের শরীরে ছড়িয়ে দেওয়া হয় এই ফুলই...(খোঁপায় একগুচ্ছ মল্লিকা গোঁজে সে।)

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ তোমার চুলের খড়্‌খড়্‌ শব্দ শুনতে পাচ্ছি আমি।

অন্ধ যুবতী ॥ ফুলগুলি গুঁজছি আমি চুলে···

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ তোমার এই রূপ আমরা দেখতেই পাবো না।

অন্ধ যুবতী ॥ আমি তো নিজেও দেখতে পাবো না নিজেকে...উঃ কী শীত করছে !

[ঠিক এই সময়ে গাছপালার মধ্যে জোরে বাতাস ব'য়ে যায়···হঠাৎ সমুদ্র গর্জে ওঠে···প্রচণ্ড শব্দে সমুদ্রের জল আছড়ে পড়ে কূলের ওপর।]

প্রথম অন্ধ লোক ॥ বাজ পড়ছে! বাজ পড়ছে!

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ মনে হয় ঝড়...ঝড় উঠেছে।

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ মনে হয়......সমুদ্রের গর্জন।

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ সমুদ্র! ওকি সমুদ্রেরই শব্দ! তবে তো দু'পা দূরেই সমুদ্র এসে গেছে! সমুদ্র আমাদের ঘিরে ফেলেছে! আমার চার-

পাশে আমি এই গর্জন শুনতে পাচ্ছি যে! না—না—এ নিশ্চয়ই অন্য আর কিছু!.. অন্য কিছু আর!

অন্ধ যুবতী ॥ আমার পায়ের কাছে ঢেউ ভাঙ্গার শব্দ শুনতে পাচ্ছি আমি!

প্রথম অন্ধ লোক ॥ আমার মনে হয়, ঝরা পাতার স্তূপের ওপর দিয়ে ব'য়ে চলেছে হাওয়া।

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ আমার মনে হয় মেয়েরাই ঠিক কথা বলেছে।

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ ওই ঢেউ কি এখানেও ছুটে আসবে!

প্রথম অন্ধ লোক ॥ কোনদিক থেকে বইছে বাতাস?

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ সমুদ্রের দিক থেকে।

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়েই বাতাস ব'য়ে আসে চিরকাল ...সমুদ্র দিয়ে ঘেরা চতুর্দিক...সমুদ্র ছাড়া আর কোথা থেকেই বা বাতাস আসবে...

প্রথম অন্ধ লোক ॥ সমুদ্র নিয়ে ভাবনা করা বন্ধ করো!

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ সমুদ্রের কথা আমাদের ভাবতেই হবে...সমুদ্র যে এসে পড়েছে আমাদের খুব কাছেই।

প্রথম অন্ধ লোক ॥ ওটা সত্যিই সমুদ্র কিনা আমরা জানি না কেউই।

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ আমার এত কাছেই ঢেউ ভাঙ্গার শব্দ পাচ্ছি, মনে হচ্ছে যেন এখনই দুহাত দিয়ে তার ফেনা তুলে আনতে পারি আমি। না, এখানে আমরা কিছুতেই থাকতে পারবো না! ঢেউএর সমুদ্র চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে আমাদের!

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ কিন্তু তুমি যাবেই বা কোথায়?

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ যেদিকে খুশি! যেখানে খুশি! যেখানে গেলে শুনতে পাবো না ওই জলোচ্ছ্বাসের ধ্বনি! চলো...চলো...চলো আমরা যাই!

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ মনে হচ্ছে...আমি যেন আর কিছু একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি ...শোন, শোন!

[দূরে থেকে শুকনো পাতার ওপর কার দ্রুত পদশব্দ শোনা যায়।]

প্রথম অন্ধ লোক ॥ কি যেন...আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে!

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ উনি আসছেন! উনি আসছেন! উনি ফিরে আসছেন!

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ খুব ছোট ছোট পা ফেলে ফেলে উনি আসছেন…ঠিক যেন শিশুর মত পা ফেলে ফেলে উনি আসছেন…

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ আজ আর কেউ কোন কটু কথা বলো না ওঁকে—বুঝলে।

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ আমার মনে হয়, ওটা মানুষের পায়ের শব্দই নয়।

[জঙ্গলের মধ্যে একটা বিরাট কুকুর প্রবেশ করে। তাদের সামনে দিয়ে চলে যায়।…কিছুক্ষণ সব স্তব্ধ।]

প্রথম অন্ধ লোক ॥ কে ওখানে? কে গো তুমি?…দয়া করো, করুণা করো আমাদের…আমরা অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি এখানে!

[কুকুরটি থেমে যায়। অন্ধ লোকটির হাঁটুর ওপর তার বিরাট থাবাগুলি তুলে দেয়]

আঃ…আঃ—কি তুমি রাখলে আমার হাঁটুর ওপর? কি? কি এটা?…এটা যে একটা জন্তু! মনে হয় যেন কুকুর? অহো! অহো! সেই কুকুরটা এসেছে! আতুরাশ্রমের সেই কুকুরটা! কাছে আয়! কাছে আয়! ও এসেছে আমাদের উদ্ধার করে নিয়ে যেতে! কাছে আয়! আয়…আয়!

অন্য সকলে ॥ কাছে আয়! কাছে আয়!

প্রথম অন্ধ লোক ॥ ও এসেছে আমাদের উদ্ধার করতে। আমাদের পায়ের চিহ্ন ধরে ধরে ও এসেছে। ও আমার হাত চাটছে এমন আদরে যেন কত বছর পরে আবার দেখতে পেল আমাকে! আনন্দে ও ডাক ছাড়তে সুরু করেছে! আনন্দের উচ্ছ্বাসে মরে যাবে যেন ও!

অন্য সকলে ॥ কাছে আয়! কাছে আয়!

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ ও বোধহয় আর কাউকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে যেতে ছুটে চলে এসেছে এই দিকে।

প্রথম অন্ধ লোক ॥ না, না। ও একাই এসেছে…আর কারো পায়ের শব্দ পাচ্ছি না আমি। আমাদের আর কোনও পথ দেখানোর লোকের দরকার নেই; ওর চেয়ে ভালো পথ প্রদর্শক আর কেউ হ'তে পারবে না। আমরা যেখানে যেতে চাইব' ও আমাদের সেখানেই নিয়ে যাবে। আমরা যা বলবো ও তাই শুনবে…

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ ওর পিছু পিছু যেতে সাহস হয় না আমার।

অন্ধ যুবতী ॥ আমারও না।

প্রথম অন্ধ লোক ॥ কেন না? দেখার ক্ষমতা ওর আমাদের চেয়ে অনেক ভালো।

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ মেয়েদের কথা আমরা শুনবো না!

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ মনে হচ্ছে যেন আকাশে বাতাসে কি একটা পরিবর্তন এসেছে; আমি বেশ সহজ ভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারছি; বাতাস বেশ পরিষ্কার হ'য়ে গেছে এখন···

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ আমাদের চারপাশে বইছে সমুদ্রের হাওয়া।

ষষ্ঠ অন্ধ লোক ॥ মনে হ'চ্ছে যেন ক্রমশঃ আলো জাগছে। আমার মনে হয়··· সূর্য উঠছে···

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ আমার মনে হচ্ছে···ঠাণ্ডা এবার বাড়বে।

প্রথম অন্ধ লোক ॥ এবার আমরা পথ খুঁজে পাবোই। ও আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে। আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছে ও!···তোমরাও এসো...এসো আমার পেছন পেছন।···এবার আমরা ফিরে চলেছি বাড়ীর পথে!

[সে ওঠে, কুকুরটা তাকে টেনে নিয়ে চলে। গুরুদেবের মৃতদেহটির সামনে এসে থেমে যায় কুকুরটা।]

অন্য সকলে ॥ তুমি কোথায়! কোথায় তুমি! তুমি কোথায় চলেছো! সাবধান! সাবধান!

প্রথম অন্ধ লোক ॥ দাঁড়াও! দাঁড়াও! এখনি আসতে সুরু করো না আমার সঙ্গে। আমি ফিরে আসবো...ও দাঁড়িয়ে গেছে...চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।···একি! কি এটা! অহো! ভীষণ ঠাণ্ডা কি যেন একটা স্পর্শ করলাম আমি!

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ কি বলছো তুমি? তোমার কথা আমি যেন আর শুনতেই পাচ্ছি না স্পষ্ট করে?

প্রথম অন্ধ লোক ॥ কি যেন একটা স্পর্শ করলাম আমি···একটা মানুষের মুখ যেন স্পর্শ করলাম আমি!

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ কি বলছো তুমি! তোমার কথা আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না যে! কি হয়েছে তোমার? কোথায় তুমি?...তুমি কি এরই মধ্যে এতদূরে চলে গেছ' আমাদের কাছ থেকে?

প্রথম অন্ধ লোক ॥ ও হো! হো! হো! এখনও বুঝতে পারছি না এটা কি…হ্যাঁ…হ্যাঁ…পারছি…আমাদের মধ্যে রয়েছে আর একটা মানুষের দেহ…একটা মানুষের মৃতদেহ!

অন্য সকলে ॥ মৃতদেহ! মানুষের মৃতদেহ! পড়ে রয়েছে আমাদের মধ্যে! তুমি কোথায়? কোথায় তুমি?

প্রথম অন্ধ লোক ॥ শুনছো তোমরা…আমাদের মধ্যে রয়েছে একটি মরা মানুষের দেহ! ওহো! আমি স্পর্শ করেছি একটা মরা মানুষের মুখ! একটা মৃতদেহের কাছেই বসে আছো তোমরা! আমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ গত হয়েছে অকস্মাৎ! তোমরা কোথায়? উত্তর দাও! উত্তর দাও সকলে এক সাথে।

[বধির ও উন্মাদিনীটী ছাড়া আর সকলে একের পর এক সাড়া দেয়। সেই অন্ধ স্ত্রীলোক তিনটি প্রার্থনা বন্ধ করেছে।]

প্রথম অন্ধ লোক ॥ আমি তোমাদের স্বরগুলোও তো চিনতে পারছি না। তোমরা সকলে যেন একই স্বরে কথা বলছো! সব কটা স্বরই কাঁপছে যেন!

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ দুজন এখনও উত্তর দেয় নি…তারা কোথায়?

[সে তার ছড়ি দিয়ে পঞ্চম অন্ধ লোকটিকে স্পর্শ করে।]

পঞ্চম অন্ধ লোক ॥ ও হোঃ! আমি ঘুমোচ্ছি…আমাকে ঘুমোতে দাও… ঘুমোতে দাও!

ষষ্ঠ অন্ধ লোক ॥ নাঃ, ও নয়। তবে কি উন্মাদিনীর মৃতদেহ!

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ পাগলী বসে আছে আমার পাশেই…আমি তার শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ পাচ্ছি শুনতে!

প্রথম অন্ধ লোক ॥ মনে হয়…মনে হয় তবে গুরুদেব! উনি দাঁড়িয়ে আছেন! এসো! এসো! এসো!

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ উনি দাঁড়িয়ে আছেন?

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ তবে তো উনি বেঁচেই আছেন!

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ উনি কোথায়?

ষষ্ঠ অন্ধ লোক ॥ চলো…দেখে আসি!

[তারা সকলে ওঠে—উন্মাদিনী আর পঞ্চম অন্ধ লোকটি ছাড়া। পথ হাতড়াতে হাতড়াতে এগিয়ে চলে মৃতদেহটির দিকে।]

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ উনি কি এখানে? এই কি উনি?

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ—উনিই তো? আমি চিনতে পেরেছি!

প্রথম অন্ধ লোক ॥ হা ঈশ্বর! এবার তবে কি হবে আমাদের!

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ গুরুদেব! গুরুদেব! এ কি আপনি! কি হ'য়েছে গুরুদেব? কি হয়েছে আপনার? কথা বলুন...কথা বলুন··· আমরা দাঁড়িয়ে আপনার চারপাশে···উত্তর দিন প্রভু...কথা বলুন··· ও হো···হো...হো!

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ কেউ একটু জল নিয়ে এসো···এখনও ওঁর দেহে প্রাণ থাকতে পারে...

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ এসো চেষ্টা করে দেখি! হয়তো উনি আমাদের আতুরাশ্রম পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পারবেন...

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ বৃথা চেষ্টা...বৃথা চেষ্টা! হৃদ্‌পিণ্ড ধ্বনিহীন··· স্তব্ধ হ'য়ে গেছে...প্রাণহীন এই দেহ...হিমশীতল...

প্রথম অন্ধ লোক ॥ নিঃশব্দে কখন চলে গেছেন উনি।

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ যাওয়ার আগে আমাদের সতর্ক ক'রে দেওয়া উচিত ছিল ওঁর।

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ অহো! কত বৃদ্ধ হ'য়ে পড়েছিলেন উনি! জীবনে এই প্রথম আমি স্পর্শ করলাম ওঁর মুখমণ্ডল—

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ (মৃতদেহটি স্পর্শ করে) উনি আমাদের চেয়েও দীর্ঘদেহী।

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ ওঁর চোখ দুটো সম্পূর্ণ খোলা; হাত দুটো জোড়া ক'রে মারা গেছেন উনি...

প্রথম অন্ধ লোক ॥ উনি তাহ'লে চলেই গেলেন...সম্পূর্ণ অকারণে...

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ উনি দাঁড়িয়ে নেই...বসে আছেন একটা পাথরের ওপর...

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ হা ঈশ্বর! হা ঈশ্বর! আমি এসব কিছুই জানতাম না...কিছুই জানতে পারিনি। দীর্ঘদিন উনি অসুস্থ শরীরটাকে ব'য়ে নিয়ে বেড়িয়েছেন...না জানি আজ কত যন্ত্রণাই পেয়েছেন উনি! হায়! হায়! হায়!! উনি মুখে কখনো কোনও অভিযোগ— করেন নি...আমাদের হাতগুলো উনি শুধু চেপে ধরতেন...সে-ই

ছিলো ওঁর অনুযোগের ভাষা...অথচ সেই ভাষা আমরা কথনো বুঝিনি... বুঝতে চেষ্টা করিনি !...এসো, ওঁকে ঘিরে আমরা প্রার্থনা করি !...হাঁটু গেড়ে বসো...

[মেয়েরা বিলাপ করতে করতে হাঁটু গেড়ে বসে ।]

প্রথম অন্ধ লোক ॥ হাঁটু গেড়ে বসতে সাহস হয় না আমার...

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ কিসের ওপর যে বসছি তাও বুঝতে পারবো না...

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ উনি কি অসুস্থ ছিলেন ? কথনো তো সে কথা বলেন নি আমাদের...

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ পথ চলতে চলতে উনি কি যেন বলছিলেন মৃদু স্বরে... সম্ভবতঃ উনি কথা বলছিলেন আমাদের তরুণী বোনটির সাথে। হ্যাঁগা, উনি কি বলছিলেন তোমাকে ?

প্রথম অন্ধ লোক ॥ উত্তর দেবে না ও।

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ তুমি কি সত্যিই আমাদের কোন কথার উত্তর দেবে না ? কোথায় তুমি ?...কথা বলো !

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ তোমাদের জন্যেই উনি বেশী যন্ত্রণা স'য়েছেন ; তোমরাই ওঁকে মেরে ফেলেছো...তোমরা খবরদার যেয়ো না ওঁর কাছে। চলতে চলতে তোমরা খাবার জন্যে বসে পড়েছিলে পথের ধারে। সারাদিন তোমরা শুধুই করেছো অনুযোগ আর অভিযোগ...গভীর দুঃখে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে শুনেছিলাম ওঁকে...উনি যেন ক্রমশঃ মনের জোর হারিয়ে ফেলছিলেন...

প্রথম অন্ধ লোক ॥ উনি অসুস্থ ছিলেন ? তোমরা জানতে এ কথা ?

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ আমরা কিন্তু কিছুই জানতে পারি নি...আমরা তো কথনো ওঁকে চোথে দেথিনি...আমাদের এই হতভাগ্য চোথের সামনে দিয়ে কত কিছুই তো ঘটে গেছে...আমরা কী-ই বা তার জানতে পেরেছি ? উনি তো কথনো কোনও কিছু নিয়ে অভিযোগ করেন নি...বড় দেরী হ'য়ে গেছে...বড্ডো দেরী হ'য়ে গেছে। তিনটি মৃত্যুর সাক্ষী আছি আমি...কিন্তু এমন মৃত্যু আর একটিও দেথিনি। এবার আমাদের পালা...

প্রথম অন্ধ লোক ॥ আমার জন্যে উনি নিশ্চয়ই কোন কষ্ট পান নি...আমি কথনো কিছু বলিনি ওঁকে...

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ আমিও না। আমরা নিঃশব্দে ওঁকে অনুসরণ করে এসেছি চিরকাল...

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ পাগলীটার জন্যে জল আনতে গিয়েই মারা গেছেন উনি...

প্রথম অন্ধ লোক ॥ এখন আমরা কি করবো? কোথায় যাবো আমরা?

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ সেই কুকুরটা কোথায়?

প্রথম অন্ধ লোক ॥ এখানে, মৃতদেহটা ছেড়ে ও কোথাও নড়বে না।

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ জোর করে তুলে আনো ওকে! তাড়িয়ে নিয়ে চলো। তাড়িয়ে নিয়ে চলো!

প্রথম অন্ধ লোক ॥ মৃতদেহটা ছেড়ে কোথাও যাবে না ও!

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ তাই বলে মৃতদেহ আগলে এমনি করে বসে থাকতে পারবো না আমরা...এমনি করে অজানা অন্ধকারে বসে থেকে থেকে মরতে চাই না আমরা!

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ এসো, আমরা আরো ঘন হ'য়ে বসি। একে অপরের কাছ থেকে যেন স'রে যেয়ো না কেউ। এসো, হাতে হাতে ধরো। সবাই বসে পড়ো এই পাথরের ওপর...ক'ই, আর সবাই ক'ই? কাছে এসো। এসো। এসো।

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ কোথায় তুমি? তুমি কোথায়?

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ এইখানে। এই তো আমি এখানে। আমরা সকলে একত্র আছি তো? আমার আরো কাছে এসো তোমরা। তোমাদের হাতগুলো কোথায়?...উঃ! কী ভীষণ ঠাণ্ডা পড়ছে!

অন্ধ যুবতী ॥ ওঃ! তোমার হাতগুলো কি ঠাণ্ডা!

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ কি করছো তুমি?

অন্ধ যুবতী ॥ আমার চোখের ওপর হাত রেখেছিলাম আমি! হঠাৎ যেন মনে হ'ল আমি বুঝি এবার দেখতে পাবো সব...

প্রথম অন্ধ লোক ॥ কে কাঁদে? কাঁদে কে?

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ পাগলী মেয়েটি কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

প্রথম অন্ধ লোক ॥ তবু তো ও এখনো জানে না সেই নির্মম সত্য কথাটা!

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ আমরা বোধহয় এখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবো...

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ কেউ হয়তো আসতেও পারে...

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ কে-ই বা আসতে পারে বলো ?

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ তা বলতে পারবো না...

প্রথম অন্ধ লোক ॥ আমার মনে হয় আতুরাশ্রমের সেবিকারাই এসে উপস্থিত হবেন এখানে...

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ সন্ধ্যার পর তাঁরা তো আর বাইরে বার হ'ন না...

অন্ধ যুবতী ॥ ওঁরা কখনোই বাইরে বেরোন না।

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ ওই বিশাল আলোঘরের লোকেরা হয়তো আমাদের দেখতে পাবে...

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ ওরা কখনো আলোঘরের ওপর থেকে নামে না।

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ ওরা আমাদের দেখতে পেলেও পেতে পারে...

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ ওরা সব সময় চেয়ে থাকে সমুদ্রের পানে।

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ উঃ কি ঠাণ্ডা !

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ শুকনো পাতা ঝরার শব্দ পাচ্ছি। মনে হ'চ্ছে যেন ঠাণ্ডা আরও ঘন হ'য়ে আসছে।

অন্ধ যুবতী ॥ ওঃ, পায়ের নীচে মাটি কি কঠিন !

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ আমার বাঁপাশে কিসের যেন একটা শব্দ হ'চ্ছে...একটা অচেনা শব্দ...

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ ও হ'লো সমুদ্রের বিলাপ...পাহাড়ের গায়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে ঢেউগুলি...

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ আমি ভেবেছিলাম ও বুঝি মেয়েদের বিলাপের সুর...

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ ঢেউ এর নীচে জমা বরফ ভেঙ্গে পড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি আমি...

প্রথম অন্ধ লোক ॥ কে অমন ঠক ঠক করে কাঁপছে ? কাঁপাচ্ছে পাথরের ওপর বসে থাকা আমাদেরও ?

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ আমি আর হাতের মুঠি খুলতেও পারছি না।

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ আমি আরো একটা শব্দ পাচ্ছি শুনতে...একটা অচেনা কিসের শব্দ...

প্রথম অন্ধ লোক ॥ আমাদের মধ্যে কে কাঁপছে এমন ক'রে ? তার কাঁপুনিতে কাঁপছে পাথরখানাও ?

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ মনে হয় পাগলী মেয়েটিই কাঁপছে সবার চেয়ে বেশী।

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ ওর ছেলেটার কোনও সাড়াশব্দ পাচ্ছি না তো আমি।

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ সে বোধহয় এখনও দুধ খাচ্ছে।

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ আমাদের মধ্যে একমাত্র সে-ই দেখতে পাচ্ছে...দেখতে পাচ্ছে আমরা বসে রয়েছি কোথায়!

প্রথম অন্ধ লোক ॥ উত্তরে বাতাসের শন্‌শন্‌ শব্দ শুনতে পাচ্ছি আমি...

ষষ্ঠ অন্ধ লোক ॥ আমার মনে হচ্ছে আকাশের সব তারা গেছে নিভে...এবার ঝরবে তুষার।

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ তবে তো আমাদের মৃত্যুর সময় এলো ঘনিয়ে!

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ কেউ যদি ঘুমিয়ে থাকে, জাগিয়ে দাও তাকে।

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ আমার কিন্তু ঘুম পাচ্ছে ভীষণ।

[শুকনো পাতার রাশিতে কাঁপন জাগায় এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া।]

অন্ধ যুবতী ॥ ঝরা পাতায় মরমর শব্দ শুনতে পাচ্ছো? কেউ যেন আসছে, আমাদেরই দিকে!

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ বাতাসের শব্দ ওটা—শোন!

তৃতীয় অন্ধ লোক ॥ কেউ আর আসবে না এখন!

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ মহাশীতের আগমনী শুনতে পাচ্ছি—

অন্ধ যুবতী ॥ দূরে কার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি আমি!

প্রথম অন্ধ লোক ॥ আমি শুধু শুনতে পাচ্ছি ঝরা পাতার মরমরানি—

অন্ধ যুবতী ॥ আমাদের থেকে অনেক দূরে কে যেন বেড়াচ্ছে চলে ফিরে—আমি শুনতে পাচ্ছি তার চলার শব্দ!

দ্বিতীয় অন্ধ লোক ॥ আমি শুধু শুনতে পাচ্ছি···হিমেল হাওয়ার শন্‌শনানি—

অন্ধ যুবতী ॥ আমি বলছি—নিশ্চয়ই কেউ আসছে আমাদের দিকে!

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ ধীরে ধীরে করে পথ চলার ক্ষীণ একটা শব্দ পাচ্ছি আমিও।

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ আমার মনে হয় মেয়েরা যা বলছে তা-ই ঠিক।

[ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসতে থাকে তুষার কণা।]

প্রথম অন্ধ লোক ॥ ওহো! হো! হো! কনকনে ঠাণ্ডা এসব কি পড়ছে আমার হাতের ওপর?

ষষ্ঠ অন্ধ লোক ॥ তুষার পড়ছে! তুষার পড়ছে!

প্রথম অন্ধ লোক ॥ এসো, আমরা পরস্পরের কাছে কাছে আরো ঘন হয়ে বসি!

অন্ধ যুবতী ॥ শোন ! শোন ! ওই কার পায়ের শব্দ শোন !

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ ঈশ্বরের দোহাই ! এক মুহূর্তের জন্যে থাকো চুপটি করে !

অন্ধ যুবতী ॥ আরো কাছে···আরো, আরো কাছে আসছে ঐ পদধ্বনি...শোন ...শোন !

[ঠিক এই সময় ঘন অন্ধকারের মধ্যে পাগলী মেয়েটির বাচ্ছাটা হঠাৎ কাকিয়ে কেঁদে ওঠে]

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ বাচ্ছাটা কাঁদছে।

অন্ধ যুবতী ॥ ও দেখতে পায়। চোখে দৃস্টি আছে ওর! নিশ্চয়ই কিছু দেখতে পেয়েছে ও...তাই কাঁদছে অমন করে।

[সে বাচ্ছাটিকে তার দু'হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে যেদিক থেকে পদধ্বনি আসছে বলে মনে হচ্ছিল সেই দিকে এগিয়ে চলে। অন্য মেয়েরা তাকে ঘিরে ধরে সশঙ্কচিত্তে এগিয়ে চলে তার সঙ্গে সঙ্গে]

যাই...যাই...যাচ্ছি আমি তারই কাছে !

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ সাবধান ! সাবধান !

অন্ধ যুবতী ॥ ওঃ ! কি ভীষণ কাঁদছে বাচ্ছাটা ! কি হয়েছে ? কি হয়েছে ? কেঁদো না...কেঁদো না...কিচ্ছুটি নেই ভয়ের...ভয় পেয়ো না লক্ষ্মীটি। এই তো আমরা রয়েছি তোমার চারপাশে। ...লক্ষ্মীসোনা বলো তো, কি দেখেছো তুমি ? বলো—ভয় কি। আর কাঁদে না ছিঃ ! বলো, বলো তো সোনা কি দেখছো...দেখতে পাচ্ছো কি ! বলো, বলো সোনামনি !

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে কাছে···আরো কাছে। শোন ! শোন !

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ শুকনো পাতার ওপর কার যেন পোষাকের খড়খড় শব্দ শুনতে পাচ্ছি আমি।

ষষ্ঠ অন্ধ লোক ॥ সে কি স্ত্রীলোক !

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ ওগুলো কি পায়ের শব্দই বটে ?

প্রথম অন্ধ লোক ॥ তবে কি সমুদ্র আসছে গড়িয়ে গড়িয়ে ঝরা পাতার ওপর দিয়ে !

অন্ধ যুবতী ॥ না! না! ওগুলো পায়ের শব্দ···পায়ের শব্দ...পায়ের শব্দই বটে!

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ এখনই তা জানতে পারবো আমরা। কান পেতে শোনো শুকনো পাতার বুকে কিসের শব্দ জাগে।

অন্ধ যুবতী ॥ আমি শুনেছি...শুনেছি...শুনেছি তার পায়ের ধ্বনি...খুব কাছে।...খুব কাছেই! শোন! শোন! সোনামনি বলো তো... কি দেখছো তুমি?

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ ও চেয়ে আছে কোনদিকে?

অন্ধ যুবতী ॥ ও কান খাড়া করে আছে সেইদিকে যেদিক থেকে আসছে ভেসে পদধ্বনি! দেখ! দেখ! আমি যতই ওর মুখ ঘুরিয়ে দিচ্ছি অন্য দিকে ততই ও ফিরে ফিরে চাইছে সেই একইদিকে! ও দেখতে পাচ্ছে! দেখতে পাচ্ছে! দেখতে পাচ্ছে! ও নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছে বিচিত্র আর কিছু!

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ [সামনে এগিয়ে এসে] ওকে উঁচু করে তুলে ধরো... তুলে ধরো অনেক উঁচুতে···ও যেন দেখতে পায় সব কিছুই...স্পষ্ট করে।

অন্ধ যুবতী ॥ স'রে দাঁড়াও! স'রে দাঁড়াও! [দৃষ্টিহীনদের সকলের মাথার ওপর বাচ্ছাটিকে তুলে ধরে সে] ওগো, তোমরা বুঝতে পাচ্ছো, ঠিক আমাদের মাঝে এসেই স্তব্ধ হ'ল তার পায়ের ধ্বনি।

বৃদ্ধতম অন্ধ লোক ॥ এইখানে! এইখানে তার পায়ের শব্দ ঘুরছে···ঘুরছে ...ঘুরছে আমাদের দলের মাঝেই!

অন্ধ যুবতী ॥ কে? কে তুমি? বলো...তুমি কে? কে তুমি?

[স্তব্ধতা]

বৃদ্ধতম অন্ধ স্ত্রীলোক ॥ করুণা করো আমাদের। ওগো! করুণা করো! করুণা করো! [স্তব্ধতা। শিশুটি তারপর কান্না সুরু করে...কাঁদতেই থাকে তীক্ষ্ণস্বরে, অবিরাম।]

॥ পর্দা নেমে আসে ॥*

*এই নাটকের অভিনয়ের জন্যে নাট্যকারের সঙ্গে যোগযোগ করুন।
ঠিকানা: নাট্যকার পরিষদ।
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

পূর্ণাঙ্গ নাটক

আর্থার মিলার রচিত

'ডেথ অফ এ সেলসম্যান'

অনুপ্রাণিত

জনৈকের মৃত্যু
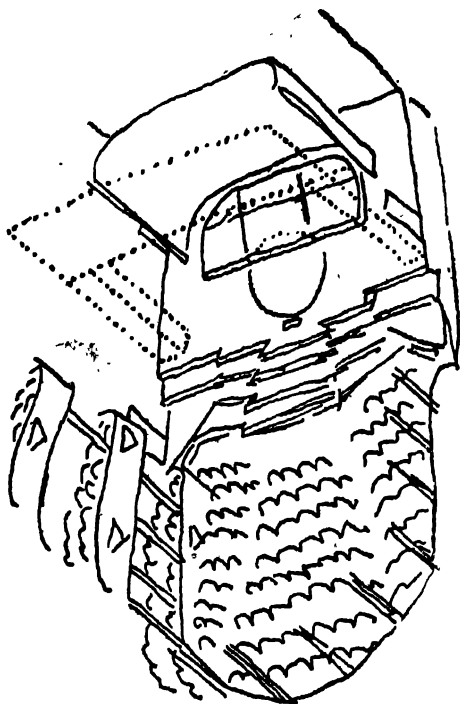
সাধন মৈত্র

প্রথম অভিনয়ঃ ২৪শে ফেবরুয়ারী, ১৯৬৫। মুক্ত অঙ্গন

প্রযোজনাঃ চতুর্মুখ। নির্দেশনাঃ অসীম চক্রবর্তী। সঙ্গীত বিভাগেঃ চিত্তরঞ্জন মুখার্জী ও মণি বিশ্বাস। আলোক বিভাগেঃ আশুতোষ বড়ুয়া মঞ্চস্থাপনাঃ অনঙ্গমোন রায়। রূপসজ্জাঃ সিধু বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত গ্রহণঃ ভারত ইলেকট্রনিকস টেপ রেকর্ডারে শ্রীসাধন নাহা কর্তৃক সি. এল. টি স্টুডিওতে গৃহীত ও পারুল বেতার কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত।

অভিনয়েঃ নটবর সামন্তঃ জিতেন ঘোষ। শশধর সামন্তঃ অসীম চক্রবর্তী। শেফালী সামন্তঃ চিত্রিতা মণ্ডল। বিবেকানন্দ সামন্ত (বড়)ঃ লোকনাথ চন্দ্র। নবকুমার সামন্ত (বড়)ঃ বারীন মুখোপাধ্যায়। বিবেকানন্দ সামন্ত (ছোট)ঃ দুলাল মিত্র। নবকুমার সামন্ত (ছোট)ঃ খোকন বোস পরে শিশির দাস। গোপাল সান্ন্যালঃ জগৎ মিত্র। সুশান্ত সান্ন্যাল (বড়)ঃ দিলীপ দাস পরে বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুশান্ত সান্ন্যাল (ছোট)ঃ প্রাণতোষ নাহা। মাধব বোসঃ কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়। মেয়েটিঃ কল্পনা বাগ পরে রেবা কুণ্ডু। শতমিতা পুরোকায়স্থঃ তৃপ্তি দাস পরে গার্গী গুহ। ভোলা দত্তঃ সত্য দাশগুপ্ত পরে প্রমূর্ত কল্যাণ মজুমদার। ফটিকঃ প্রলয় বসু পরে কালীপদ ঘোষ।

[অন্ধকার মঞ্চে একটু একটু করে আলো হয়। ভেতরের ঘর থেকে শেফালী বের হয়ে আসে। শাড়ীর আঁচল দিয়ে মুখ মোছে। ঘরে একটু দাঁড়ায়। তারপর ফ্রেমের মধ্যে দিয়ে দোতলায় ছেলেদের ঘরে ঢোকে। ওরা বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। গায়ের চাদরটা একটু সরে গিয়েছিল—ঠিক করে দেয়। বিবেক একটু নড়ে চড়ে শোয়। শেফালী আবার নীচে এসে ঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে। বিছানায় শুতে যায়। দরজায় কড়ানাড়ার আওয়াজ পাওয়া যায়।]

শেফালী ॥ কে ?

শশধর ॥ (নেপথ্যে খুব ক্লান্ত স্বরে) আমি।

[শেফালী স্পষ্ট বিস্মিত হলেও তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে দেয়। শশধর সামন্তকে ঢুকতে দেখা যায়। তার হাতে সেলস্‌ম্যানদের একটা পেটমোটা ব্যাগ। বোঝা যায় অনেক জিনিসে ভারী। ভারের জন্যে একদিকের কাঁধ বেঁকে গেছে। শশধরের যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। মাথার চুল পাকা, দাড়ি গোঁফ কামান মুখ। সমস্ত শরীর বার্ধক্যের ভারে জীর্ণ। পোষাক পরিচ্ছদ অতি সাধারণ। পরনে ফুলপ্যাণ্ট ও শার্ট।

শশধর ঘরে ঢোকে ক্লান্ত ভঙ্গীতে। টেবিলের ওপর ব্যাগ রাখে। বাঁ হাত দিয়ে ডানহাতটা একটু টিপে নেয়। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দম নেয়। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে পকেটের জিনিসপত্র বের করে রাখে। তারপর সামনের চেয়ারে বসে। বাঁশীতে সুর থাকে—হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল···

শেফালী দাঁড়িয়ে সমস্ত লক্ষ্য করছিল, এবার পেছনে এসে দাঁড়ায়।]

শেফালী ॥ হাঁগো ?

শশধর ॥ হুঁ !

শেফালী ॥ কি হ'ল গো ? কিছু হয়েছে ?

শশধর ॥ কি আবার হবে ? ফিরে এলাম।

শেফালী ॥ হঠাৎ ? কোন গোলমাল হয়নি তো ?

শশধর ॥ বল্‌লাম তো কিছু হয়নি। আজকাল কি কানে কম শুনছ ?

শেফালী ॥ (কপালে হাত দিয়ে) শরীর খারাপ হয়নি তো ?

শশধর ॥ না। (বাঁশীর সুর মিলিয়ে যেতে থাকে) আমি আজ কোন কাজ করতে পারলাম না। কোথাও যেতে পারিনি।

শেফালী ॥ তাহ'লে কোথায় ছিলে তুমি সারাদিন? তোমায় এত ক্লান্ত দেখাচ্ছে?

শশধর ॥ ডায়মণ্ডহারবার অবধি গিয়েছিলাম। তারপর আর যেতে পারিনি। (থেমে) ক্ষিদে পাওয়াতে দুপুরে কিছু মুড়ি আর তেলেভাজা খেয়েছিলাম।

শেফালী ॥ কেন যে তুমি ওই সব ছাইভস্ম খাও? এই বয়সে ওসব কখন সহ্য হয়!

শশধর ॥ (থেমে) না গো, আমার আগে থেকেই শরীর খারাপ লাগছিল। মনে হ'ল কিছু খেলে ভাল লাগবে। ডায়মণ্ডহারবারে গঙ্গার তীরে গিয়ে একটু বসেছিলাম—বিশ্রামের জন্যে। ওখানেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

শেফালী ॥ ওগো, তুমি এখন কিছুদিন বিশ্রাম নাও। একটানা এভাবে কেউ কাজ করতে পারে!

শশধর ॥ ঘুম যখন ভাঙল তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ও জায়গায় আমি কি করে ঘুমলাম?

শেফালী ॥ আজকাল ভাল করে খাও না—ঘুমোও না। এতে কি আর শরীর টেঁকে?

শশধর ॥ কাল খুব সকালে বেরুতে হবে। কাল নিশ্চয় ভাল থাকব। উফ্! মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে।

শেফালী ॥ (চুলে হাত ডুবিয়ে দিয়ে) মাথার আর দোষ কি? একটা মাত্র মাথা অথচ কত চিন্তা। সারিডন দেব?

শশধর ॥ (আপন মনে) আজ সকালে আমি ভালই ছিলাম। বাসে একটা জানালার ধারে বসে আমার বহুদিনের চেনা রাস্তা মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম। গাছগুলোয় নতুন পাতা বের হয়েছে। সমানেই শুধু সবুজ আর সবুজ। ওই সবুজ মাঠের মিঠে হাওয়ায় আমি কেমন ঘুমিয়ে পড়ছিলাম—আমি কি রকম অ্যাক্সিডেন্টের স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। আমি—(হাত দিয়ে চোখ ঢাকে) আমার মাথায় যে মাঝে মাঝে কি হয়, কি যে সব স্বপ্ন দেখতে থাকি—কি রকম যেন অদ্ভুত ভাবনা আসে।

শেফালী ॥ ওগো! তুমি একটু ভোলাকে বুঝিয়ে বল। কেন তুমি কলকাতায় কাজ করতে পারবে না? এই বয়েসে এত ট্যুর কখন সহ্য হয়?

শশধর ॥ আমি ভোলাকে বলেছিলাম। তারপর হঠাৎ আমায় একদিন ২৪ পরগণা আর হাওড়ায় কাজ করতে দিল। বল্ল—"বিহারও এই সঙ্গে আপনাকে দেখতে হবে।" এমন ভাব দেখাল যেন দয়া করল! দুলাল যদি আজ বেঁচে থাকত!

শেফালী ॥ কিন্তু ভোলাও তো জানে তুমি ওদের জন্যে কি করেছ? আজ ও তোমায় দেখবে না?

শশধর ॥ তবেই আর হয়েছে। সারাজীবন ওদের জন্যে করেছি বলেই তো আজ আমায় তাড়িয়ে কৃতজ্ঞতার ঋণ চুকোতে চায়। প্রায়ই শোনায় আমি আজকাল আর ব্যবসা দিতে পারি না। আমায় ভাল জায়গায় রাখা মানেই নাকি ওদের লোকসান। সেদিন তো বলেই দিল যে আজকাল আমি ওদের যে ব্যবসা দিই তাতে নাকি আমার মাইনে ছাড়া শুধু কমিশনে কাজ করা উচিত। করবেও ঠিক তাই এই সামনের মাস থেকে।

শেফালী ॥ ওঃ! (কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারে না)

শশধর ॥ ঘরে কিছু আছে? ক্ষিদে পাচ্ছে।

শেফালী ॥ সারাদিন তো খাওনি। দু'টি ভাতে ভাত করে দিই।

শশধর ॥ না! ঝামেলায় কাজ নেই। গোটাকয়েক বাতাসা দিও। ব্যাটারা ফিরেছে?

শেফালী ॥ হ্যাঁ। ঘুমচ্ছে। জান, আজ ছোটখোকা বড়খোকাকে খাইয়েছে। দুজনেই খুব হাসতে হাসতে বাড়ী ফিরল।

শশধর ॥ তাই নাকি?

শেফালী ॥ শুধু ওরা দু'ভায়ে যখন একসঙ্গে থাকে তখন বেশ লাগে। এক ব্লেডে দাড়ি কামায়। চান করে বের হয়ে এ ওর পিঠে পাউডার মাখিয়ে দেয়—সারা বাড়ী পাউডারের গন্ধে ভরে থাকে, বেশ লাগে।

শশধর ॥ (চটে) ছেলেদের পাউডার মাখা আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না। আর ওরা তো সাড়া বাড়ী পাউডার ছড়িয়ে মাখবেই। পিণ্ডি গেলার টাকা তো আর যোগাতে হয় না। সারা জীবন ভূতের বেগার খেটে, ধারদেনা

করে কোন রকমে এই বাড়ীটা দাঁড় করালাম, বাকী টাকা ক'টাও শোধ হবে, কিন্তু কেউ আর এখানে থাকবে না।

শেফালী॥ দেখ সবার জীবন তো আর সমান হয় না। বাপের কাজ তুমি করেছ, এখন আমাদের কপাল—

শশধর॥ না গো না। আমার মত কপাল কারুর হয় না। ক'টা বাপ ছেলেদের জন্যে আমার মত করে? (শেফালী কোন উত্তর দেয় না) সকালে আমি যাওয়ার পর বড় ব্যাটা কিছু বলেছিল?

শেফালী॥ ও বাড়ী ঢুকতে না ঢুকতে ওকে ওভাবে গালাগাল দেওয়াটা তোমার উচিত হয়নি। সারারাত বাদে বাড়ী ফিরল। ওকে দেখেই যদি তুমি ওভাবে মেজাজ গরম কর—

শশধর॥ আমি কখন মেজাজ গরম করলাম? আমি শুধু ওকে জিজ্ঞেস করলাম—সারাদিন যে চড়বড়া করে বেড়াও, তাতে হাতে কিছু আসে কিনা। এটা মেজাজ গরম হল?

শেফালী॥ কিন্তু এরই মধ্যে ও কি করে রোজগার করবে?

শশধর॥ (চিন্তিতভাবে ও রেগে) এই তো ওর রোগ। কোনদিন কোন কাজ মন দিয়ে করল না। সবসময়ে নিজের খেয়ালে মেতে থাকবে। একটা ভালমন্দের পর্যন্ত বিচার নেই। (আরও বেশি-উত্তেজিত হয়ে) সকালে ওর ব্যবহারের জন্যে ওকি পরে মাফ্ চেয়েছে?

শেফালী॥ বড় খোকা এমনিই আজকাল সব সময়ে মনমরা থাকে। তারপর যদি এভাবে বকাঝকা কর—দেখ, আমার মনে হয় এখানেই ও একটা কিছু করতে পারবে।

শশধর॥ কি হবে ওর সিনেমা করে? ওটা কি একটা পেশা না জীবন? প্রথম প্রথম যখন একটার পর একটা কাজ পাল্টাত আমি কিছু মনে করতাম না। ভাবতাম পাঁচটা লাইন দেখে পাকা হবে—মাথার ওপর আমি তো আছিই। এমন কি নানারকম ব্যবসা করার জন্যে ওকে টাকা জুগিয়েছি। কিন্তু তারপর—আজ সতেরো হতে চল্ল, একটা পয়সাও কোনদিন তোমার হাতে দিয়েছে?

শেফালী॥ এবার খোকা দাঁড়াবার খুব চেষ্টা করছে।

শশধর॥ ফুঃ। চেষ্টা করছে। পঁয়ত্রিশ বছর বয়েসে যে ছেলে দাঁড়াতে পারে না সে একটা অপদার্থ।

শেফালী ॥ শ্ শ্!

শশধর ॥ মুস্কিল হল কি ব্যাটা ভীষণ কাজ-কুঁড়ে।

শেফালী ॥ ওগো চুপ কর না।

শশধর ॥ একটা কুঁড়ে, অপদার্থ।

শেফালী ॥ ওরা ঘুমচ্ছে। জেগে উঠে যদি রাত দুপুরে আবার বাপ বেটায় শুরু হয় তবে সারা পাড়ার লোক ছুটে আসবে।

শশধর ॥ আমি কি ছেলেদের ভয়ে নিজের বাড়ীতেও কথা বলতে পারব না? (উত্তেজিতভাবে) নবাব পুত্তুর বাড়ী ফিরল কেন? আমি জানতে চাই ও বাড়ী ফিরল কেন?

শেফালী ॥ বড় খোকা আজকাল ভীষণ মুশ্রে পড়েছে। ওর যে কি হল!

শশধর ॥ কি আবার হবে? ভাবছে চিরকাল বোধহয় এরকম বাপের হোটেলেই কেটে যাবে। (থেমে) নইলে আজকাল চারদিকে এত কলকারখানা, ব্যবসাপত্তর গড়ে উঠছে, আর আমার ছেলে ওই রকম চেহারা, স্বাস্থ্য নিয়ে কিছু করে উঠতে পারছে না! (থেমে) সেলস্লাইনে মন দিয়ে কাজ করলে হাজার হাজার টাকা রোজগার করতে পারে! মনে করে দেখ স্কুল-কলেজে ও ছেলেদের কিরকম তাঁবে রাখত। ওর মুখের হাসি দেখার জন্যে ছেলেরা প্রাণ দিতে পারত। একবার পরীক্ষায় ফেল করেই— (থেমে যায়)

শেফালী ॥ সত্যি। সেই যে ফেল করে পাটনাতে তোমার সঙ্গে দেখা করতে গেল—তারপর থেকেই যেন কি রকম বদলে গেল। হাঁগো, কি হয়েছিল পাটনাতে?

শশধর ॥ ও তোমায় কি বলেছে?

শেফালী ॥ তোমার কথা জিজ্ঞেস করায় তো বল্ল—দেখা হয়নি। কিন্তু— হ্যাঁগো, তুমি জান কি হয়েছিল?

শশধর ॥ নিজেই তো বল্লে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

শেফালী ॥ তা হ'লে তোমাদের এত ঝগড়া হয় কেন? আজকাল বাড়ীতে তোমরা দুজনে থাকলেই—

শশধর ॥ তাই বলে কি আমি বাড়ী ছেড়ে চলে যাব? তুমিও বোধহয় আজকাল তাই চাও।

শেফালী ॥ ছিঃ ছিঃ! ও কথা বল না। আসলে একটা ভালমত কিছু হলেই ওর মন ভাল হবে।

শশধর ॥ আমি তো চেষ্টার ক্রটি করি নি। ওকে আবার পড়ার জন্যে কত বল্লাম। আমায় তো আমলই দিল না। সাত—সাতটা জায়গায় সেলস্‌ম্যানের কাজে ঢুকোলাম—দিনকয়েক করেই বেরিয়ে এল। কেন?

শেফালী ॥ ছাখ, সেলস্‌ম্যানের কাজ ও করতে চায় না।

শশধর ॥ কেন? খাটুনির ভয়ে? অপদার্থ কোথাকার!

শেফালী ॥ না। সে জন্যে নয়।

শশধর ॥ তবে? (শেফালী নিরুত্তর) কি হল? কথা বলছ না যে।

শেফালী ॥ খোকা—তোমার শুনতে ভাল লাগবে না।

শশধর ॥ (রেগে গিয়ে) কি বাজে বকছ? আমি জানতে চাই কেন ও সেলস্‌ম্যানের কাজ করতে চায় না?

শেফালী ॥ (ভয়ে ভয়ে) বড় খোকা বলে, সেলস্‌ম্যানের কাজ নাকি বাজে। ওতে—ওতে নাকি লোকে গোল্লায় যায়।

শশধর ॥ তার মানে আমি গোল্লায় গেছি! কোথায় সেই বেয়াদব? ডাক তাকে। জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব। আমার খাচ্ছে, আর আমাকেই—

শেফালী ॥ (হাত দিয়ে মুখ চাপা দিয়ে) কি করছ কি? এই জন্যেই তোমার সঙ্গে ওর গোলমাল লাগে। তুমি ইয়ে হয়ে গেছ, একথা খোকা বলেনি। ও বলে তোমাদের এই লাইনে নাকি নানা রকম লোভ ছড়ান আছে, যদি এড়াতে না পারে তবে—

শশধর ॥ (হাঁফ ছেড়ে) বেকুব কোথাকার। এই সব বাজে চিন্তা ওর মাথায়। আচ্ছা, ঠিক আছে। কাল সকালে আমি এ বিষয়ে ওর সঙ্গে কথা বলব। আমার অমন ভালছেলে; এমনি কিন্তু ব্যাটা মোটেই কুঁড়ে নয়।

শেফালী ॥ না। খুব চটপটে। ওগো। নলেনগুড়ের খানিকটা পায়েস করেছি, খাবে?

শশধর ॥ না।

শেফালী ॥ একটু খাও। মুখটা বদলাবে—

শশধর ॥ (রেগে) আমার মুখ বদলে কাজ নেই। তুমি জান পায়েসে আমি নলেনগুড় পছন্দ করি না। আমি যা চাইব এ বাড়ীতে ঠিক তার উল্টোটা হবে।

শেফালী ॥ মানে—বড়খোকা নলেনগুড়ের পায়েস খুবই ভালবাসে।

শশধর ॥ হুঁ। জানলাটা খুলে দিচ্ছ না কেন?

শেফালী ॥ সব ক'টাই তো খোলা আছে।

শশধর ॥ ওঃ। খোলা আছে। আজকাল আর এ ঘরটাতে হাওয়া আসে না। চারপাশে শুধু বাড়ী আর বাড়ী আর বাড়ী আর বাড়ী।

শেফালী ॥ মোড়ের জমিটা নিতে পারলে বেশ হত।

শশধর ॥ একই ব্যাপার। ওখানে থাকলে ধুলোয় ঘর ভরে যেত। বড় রাস্তা দিয়ে এখন দিনরাত কেবল গাড়ী চলে। অথচ আগে কি সুন্দর ছিল জায়গাটা।

শেফালী ॥ হ্যাঁ। শহরে থেকেও মনে হত শহর থেকে হাজার মাইল দূরে রয়েছি।

শশধর ॥ কনট্রাকটরগুলোকে ধরে চাবকান উচিত। ব্যাটারা বাড়ী তৈরীর সুযোগে কাঠের লোভে অকারণে কদমগাছটাকে কেটে দিল। ব্যাটাদের নিয়ে আমি কি সুন্দর ঐ গাছে দোলনা টাঙিয়ে দুলতাম। (ভগ্নস্বরে) আজকাল আমার কেবলই পুরোনদিনের কথা মনে হয়। মনে হয় চারদিকে সবুজ মাঠ আর তাজা হাওয়া। আর বর্ষার সন্ধ্যেয় সারা বাড়ী কদম ফুলের গন্ধ। তখন ঐ একটা গাছ সারা পাড়া মাত করে রাখত।

শেফালী ॥ কি করবে বল? লোকে তো কোথাও না কোথাও থাকবে!

শশধর ॥ হ্যাঁ। আসলে লোক অনেক বেড়ে গেছে। যে যেখানে পারছে মাথা গুঁজবার ব্যবস্থা করছে।

শেফালী ॥ আমার মনে হয় লোক বোধহয় খুব একটা বাড়েনি। আসলে বোধহয়—

শশধর ॥ বাড়েনি মানে? আলবাৎ বেড়েছে। আমি বলছি বেড়েছে। ঘরে বসে থাক তাই টের পাও না। যেমন লোক বেড়েছে তেমনি কমপিটিশন বেড়েছে। (থেমে) চিনি দিয়ে পায়েস করলেই পারতে একটু খেতাম।

শেফালী ॥ এটাই অল্প একটু খাও। একেবারে যে খাওনা তাতো নয়। বছরের প্রথমে হঠাৎ ঘরে বসে নলেনগুড় পেয়ে গেলাম। তাই—

শশধর ॥ না থাক। আমার ওই গন্ধটায় এলার্জি আছে। গোটাকয়েক বাতাসাই খাব।

[শশধরের এই কথার ওপর ছেলেরা ওঠে। ওরা শোনে]

শেফালী ॥ আচ্ছা। তাই খাও। দিই তোমাকে।

[শেফালী উঠে দিতে যায়। শশধর হাত ধরে]

শশধর ॥ আমি কোনদিন তোমার দিকে মন দিতে পারলাম না। তাই না?

বড় বিবেক ॥ কি ব্যাপার বল তো?

বড় নব ॥ চুপ করে শোন।

শেফালী ॥ তোমায় এত খাটতে হয়, কতদিকে মন দিতে হয়। সংসারের জন্যেও রাতদিন কত ভাব। তাছাড়া আমিই কি আর তোমার দিকে মন দিতে পারি!

শশধর ॥ তুমিই কিন্তু আমার জীবনের সব। তোমাকে দেখেই আমি সংসারে ভরসা পাই।

শেফালী ॥ (থেমে) আমি তোমায় আর কতখানি দিতে পারি!

শশধর ॥ বড়ব্যাটাকে আমি আর কোনদিন বকব না। ওর যদি ফিল্ম লাইন ভাল লাগে তবে এখানেই চেষ্টা করুক।

শেফালী ॥ ছাখ, এখানেই ওর কিছু একটা হবে।

শশধর ॥ নিশ্চয়ই হবে।

শেফালী ॥ ওগো। এই রবিবার চল না তারকেশ্বরে গিয়ে বাবার কাছে ওর নামে পূজা দিয়ে আসি। বেড়ান হবে কাজও হবে।

শশধর ॥ তোমরা যাও। আমার আর ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাস নেই।

শেফালী ॥ ছিঃ ছিঃ। ও কথা বল না। (দুই হাত মাথায় ঠেকিয়ে) জয় বাবা তারকনাথ।

শশধর ॥ গাড়ীটা থাকলে কত আরামে ঘুরে আসা যেত। (থেমে) আজকাল আমার প্রায়ই গাড়ীর কথা মনে হয়।

শেফালী ॥ ও কিছু নয়। অনেক সময় পুরোন জিনিসের কথা প্রায়ই মনে পড়ে।

শশধর ॥ না। ঠিক তা নয়। এ একটা অদ্ভুত ধরনের। মাঝে মাঝে সব কিরকম যেন গোলমাল হয়ে যায়—তোমায় ঠিক বোঝাতে পারব না। আজকাল প্রায়ই সকালে মনে হয় বড় ব্যাটা যেন আগের মত আমার

গাড়ীটা পরিষ্কার করে দিচ্ছে। কি সুন্দর চক্‌চক্‌ করত গাড়ীটা। যখন বেচতে গেলাম, গাড়ীটা আশি হাজার মাইল চলেছে দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। নাঃ। যাই, হাত মুখ ধুয়ে আসি। [প্রস্থান]

শেফালী ॥ সাবধানে বাথরুমে যেও, বড় পেছল হয়েছে।

নব ॥ কি ব্যাপার বলতো? বাপির তো আসছে কাল ফেরার কথা ছিল।

[আলো এবার এসে ছেলেদের ঘর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অদৃশ্য শশধরের মৃদু হাসি শোনা যায়। 'বিশ্বাস করুন। বিরাশি হাজার মাইল চলছে। কি? বিশ্বাস হচ্ছে না? বেশ তো মাইল মিটারটা দেখুন…'বিবেক বিছানা ছেড়ে ওঠে দাঁড়ায়। সামনের দিকে একটু এগিয়ে আসে। পাজামা আর গেঞ্জী পরনে। বেশ শক্ত সমর্থ চেহারা। নবও বেশ শক্ত সমর্থ দেখতে।]

বাপি যেন আজকাল কিরকম হয়ে গেছে। সেদিন রাত্রে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল—আমি বাড়ী ফিরছিলাম। আমায় দেখে জিজ্ঞেস করলে—কে? আমি সাড়া দিলাম। শুনে জিজ্ঞেস করলে—কোন কোম্পানী? আমার গলা পর্যন্ত বুঝতে পারল না।

বিবেক ॥ বোধহয় চোখ খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

নব ॥ আরে না। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি চোখ ঠিক আছে। আর তা' ছাড়া কানে তো শুনতে পায়। আসলে মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সেদিন কি করেছে জানিস—আমি ফ্যাকট্রীর গাড়ীটা নিয়ে বাড়ী এসেছিলাম। বাপিও বের হচ্ছিল। আমায় গাড়ী আনতে দেখে থেকে গেল। যাওয়ার সময় খানিকটা রাস্তা নিজেই চালাতে লাগল। কিন্তু কি হল জানিস। রাস্তায় সবুজ আলো দেখে থেমে যাচ্ছিল আর লাল আলোয় চালাচ্ছিল। দু' একবার দেখেই আমি গাড়ীটা নিজের হাতে নিয়ে নিলাম। (হাসে)

বিবেক ॥ (ফিরে এসে খাটের ওপর বসে) আমি শুয়ে পড়ি। আর পারছিনা।

নব ॥ বাপি আজকাল প্রায়ই বিড়বিড় করে তোর কথা বলে।

বিবেক ॥ (অবজ্ঞার হাসি নিয়ে) কি বলে বুড়ো?

নব ॥ পরিষ্কার কিছু বোঝা যায় না। মনে হয় যেন তোর সঙ্গে কথা বলছে।

বিবেক ॥ হুঃ। সিগারেট দে। [নব বালিশের তলা থেকে সিগারেটে বের করে একটা নিজে নিয়ে আরেকটা বিবেককে দেয়। তারপর ধরায়।] [নেপথ্যে শশধরের কথা শোনা যায়।]

শশধর ॥ (নেপথ্যে) কি মশাই বিশ্বাস হ'ল তো? শুধু মাইল মিটার দেখলে বোঝা যায়, গাড়ীটা সত্যিই বিরাশি হাজার মাইল চলছে। হাঃ হাঃ...

বিবেক ॥ (একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে) বেশ মেয়ে।

নব ॥ কে! আবার কাকে জোটালি?

বিবেক ॥ আরে কাল রাতে শ্যুটিং-এ আলাপ হয়েছে। রাতটা স্টুডিওতে ওর জন্যেই রয়ে গেলাম।

নব ॥ বাঃ বাঃ। একরাতেই এত। তাহ'লে চেহারার মধ্যে বেশ এ্যাপীল আছে বল।

বিবেক ॥ (দূরে দৃষ্টি ভাসিয়ে) মুখটা খুব মিষ্টি। ওই অনেকটা—সেই ইয়ের মত। কি যেন নামটা—লেক মার্কেটের কাছে—

নব ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ—সেই কুকুরওলা বাড়ীটাতে তো?

বিবেক ॥ ঠিক বলেছিস। ওটাকে প্রায় পটিয়ে এনেছিলাম—কিন্তু শালা কুকুরটার জন্যে—

নব ॥ যা বলেছিস দাদা। শালা বাড়ীর সামনে দাঁড়ালেই কুকুরের চিৎকারে মেয়েটার বাপ বেরিয়ে আসত।

বিবেক ॥ এ কিন্তু বেশ মেয়ে।

নব ॥ কি করে বুঝলি?

বিবেক ॥ (নিজের হাতটা দেখিয়ে) পাঁচশ মেয়ে এই হাতে পার করলাম। আর এই পাঁচশ একে এসে বুঝতে পারব না।

নব ॥ পাঁচশ এক! বড় মারাত্মক দাদা। টাটা কোম্পানীর হলে কিন্তু তোকে ধোলাই করে ছাড়বে।

বিবেক ॥ ফাজলামি করছিস?

নব ॥ তাই কি পারি? তুই হলি আমার দাদা। কন্যালগ্নে জন্ম তোর সার্থক দাদা! কি কপাল নিয়েই যে জন্মেছিলি।

বিবেক ॥ নারে এবার আমি সিরিয়াস। লাইনে একটু স্থিতু হতে পারলে ভাবছি বিয়েই করে ফেলব। এ ভাবে আর সত্যিই চলে না।

নব ॥ তুই আজকাল মাঝে মাঝে যেন কিরকম হয়ে যাস। আজ সারা সন্ধ্যেটা গোমড়া মুখে বসে রইলি। দু-দুটো মেয়ে তোকে আড়চোখে দেখছিল। কতবার তোকে দেখাতে চাইলাম, তা তুই মুখই ফেরালি না। কি হয়েছে তোর?

বিবেক ॥ জীবনের ওপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে। বাবার বিদ্রূপ অসহ্য।

নব ॥ তা কেন হবে ? আমার মনে হয়—

বিবেক ॥ না—না। আমি ভাল করে লক্ষ্য করেছি। আমি যখনই কাজের কথা বলতে যাই কি রকম বিচিত্রভাবে হেসে তাকায়। আমি ভাল করে কথাই বলতে পারি না।

নব ॥ বাপি আজকাল প্রায়ই পাটনা পাটনা করে তোর সঙ্গে আপন মনে কি যেন বলে। আমি ঠিক বুঝতে পারি না। আচ্ছা, তুই তো ফেল মেরে বাপির সঙ্গে দেখা করতে পাটনায় গিয়েছিলি। কি হয়েছিল ?

বিবেক ॥ (খানিকক্ষণ চুপ করে) কই কিছু তো হয়নি। (থেমে) দু' একটা জিনিসের জন্যেই বাবার এই অবস্থা।

নব ॥ তার মানে ? কি বলছিস তুই ?

বিবেক ॥ কিছু না। বাবার এই অবস্থার জন্যে সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপিও না। ব্যস।

নব ॥ কিন্তু তুই যদি একটা ভাল জায়গায় কাজ করতিস—আমার মনে হয়—। আচ্ছা ফিল্মে যে তোর একটা কিছু হবেই এ বিষয়ে কি তুই নিশ্চিত ?

বিবেক ॥ না। এখানে ভবিষ্যতে কি হবে বলতে পারি না। কোন আশাও দেখতে পাই না। তাছাড়া—আমি ঠিক বুঝতে পারি না, আমি কি হতে চাই।

[শেফালী প্রবেশ করে টেবিলের ওপর জল বাতাসা রেখে আবার ভেতরে চলে যায়]

নব ॥ কি বলছিস তুই ?

বিবেক ॥ ঠিকই বলছি। ভেবে দেখ আজ কত বছর ধরে কত জায়গায় কাজ করলাম। সব কাজ দেখেছি বাজে, নোংরা। কোথাও কোন স্বাধীনতা নেই, নিজের ইচ্ছে জানাবার অধিকার নেই। প্রত্যেক জায়গায় সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি যন্ত্রের মত কাজ। কোথাও টিঁকতে পারলাম না।

নব ॥ সেলস্‌লাইনে কিন্তু তুই ভালভাবে কোনদিন চেষ্টা করলি না। অথচ এখানে তোর হত।

বিবেক ॥ না। তার দরকার নেই। দালালি আমার পোষাবে না। যতসব জোচ্চর, নোংরা লোক এই লাইনে ঘুরে বেড়ায়।

নব ॥ কি যা তা বলছিস? বাপি তো এ লাইনে রয়েছে। বাপি কি তাই! তাছাড়া কত ভাল লোক তো আমরাই দেখেছি, সেলর্স্ লাইনে।

বিবেক ॥ থাম্ থাম্ আমার সব জানা আছে। অনেক ঘাটের জল খেয়ে এই ঘাটে ভিড়েছি। টাকা পয়সা পাচ্ছি না—এটা ঠিক, তবে লাইনটা আমার মেজাজের সঙ্গে মেলে। এখানে একটা সৃষ্টির আনন্দ আছে। দূর থেকে দেখতেও ভাল লাগে। কতলোক একসঙ্গে কাজ করে—প্রত্যেকের চিন্তা কি করে একটা কাহিনী জীবন্ত হয়ে উঠবে।

নব ॥ আমি জানি দাদা তুই একটা ইয়ে—মানে—একটা আদর্শবাদী।

বিবেক ॥ নারে, আমি খুব বাজেভাবে বড় হয়েছি। কেউ আমায় রাস্তা চেনায়নি। ভালমন্দের বিচার শেখায়নি। আর তাই আজ পর্যন্ত আমি নাবালক রয়ে গেলাম। তুই কিন্তু বেশ গুছিয়েছিস। পছন্দমত কাজ করছিস। হাতে টাকা পয়সা আসছে। তোর মনে বেশ শান্তি আছে।

নব ॥ আরে দূর! কোথায় শান্তি। শান্তি শালা শান্তিপুরে আছে।

বিবেক ॥ কিন্তু তোকে দেখলে তো তা মোটেই মনে হয় না। মনে হয় বেশ মেজাজে আছিস।

নব ॥ আরে ছিলাম তো ভালই। কিন্তু ফোরম্যান শালা ইদানীং এমন হারামীপনা শুরু করেছে যে এ কাজ আমায় ছাড়তেই হবে।

বিবেক ॥ সে কিরে? তুই তো কিছুদিন আগেও ওর নাম করলেই ভক্তিতে গদগদ হয়ে উঠতিস। আজ হঠাৎ উল্টো গান শুরু করলি!

নব ॥ আরে, আগে কি শালার মতলব বুঝতাম। আগে ব্যাটা আমায় সবচেয়ে বেশি ওভারটাইম দিত, কর্তাদের কাছে সব সময় আমার প্রসংসা করত। সবাই ধরে নিয়েছিল ওর পর আমিই ফোরম্যান হব। হঠাৎ কিছুদিন আগে একদিন কারখানা থেকে সোজা বাড়ী নিয়ে গেল। খুব খাওয়াল। পকৌড়ী, জিলাবী, চা—তারপর ব্যাটার মতলব বুঝতে পারলাম।

বিবেক ॥ কি?

নব ॥ আরে ওর ট্যারা মেয়ে আছে—হতকুচ্ছিত দেখতে। ব্যাটা তাকে আমার সঙ্গে ভেড়াতে চায়।

বিবেক ॥ তাই বল। জামাই করার তাল। তা ভিড়ে যা। মন্দ কি।

নব ॥ কি যে বলিস? শেষে ওই চেহারার ভয়ে আমার আর বাড়ী ফেরা হবে না। সারাজীবন কারখানার ভেতর থাকতে হবে। (থেমে) সেদিন ব্যাটা জিগ্যেস করায় সোজাসুজি না বলে দিলাম। ব্যস। তারপর থেকেই আমার সব কাজ খারাপ হয়ে গেল। এখানে আর থাকা যাবে না। ভাবছি এই কাজ ছেড়ে দেব।

বিবেক ॥ এই শোন। তুইও আমার লাইনে চলে আয়।

নব ॥ আমি তোর লাইনে? মানে ফিল্মে। ফিল্মে আমি কি করব!

বিবেক ॥ আরে তোর তো একটা টেক্‌নিক্যাল ব্রেন আছে, ক্যামরার কাজ শিখে নে। তারপর নিজের ছবি তুলব।

নব ॥ নিজেরা ছবি তুলব? সে-যে অনেক টাকার ব্যাপার।

বিবেক ॥ আরে কিছু না। এই ক'বছরে কিছু তো জমিয়েছিস। তার থেকে কিছু দিবি। এক ডিস্ট্রিবিউটারের সঙ্গে ভাল খাতির আছে তার কাছ থেকে বাকীটা আদায় করব। ব্যস। তুই ক্যামেরাম্যান, আমি হিরো আর চুমকিকে হিরোয়িন করব। স্বাধীন ব্যবসা। আমার হবে, তোর হবে, চুম্‌কিরও হবে।

নব ॥ চুম্‌কি কে?

বিবেক ॥ কাল রাতে স্টুডিওতে যার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ও নামটা আমার পারসোনাল ইউসের জন্য।

নব ॥ কিন্তু দাদা—ফিল্ম করব কিরে?

বিবেক ॥ কেন? ব্যবসা। ফিল্ম ইন্‌ডাস্ট্রিজ। আজকাল গভর্ণমেণ্টও টাকা দিচ্ছে। দেখবি ঠিক লাগবে, আর লাগলেই বস্তা বস্তা টাকা হাওয়ায় উড়ে আসবে। সারা বাড়ী টাকায় ভরে যাবে। বাথরুমে রেখেও কুলোতে পারবি না।

নব ॥ সামন্ত প্রডাকসন্স প্রাইভেট লিমিটেড!

বিবেক ॥ বাঃ। বেড়ে নাম ভেবেছিস তো। সামন্ত প্রোডাকসন্স প্রাইভেট লিমিটেড। সারা পৃথিবীতে নাম ছড়িয়ে পড়বে। রিলিজ করার আগেই ক্যান ফেস্টিভ্যালে পাঠিয়ে দেব। দিলেই ফার্স্ট। আর এখানে যখন রিলিজ করবে—দেখবি মাসের পর মাস হাউসফুল যাবে। যা একখান এ্যকটিং করব, সবার তাক লেগে যাবে। চান্স পেলে বিবেক

সামন্ত যে কি করতে পারে তখন সবাই জানতে পারবে। বুঝলি গোড়াতেই বিজ্ঞাপন দিয়ে দেব—পৃথিবীতে এই প্রথম, বিশ্বে এই প্রথম—সিনেমাজগতের দিকচিহ্ন।

নব ॥ কিন্তু দাদা, আমি কি এই সূক্ষ্ম কাজ পারব? একেবারে হাতুড়ি ছেড়ে ক্যামেরা। কি রকম সব হাল্কা হাল্কা লাগবে না।

বিবেক ॥ ভালই তো। বেশ আরামে ক্যামরা ঘোরাবি—একেবারে লাঠির মত করে।

নব ॥ সত্যিই কি নাম হবে? একদমে সারা পৃথিবীতে?

বিবেক ॥ হয়রে হয়। "প্রতিভা এমনি জিনিষ যাহা কিছু স্পর্শ করে তাহাই সজীব করিয়া তোলে।" হে হে বাবা, এ আমার কথা নয় ছেলেবেলা বইতে পড়েছিলাম, একেবারে printed matter. ক্যামরাম্যান হিসেবে একবার যদি তোর নাম হয়—দেখবি কনট্রাকটের বহর। ঘুমনোর সময় পাবি না। চব্বিশ ঘন্টা ক্যামেরার হাতল ধরে বসে থাকবি। আর আমার—দেখবি সরষের তেলের লাইনের চেয়েও বড় লাইন করে প্রোডিউসাররা বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমি আর চুমকি দুজনেই সই করে যাব। হলিউড থেকে ডেকে পাঠাবে মহাভারতে এ্যাকটিং করার জন্যে।

নব ॥ হলিউডে মহাভারত তুলছে?

বিবেক ॥ আরে যদি কখন তোলে ওরাই তুলবে। আমাদের সব ভাল জিনিস ওরাই চেনায়। বিদেশীরা না থাকলে এদেশে রবীন্দ্রনাথ, সুভাষ বোস, সত্যজিত রায়—এঁদের এদেশের কেউ চিনত?

নব ॥ তা বটে। তবে আমি ভাবছি যদি একবার নাম হয় তবে ফোরম্যান শালার মুখের ওপর ঠিক জুতো মারা হবে।

বিবেক ॥ তবে! তুই কালই চাকরী ছেড়ে দে। দুজনে একবার কোমর বেঁধে লাগি। তারপর দেখিস কি হয়। সব সময় মনে রাখবি—united we stand, divided we fall.

নব ॥ তাতো বুঝলাম—তবু—

বিবেক ॥ তবু আবার কিরে? জীবনে বড় হতে গেলে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। রবার্ট ব্রুশের কথা তোর মনে নেই!

নব ॥ কিন্তু আমি আরেকটা কথা ভাবছি। আরেকভাবে আমরা বড়লোক হবে পারি।

বিবেক ॥ মানে ?

নব ॥ মানে—সেদিন আমার সঙ্গে গণেশের দেখা হয়েছিল গ্র্যাণ্ডের সামনে। তুই তো ওর জ্যাঠার ফার্মে কিছুদিন কাজ করেছিলি—তাই না? ও তোর সম্বন্ধে দেখলাম দারুণ ইন্টারেস্টেড। স্পোর্টসগুড্‌সের বিরাট কারবার করছে। এই রাস্তায় তুই তো ওকে প্ল্যান দিয়েছিলি। আজকাল নাকি ভারতের বাইরেও মাল চালান দিচ্ছে।

বিবেক ॥ তাতে দাঁড়ালটা কি ?

নব ॥ মানে—আমি বলছিলাম যে এককালে ও তোর খুব ভক্ত ছিল। আর সেদিনও দেখলাম—কি করিস, কোথায় থাকিস, সব খুঁটিয়ে জিগ্যেস করছে।

বিবেক ॥ তুই কি বললি ?

নব ॥ আমি—আমি বললাম যে তুই ফিল্ম লাইনে ঢুকেছিস। কতকগুলো ছবিতে কাজ করার কথা হচ্ছে। হিরোর কাজ।

বিবেক ॥ হুম্।

নব ॥ কি হল ?

বিবেক ॥ কিছু না। আমার ঘুম পাচ্ছে। শুয়ে পড়ি।

নব ॥ কিন্তু এটা নিয়ে ভেবে একটা কিছু ঠিক করলে হত—তাই না ? (বিবেককে চুপ করে থাকতে দেখে) কই কিছু বল।

বিবেক ॥ পরে দেখা যাবে। ফিল্মে তাহলে তোর ইচ্ছে নেই ? হিম্মতও নেই ? ভীতু কোথাকার।

নব ॥ তা নয় দাদা। আমি বলছিলাম কি ভাল করে ভেবে একটা কিছু ঠিক করতে। তাছাড়া—আমি ভাবছি বিয়ে করব। তখন তো টাকা লাগবে। আমার খুব সামান্যই জমেছে। ফট্ করে খরচা করে বসলে যদি পরে বিপদ হয়।

[শশধরের প্রবেশ। এসে চেয়ারে বসে। জল বাতাসা খায়]

বিবেক ॥ তুই বিয়ে করবি !

নব ॥ মানে—ভাবছি করলে মন্দ হয় না।

বিবেক ॥ হুম্।

নব ॥ তুই গণেশের সঙ্গে দেখা কর।

বিবেক ॥ করতে পারি। তবে তোর মনে আছে ওর জ্যাঠার ফ্যার্মে একটা

টাকা নিয়ে গণ্ডগোল হয়েছিল। ক্যাশে তিনশ' টাকা কম ছিল? ওদের ধারণা টাকাটা আমিই নিয়েছি।

নব ॥ সে তো অনেকদিন আগের কথা। ওদের হয়ত মনেই নেই। তাছাড়া সেদিন তো আমাকে কিছু বল্ল না।

বিবেক ॥ হুঁ। আমার মনে হয়েছিল হয়ত কিছু বলবে। আর তাই কিছু বলার আগেই ছেড়ে দিয়েছিলাম।

শশধর ॥ ইঞ্জিনটা ধুয়েছিস, বড় ব্যাটা!

[বিবেকের মুখ বিষাদে ভরে যায়]

নব ॥ থাকগে শুয়ে পড়ি। রাত অনেক হয়েছে।

শশধর ॥ সাবধানে কাজ করিস। দেখিস তোর জামায় যেন কালি না লাগে।

বিবেক ॥ (শুতে শুতে) চুমকির সঙ্গে আজ একবার দেখা হলে বেশ হত।

শশধর ॥ বাঃ, তোর হাতের কাজ কি চমৎকার। [আলো কমে যেতে থাকে]

নব ॥ (শুতে শুতে) বাপির সঙ্গে কাল ভাল করে কথা বল। দেখ কি বলে।

বিবেক ॥ কি বলব! [আপনমনে] মিথ্যেবাদী। জোচ্চর…

নব ॥ শ্‌ শ্‌। ঘুমো দাদা।

[ওদের ওপর থেকে আলো চলে যায় কথা শেষ হওয়ার আগেই। ঘরের চেহারাটা ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে আসে। সমস্ত জায়গা জুড়ে গাছের পাতার ছায়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায় পাতার মর্মর শব্দ। ক্লান্তিতে মাথা টেবিলের ওপর রাখে। অন্ধকার হয়ে যায়।

নীল-সবুজ আলো এসে পড়ে, শুধু শশধরের ওপর। মৃদু মৃদু হাসি। বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে। সামনে যেন ছোট বিবেককে দেখতে পায়।]

শশধর ॥ তুই এখন খুব ছোট। মন দিয়ে লেখাপড়া কর। বিরাট ভবিষ্যত তোর সামনে। তাই নাকি? প্রত্যেকটা মেয়ে তোকে খাওয়ায়? তোর বই-এর মধ্যে চিঠি রেখে দেয়? না-না। এখন তুই ওদিকে মন দিস না। তোর জন্যে আমি খুব সুন্দরী বউ এনে দেব।

[শশধর ক্রমশঃ বিবেককে উদ্দেশ করে কথা বলতে থাকে। চেয়ার ছেড়ে উঠে বাঁদিকের কোনে মঞ্চের সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। ওর গলা ক্রমশঃ চড়ে উঠতে থাকে।]

তোর গাড়ী পরিষ্কার করা দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। এই ছোট ব্যাটা, স্টিয়ারিংটা মোছা বাকী রইল। ফ্লানেলটা দিয়ে মুছে নে। হ্যাঁ। ঠিক আছে। ওরে ছোট, খবরের কাগজ ভিজিয়ে সামনের কাঁচটা মুছে নে। দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বড় ব্যাটা, দেখিয়ে দে। ওই দেখ ছোট, তোর দাদা কি সুন্দর করে। হ্যাঁ, ওই রকম প্যাডের মত করে নিবি তারপর ভিজিয়ে ঘষে দিবি। (কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর ওপর দিকে তাকায়) ওরে বড় ব্যাটা, একদিন সময় করে ছাদে উঠে কদমগাছের ডালটা কেটে দিতে হবে। সামনেই কালবৈশাখী, ডালটা ভেঙ্গে পড়লে বাড়ীটার ক্ষতি হবে। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে নে ব্যাটারা, তোদের জন্যে আমি একটা মজার জিনিস এনেছি।

ছেলেরা ॥ (নেপথ্যে) কি এনেছ, বাপি?

শশধর ॥ আগে কাজ শেষ কর তারপর বলব।

[ছোট বিবেক ও ছোট নব-র প্রবেশ। ছোট নব-র হাতে বালতি ও ঝাড়ন]

বিবেক ॥ কেমন হয়েছে বাপি? একেবারে নতুন দেখাচ্ছে কিনা?

শশধর ॥ দারুণ দারুণ হয়েছে। সাবাস ব্যাটা।

নব ॥ বাপি, কি এনেছো?

শশধর ॥ পেছনের সিটে গদির নীচে আছে।

নব ॥ আমি আনছি। (বালতী ও ঝাড়ন হাতে নিয়ে চয়ে যায়।)

বিবেক কি এনেছো বল বাপি? কি এনেছো?

শশধর ॥ (ছেলেকে থাবড়া মেরে আদর করতে করতে) তোদের খুব দরকার এমন একটা জিনিস।

বিবেক ॥ (একটু অধৈর্যভাবে নব-র যাওয়ার দিকে ফিরে) কি এনেছে রে?

নব ॥ (নেপথ্যে) আরে দাদা, ক্রিকেট ব্যাট।

বিবেক ॥ (প্রচণ্ড আনন্দে শশধরকে জড়িয়ে ধরে) বাপি!

শশধর ॥ হুঁ হুঁ বাবা, চালাকী না, একেবারে রিচি বেনোর সই করা।

[ছোট নব ক্রিকেট ব্যাট হাতে ছুটে আসে। বিবেক ছুটে গিয়ে ওর হাত থেকে ব্যাটটা নিয়ে নেয়। এক প্রান্তে গিয়ে খেলার ভঙ্গীতে ধরে। নব বল দেওয়ার ভঙ্গী করে।]

বিবেক ॥ হুররে! (ব্যাটটা পরখের ভঙ্গীতে ধরে) তুমি কি করে জানলে আমাদের একটা ব্যাটের খুব দরকার?

শশধর ॥ আমি তোর বাপ আর আমি জানব না তোর কি দরকার!

নব ॥ (মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে পা দুটো ওপরের দিকে রেখে প্যাডেল করতে করতে) বাপি, তুমি দেখেছ আমি কত রোগা হয়ে যাচ্ছি।

শশধর ॥ ভাল করে স্কিপ কর আর বেশি করে ডিম খাবি।

[নব উঠে বিবেকের হাত থেকে ব্যাটটা নিয়ে নেয়]

বিবেক ॥ (ঘরের কোন থেকে একটা ফুটবল এনে) বাপি, এই ছাখ আমার নতুন ফুটবল।

শশধর ॥ কোথায় পেলি?

বিবেক ॥ আমাদের কোচ আমাকে ভাল করে প্র্যাকটিশ করতে বলেছে।

শশধর ॥ তাই নাকি? উনি নিজে থেকে তোকে বলটা দিয়ে দিলেন?

বিবেক ॥ না বাপি। আমি কলেজ থেকে ধার এনেছি। (হেসে ওঠে)

নব ॥ না বাপি, গেঁড়িয়েছে।

বিবেক ॥ এই চোপ্। ফের বাজে কথা।

নব ॥ কলেজে কখনও খেলার জন্যে বল ধার পাওয়া যায়—বাপি?

শশধর ॥ (হেসে) আচ্ছা, ঠিক আছে। বলটা তুই ফেরত দিয়ে দিস।

বিবেক ॥ (রেগে) ঠিক আছে, ফেরত দিয়ে দেব।

শশধর ॥ আমি তোকে টাকা দিয়ে দেব, তুই একটা কিনে নিস। (বিবেক ও নবতে চোখাচোখি হয়, বিবেক চোখ টিপে মুচকি হাসে।) তোর কোচ তোর নিষ্ঠা দেখে নিশ্চয় খুব খুশি হবেন।

বিবেক ॥ উনি খুব ভালবাসেন, সব কাজে আমায় উৎসাহ দেন।

শশধর ॥ দিতেই হবে। তোর মত ছেলেকে সবাই ভালবাসবে। অন্য কেউ বলটা নিলে নিশ্চয় শাস্তি পেত। তুই ফেরত দিয়ে দিস—দেখবি কিছু বলবে না। তারপর আর কি খবর বল?

বিবেক ॥ বাপি, এবার তুমি অনেকদিন বাইরে ছিলে, আমার খুব খারাপ লাগছিল।

শশধর ॥ (খুব খুশী হয়ে) আমি না থাকলে তোর খারাপ লাগে ?

বিবেক ও নব ॥ হ্যাঁ, বাপি।

বিবেক ॥ বাড়ীতে থাকতে ভালই লাগে না।

শশধর ॥ (দুই ছেলেকে কাছে টেনে নিয়ে) ঠিক আছে। তোদের একটা কথা বলি, কাউকে এখন বলিস না। কিছুদিনের মধ্যেই আমি নিজের ব্যবসা শুরু করব, তখন আর আমাকে বাইরে যেতে হবে না।

নব ॥ বাপি, গোপাল কাকুর মত ?

শশধর ॥ গোপাল কাকু ? ফুঃ। ওর ব্যবসা আবার একটা ব্যবসা নাকি ? ক'টা লোক ওকে চেনে ? এ দেখবি বিরাট ব্যবসা।

বিবেক ॥ বাপি, এবার তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?

শশধর ॥ আমি প্রথমে টাটানগরে গিয়েছিলাম। ওখানে আমার এক চেনা মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হল।

বিবেক ॥ মন্ত্রী !

শশধর ॥ হ্যাঁ, আমরা এক হোটেলেই উঠেছিলাম।

বিবেক ॥ উনি তোমার সঙ্গে কথা বল্লেন !

শশধর ॥ কেন বলবে না ? আমি জিজ্ঞেস করলাম—কেমন আছেন ? উনি হেসে বল্লেন "ভাল আছি।" তারপর আমরা এক টেবিলে বসে কফি খেলাম। পরদিন ভোরে আমি রাঁচি চলে গিয়েছিলাম। রাঁচীতে অনেক টাকার বিক্রী হল। তারপর গেলাম পাটনায়—আমার বেশির ভাগ কাজ পাটনায়। পাটনা জায়গাটাও বড় চমৎকার। ওখানে দিন কয়েক কাজ করে গেলাম, মুঙ্গের, ভাগলপুর, ডালটনগঞ্জ। তারপর ধানবাদ থেকে সোজা এখানে।

বিবেক ॥ বাপি, একবার আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চল।

শশধর ॥ ঠিক আছে। তোকে এই সামনের পূজার ছুটিতে নিয়ে যাব।

নব ॥ বাপি, আমিও যাব।

শশধর ॥ যাবি, যাবি। সমস্ত বিহার তোদের ঘুরিয়ে দেখাব। দেখবি কত দেখার জায়গা আছে। কত রকমের লোক আছে। দেখবি সারা বিহারে আমার কত চেনা লোক। আর তারা কি সব বিরাট বিরাট

লোক। তোদের কত আদর করবে। তোরা একেবারে বাড়ীর আরামে থাকবি। ঠিক আছে, এই পূজার ছুটিতেই তোদের নিয়ে যাব।

বিবেক ও নব॥ ঠিক তো?

শশধর॥ তোরা তোদের সব খেলার জিনিস সঙ্গে নিবি।

নব॥ বাপি, আমি তোমার ব্যাগ বইব।

শশধর॥ হা-হা-হা…সে দারুণ মজার হবে। পাটনায় আমার সঙ্গে যখন তোরা কোন দোকানে ব্যাগ নিয়ে ঢুকবি—হা হা হা—গোটা পাটনায় হৈ হৈ লেগে যাবে। তারপর, বড় ব্যাটা, তোর খেলাধুলো ঠিকমত চলছে তো?

বিবেক॥ হ্যাঁ বাপি।

শশধর॥ তোকে তো এবার য়ুনিভার্সিটির ক্যাপ্টেন করেছে, ছেলেরা সবাই কি বলে?

নব॥ বাপি, কলেজে মেয়েরা সব সময় ভীড় করে দাদাকে ঘিরে রাখে।

বিবেক॥ বাপি, এই রবিবারে আমার একটা বড় ম্যাচ আছে। আমি ঠিক হ্যাটি ক করব। দেখবে তুমি?

নব॥ এই দাদা, তোর না সামনে পরীক্ষা?

বিবেক॥ এবারের মত এটা আমার শেষ খেলা বাপি। তোমায় কিন্তু দেখতেই হবে। ইণ্টার য়ুনিভার্সিটি ফুটবল ফ্যাইনাল ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডে বম্বের সঙ্গে।

শশধর॥ তাই নাকি? এবার পাটনায় সবাইকে বলতে হবে।

[খুব চিন্তিত মুখে ছোট সুশান্ত ঢোকে। বিবেকের চেয়ে বয়েসে কিছু ছোট। চোখে চশমা।]

সুশান্ত॥ বিবেক, তুই যে বলেছিলি আমার সঙ্গে mathematics টা তৈরী করবি। চল।

শশধর॥ এস সুশান্ত, তোমায় এত রোগা লাগছে কেন?

সুশান্ত॥ সামনে পরীক্ষা কাকাবাবু। বিবেকেরও এখন পড়া উচিত।

নব॥ (সুশান্তকে ব্যাট দেখিয়ে) বাপি আজ এনেছে, চল খেলি।

সুশান্ত॥ বিবেক। (বিবেকের কাছে গিয়ে) প্রফেসর মিত্র-র সঙ্গে আজ দেখা হয়েছিল। উনি বারবার আমায় জিজ্ঞেস করলেন তুই কি রকম

পড়ছিস। আমায় বল্লেন খুব চাপ দিয়ে mathematics টা তৈরী না করলে তুই নির্ঘাত ফেল করবি।

শশধর ॥ তাই নাকি? তবে যা ব্যাটা, পড়গে যা। প্রফেসর মিত্র—

বিবেক ॥ বাপি, তোমাকে একটা জিনিস দেখান হয়নি— (অদৃশ্য জায়গায় ছুটে চলে যায়।)

সুশান্ত ॥ প্রফেসর মিত্র আজ আমাকে বারবার বলেছেন। আমাদের টেস্টের খাতা উনি—

বিবেক ॥ [ছুটে এসে শশধরকে একটা মেডেল দেখায়] দেখ বাপি, আমার বেস্ট স্পোর্টসম্যানের প্রাইজ।

শশধর ॥ বা! খুব সুন্দর দেখতে তো! কি সুন্দর লেখা—University of Calcutta.

সুশান্ত ॥ পরীক্ষায় পাশ করতে না পারলে ও মেডেলের কোন দাম থাকবে না, কাকাবাবু।

শশধর ॥ তুমি দেখছি খুব পাকা পাকা কথা বলতে শিখেছ। এই মেডেল কি তোমার পরীক্ষায় পাশের চেয়ে কিছু কম? জীবনে কখন তুমি এরকম একটা মেডেল আনতে পেরেছ!

সুশান্ত ॥ কিন্তু কাকাবাবু, প্রফেসর মিত্র—

শশধর ॥ চুলোয় যাক, তোমার প্রফেসর মিত্তির। দেখ সুশান্ত, বই-এর পোকা হয়ো না। কি রকম ফ্যাকাশে চেহারা তোমার।

সুশান্ত ॥ [চলে যাওয়ার উদ্যোগ করে] বেশ, আমি বাড়ী যাচ্ছি বিবেক। [চলে যায় তিনজনে একসঙ্গে হেসে ওঠে]

শশধর ॥ সুশান্তকে কলেজে সবাই পছন্দ করে?

বিবেক ॥ মোটামুটি, খুব একটা কিছু নয়।

নব ॥ অনেকে তো দেখতেই পারে না।

শশধর ॥ সে কথাই তো বলি। সুশান্ত পরীক্ষায় রেকর্ড করতে পারে কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। জীবন সংগ্রামে নেমে দেখবি তোরা ওকে ফেলে অনেক এগিয়ে গিয়েছিস। সেলসলাইনে যখন ঢুকবি, দেখবি চেহারা আর ব্যক্তিত্বের জয় জয়কার। প্রত্যেকে তোদের পছন্দ করবে, সব জায়গায় তোরা সফল হবি। এই আমার কথাই ধর আমি তো বেশি

লেখাপড়া শিখিনি। প্রত্যেক জায়গায় গিয়ে জানাই—শশধর সামন্ত হাজির। ব্যস, নিজের কাজ গুছিয়ে নিয়ে চলে আসি।

বিবেক ॥ তুমি অন্য সবাইকে আউট করে দাও ?

শশধর ॥ আউট ! বিশেষ করে পাটনায় সব কটাকে একেবারে বোল্ড আউট করে দিই। [হাসে]

নব ॥ বাপি, আমার অনেক ওজন কমে গেছে। [শেফলীকে ঢুকতে দেখা যায়। চেহারা আগের মত হলেও বেশ চটপটে আর কাপড়টা বেশ আঁটসাঁট করে পরা। হাতে ছোট একটা বালতি।

শেফালী ॥ [হাসতে হাসতে] বাপ বেটায় এসে শুরু করেছ ?

শশধর ॥ [হেসে] কেন ? হিংসে হচ্ছে বুঝি ?

শেফালী ॥ তুমি বাড়ী এলে তো আমি বাঁচি। নইলে সারাদিন ওরা আমায় জ্বালিয়ে মারে।

শশধর ॥ তুমি কি আবার ধোয়াধুয়ি শুরু করবে ? রেখে দাও। ব্যাটারা করে দিচ্ছে।

বিবেক ॥ মা, আমি ধুয়ে দিচ্ছি, তুমি রেখে দাও।

শেফালী ॥ [হাসিমুখে] থাক খুব হয়েছে। তোরা বরং খেলতে যা। পাড়ার ছেলেরা ডাকাডাকি করছে।

বিবেক ॥ করুকগে, আমি এখন বাপির সঙ্গে কথা বলছি।

শশধর ॥ [খুব খুসি হয়ে] তা' তুই গিয়ে ওদের একটা খেলার ব্যবস্থা করে চলে আয়।

বিবেক ॥ বাপি, আমি বরং ওদের দিয়ে সামনের মাঠটা পরিষ্কার করিয়ে নিই, ভাল করে খেলা যাবে।

শশধর ॥ সেই ভাল।

বিবেক ॥ [নিজেদের ঘরের জানালায় যায়] আরে এই, তোরা বড় মাঠটা পরিষ্কার কর। আর মাটি দিয়ে গর্তগুলো বুঁজিয়ে দিবি।

কণ্ঠস্বর ॥ আচ্ছা, তুই তাড়াতাড়ি আয়।

বিবেক ॥ [নেপথ্যে] আমি যাচ্ছি। তোরা কাজ শুরু করে দে। [ফিরে এসে] চল ছোট, ওদের দিয়ে মাঠটা পরিষ্কার করিয়ে নিই—ফুটবল প্রাক্‌টিশ করব। মা, বালতীটা দাও, আমার লাগবে। [নবকে নিতে ইঙ্গিত করে] চল্। ছুটে চল। [ওরা চলে যায়]

শেফালী ॥ পাড়ার ছেলেরা খোকার খুব বাধ্য।

শশধর ॥ শেখাতে হয় বুঝলে গিন্নী, শেখাতে হয়। বাইরে আমি হাজার হাজার টাকার বিক্রী করছিলাম, শুধু এইজন্যে আবার ফিরে এলাম।

শেফালী ॥ তোমার আসতে কোন কষ্ট হয়নি তো?

শশধর। কষ্ট! বলে আমার চ্যাম্পিয়ান গাড়ী। একেবারে পক্ষীরাজের মত উড়ে এল। [বাইরে ছেলেদের আনন্দের হট্টগোল শোনা যায়]

শেফালী ॥ পাড়ার সব কটা বোধ হয় ওই মাঠে জুটেছে। হ্যাঁগো, এবার তোমার বিক্রী কি রকম হল?

শশধর ॥ মুঙ্গেরে পাঁচ হাজার, রাচীতে দশ আর পাটনায় বিশ।

শেফালী ॥ তাহলে হল পঁয়ত্রিশ হাজার। আর—

শশধর ॥ আর সব জায়গা মিলিয়ে হাজার পনেরোর মত হবে।

শেফালী ॥ মোট পঞ্চাশ। আগের দরুণ ছিল চল্লিশ। তাহলে দাঁড়াল নব্বই। তার মানে তোমার কমিশন দাঁড়াল গিয়ে ন'শ। বেশ ভালই তো।

শশধর ॥ আমি ঠিক কষে দেখিনি। কিছু কমই হয়ত হবে।

শেফালী ॥ কম? কত?

শশধর ॥ আমার মনে হয় সব মিলিয়ে হাজার পঞ্চাশ ধরাই উচিত।

শেফালী ॥ তা হ'লে পাঁচশ।

শশধর ॥ মুস্কিল হল কি জান, টাটার দু'-তু'টো বড় দোকান বন্ধ ছিল। একজনের ছেলের সঙ্গে আরেকজনের মেয়ের বিয়ে। নয়ত আমার কমিশন আরোও বেশি হত।

শেফালী ॥ তবু তো ভালই পেয়েছ।

শশধর ॥ হ্যাঁগা, এমাসে কি রকম খরচা?

শেফালী ॥ বাড়ীর দেনার কিস্তি দেড়শ' টাকা, মুদি বাট আর এই পাখার জন্যে বারো—

শশধর ॥ কেন? এটার আবার কি হল?

শেফালী ॥ চালালেই আওয়াজ হত।

শশধর ॥ কিন্তু এটা তো একেবারে নতুন পাখা—

শেফালী ॥ আমিও মিস্ত্রীকে তাই বল্লাম। কিন্তু ও-যে বল্ল কি যেন একটা খারাপ হয়ে গেছে।

শশধর ॥ বল বেয়ারিং। আমিই সারিয়ে নিতে পারতাম।

শেফালী ॥ আমি কি অত জানি। তাছাড়া যা গরম পড়েছিল—তোমার আসার সময় হয়ে আসছিলো। তাই সারিয়ে নিলাম।

শশধর ॥ যাক্‌গে, তারপর ?

শেফালী ॥ স্টেশনারী দোকান পঞ্চাশ। কলেজের মাইনে—কাঁচা বাজার। আর গতমাসের গাড়ী সারানর বিল—

শশধর ॥ ওকে আমি এক পয়সা দেব না। একেবারে বাজে সারিয়েছে। ভাল করে চালানই যায় না।

শেফালী ॥ ওকে কি টাকা না দিয়ে পারবে ?

শশধর ॥ তা বটে। বেটা ভাল সেলস্‌ম্যান। ঠিক আদায় করে ছাড়বে।

শেফালী ॥ তাহ'লে মোট দাঁড়াল কত যেন—হ্যাঁ চারশ' পঞ্চাশ, হাতে থাকে পঞ্চাশ।

শশধর ॥ মাইনের টাকা খরচ হয়ে গেছে ?

শেফালী ॥ হ্যাঁ। হাঁগো, টুরের দরুণ কিছু বাঁচেনি ?

শশধর ॥ মানে—বেঁচেছিল শ' খানেকের মত, তা আসার পথে ব্যাটটা কিনে ফেল্লাম। এখন কি করে চলবে বলতো !

শেফালী ॥ একরকম চলে যাবে। তাছাড়া ক'দিন পরই তো আবার মাইনে পাবে।

শশধর ॥ তা পাব। ভাবছি সামনের মাসে সব ক'টার গলা অবধি ভর্তি করে দেব। ব্যবসাটা এত খারাপ যাচ্ছে। বড় বড় ডাক্তারগুলোর কাছে পর্যন্ত রোগী নেই। সব ক'টা বসে মাছি তাড়াচ্ছে।

শেফালী ॥ অসুখ-বিসুখ কম হচ্ছে বুঝি ?

শশধর ॥ ভীষণ কম। প্রায় সবাই ভাল থাকছে। ওষুধ আর বিক্রী হবে কি করে ? তাছাড়া কি জান, লোকের বোধহয় আজকাল আর আমাকে ভাল লাগে না।

শেফালী ॥ কি যা তা বলছ ?

শশধর ॥ কয়েকটা জায়গায় আমি ঢুকলেই সবাই হেসে ওঠে।

শেফালী ॥ তোমায় ভাললাগে বলেই হাসে।

শশধর ॥ না, সে হাসি নয়, এ ঠাট্টার হাসি।

শেফালী ॥ কেন ? ঠাট্টা কেন ? না গো ওরকম করে বল না।

শশধর ॥ কেন হাসে তা আমি জানি না। আবার অনেকে আমাকে এড়িয়ে চলে।

শেফালী ॥ কিন্তু তোমার ব্যবসা তো ভালই চলছে। মাইনে কমিশন মিলে প্রতিমাসেই হাজারের ওপর উঠছে।

শশধর ॥ তার জন্যে আমায় অনেক পরিশ্রম করতে হয়। ভোলা বলে অন্যেরা নাকি আমার চেয়ে অনেক কম খেটে অনেক বেশি রোজগার করে। তাছাড়া আমি জানি না কেন—আজকাল আর আমি নিজেকে থামাতে পারি না—বড় বেশি বকি।

শেফালী ॥ কই, তুমি তো খুব একটা কথা বলনা। আসলে তুমি খুব আমুদে।

শশধর ॥ [হাসে] আমি গোম্‌রা মুখে থাকতেই পারি না। জীবন তো দু'দিনের। হাসি আর আনন্দে কাটাতে ভাল লাগে। কিন্তু আমি বোধ হয় একটু বেশি ঠাট্টা তামাসা করি।

শেফালী ॥ কেন? তুমি তো—

শশধর ॥ আমার কি রকম একটা বদখত চেহারা, বোকা বোকা দেখতে। আমি তোমায় বলিনি। এই শীতের সময় আমি ভাগলপুর মেডিকেল স্টোরে ঢুকছি, দেখি এক ব্যাটা হাঁটুর বয়সী সেলস্‌ম্যান পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আরেকজনকে বলে গেল "ঐ দেখ, বুড়ো বাঁদরটা আসছে।" দোষের মধ্যে ভীষণ ঠাণ্ডার জন্যে আমি একটা মাংকি ক্যাপ পরেছিলাম। আমার ভীষণ রাগ হল। ব্যাটাকে ডেকে চড় কষিয়ে দিলাম। কিন্তু কাজটা ভাল করিনি। ব্যাপারটা পরে যে শুনেছে, সেই হেসেছে। ঐ নামটা এখন আমার পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শেফালী ॥ ছিঃ ছিঃ সে কি গো?

শশধর ॥ আমার আজকাল গা-সহা হয়ে গেছে। তাছাড়া আমি জানি আমি সুপুরুষ নই।

শেফালী ॥ কি যে বল? ক'জনের এত সুন্দর চেহারা। তুমি সকলের চেয়ে সুন্দর—সারা পৃথিবীতে—

শশধর ॥ পাগলী!

শেফালী ॥ না গো, সত্যি। অন্ততঃ আমার কাছে। সবচেয়ে সুপুরুষ। [অন্ধকার থেকে একটি মেয়ের হাসি শোনা যায়।] আর

ছেলেরা! ক'জনের এত সুন্দর ছেলে হয়। [আবার হাসি শোনা যায়।]

[অস্পষ্টভাবে একটি মেয়েকে আয়না হাতে প্রসাধন করতে দেখা যায়।]

শশধর ॥ [প্রচণ্ড আবেগে] তুমি সত্যিই খুব ভাল। তোমার মত স্ত্রী বহু ভাগ্যে পাওয়া যায়। তুমি আমায় এত ভালবাস! বাইরে বেরিয়ে—আমি যখন ট্যুরে থাকি তখনও তোমায় পেতে আমার প্রচণ্ড ইচ্ছে করে। আর তোমায় পেলে আমি যেন জীবনের মানে খুঁজে পাই।

[উচ্ছল হাসি আরোও জোর হয়ে ওঠে। শশধর হাটতে হাটতে মঞ্চের মাঝখানে চলে আসে। ওর ওপর আলো জোরাল হয়। শেফালীর আলো কমে আসে। শেফালীর হাসিভরা পরিতৃপ্ত মুখ দেখা যায়। জল-তরঙ্গের আওয়াজ। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে একটি মেয়ে এসে শশধরের কাছাকাছি দাঁড়ায়। হাসছে, তখনও ছোট্ট হাত আয়নায় মুখ দেখতে থাকে।]

মাঝে মাঝে আমি প্রচণ্ড একা হয়ে যাই—বিশেষ করে ব্যবসা যখন খারাপ থাকে আর কথা বলার সঙ্গী পাই না। আমার তখন কেমন যেন মনে হয় আমি আর জীবনে কোনদিন বিক্রী করতে পারব না—তোমাদের খাওয়াতে পারব না। [শশধরের হাসি মিশে আসতে থাকে।] তখন আমি আর একা থাকতে পারি না। আমার তখন দরকার হয়—

মেয়েটি ॥ আমাকে। কিন্তু তুমি তো আমায় পাওনি। আমিই তোমায় কুড়িয়ে পেয়েছি।

শশধর ॥ (খুশি হয়ে) কুড়িয়ে পেয়েছ?

মেয়েটি ॥ [খিলখিল করে হেসে] নিশ্চয়। আমি তো সারাদিন হাসপাতালে কত সেলস্‌ম্যান যেতে আসতে দেখতাম। কিন্তু তোমার মত আর কেউ তো আমায় টানেনি। তোমার কথা, হাসি, রসিকতা আমার বড় ভাল লাগত। তাইতো, তোমার কাছে এসে কত রাত কত মজা করেছি। তাই না?

শশধর ॥ [এগিয়ে গিয়ে মেয়েটির হাত ধরে] নিশ্চয়। তুমি কি এখন চলে যাবে?

মেয়েটি ॥ রাত দু'টো হল যে—

শশধর ॥ [আরও কাছে টেনে] তা' হোক, তোমার এখন যাওয়া চলবে না।

মেয়েটি ॥ এই ! পাড়ার সবাই যা তা বলবে। তুমি আবার কবে আসবে।

শশধর ॥ দিন পনেরো পরেই। তখন তুমি আসবে তো ?

মেয়েটি ॥ আর কোথায় যাব। তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে। তুমি ভীষণ ভালো।

শশধর ॥ আমি ভীষণ আবার ভালোও। তুমি আমায় কুড়িয়ে পেয়েছ ?

মেয়েটি ॥ তাছাড়া কি। তোমার মত একটা মিষ্টি বাচ্চাকে পড়ে থাকতে দেখলে কোন মেয়ে না বুকে তুলে নেয়। তুমি খুব মিষ্টি।

শশধর ॥ তবে যে আমায় ছেড়ে চলে যাচ্ছ ? যদি আর কেউ বুকে তুলে নেয় ?

মেয়েটি ॥ নিক না ! আমি আবার কেড়ে নেব।

শশধর ॥ ঠিক আছে। আমি কিন্তু দিন পনেরোর মধ্যেই আসব।

মেয়েটি ॥ তার বেশি দেরী কর না। এবার তোমায় আমি স্টোরের সবার সঙ্গে ভালো করে আলাপ করিয়ে দেব। তোমার ওষুধ হাসপাতালে অনেক চলবে।

শশধর ॥ এবার আমি তোমার কাছে অনেকদিন থাকব। আর তোমাকে অনেক [থাবড়া মারে] আদর করব।

মেয়েটি ॥ উঁ। লাগে। কি দস্যিরে বাবা। এবার কিন্তু একটা শান্তিপুরি শাড়ী আনতেই হবে। মনে থাকে যেন।

শশধর ॥ একটা ! গোটা শান্তিপুর এবার তোমার কাছে নিয়ে আসব।

[দুজনে হাসতে থাকে। এদের হাসির মধ্যে শেফালীর হাসি মিশে যায়। এদের ওপর আলো কমে গিয়ে শেফালীর ওপর আলো জোর হয়। শেফালী একটা শাড়ী সেলাই করছে।]

শেফালী ॥ সত্যিই তুমি খুব ভাল। আমিও অনেক পুণ্যে তোমায় পেয়েছি। আমার শিবরাত্রি করা সার্থক—

শশধর ॥ আমি আরও অনেক রোজগার করব। দেখ তোমাদের আর কোন কষ্ট থাকবে না। আমি—

শেফালী ॥ একথা কেন বলছ গো ? তুমি তো অনেক আয় কর। আমাদের বেশ ভালভাবে চলা উচিত। আমিও—

শশধর ॥ ওটা কি করছ ?

শেফালী ॥ সেলাই। শাড়ীটা হঠাৎ খোঁচা লেগে ছিঁড়ে গেল। এত ভাল শাড়ী—

শশধর ॥ [রেগে শাড়ীটা হাত থেকে নেয়। ভাঁজ খোলায় দেখা যায় বেশ ছেঁড়া] বেশ ভাল শাড়ী! আমার অবস্থা কি এত খারাপ? তবে! রেখে দাও।

[ছোট সুশান্ত প্রবেশ করে।]

সুশান্ত ॥ বিবেক কোথায় গেল? ওকি আজ সত্যিই পড়বে না।

শশধর ॥ সুশান্ত, তুমি ওকে পরীক্ষার সময় mathematicsটা একটু দেখিয়ে দিও।

সুশান্ত ॥ তা হয় না, কাকাবাবু। এটা য়ুনিভার্সিটির পরীক্ষা, ধরা পড়লে দুজনকে রাস্টিকেট করে দেবে।

বিবেক ॥ কোথায় গেল বাঁদরটা? আসুক আজ বাড়ীতে—

শেফালী ॥ আর বড়খোকাকে ফুটবলটা ফেরত দিয়ে দিতে বল। এযে চুরি—

শশধর ॥ বড় ব্যাটা! ব্যাটা যেখানে যা দেখবে তুলে আনবে। যেন সবকিছু ওর বাপের জমিদারীতে।

শেফালী ॥ তাছাড়া পাড়ার মায়েরা নালিশ করছিল ও মেয়েদের জ্বালাতন করে। মেয়েদের সঙ্গে নাকি খারাপ ব্যবহার করে।

শশধর ॥ আজ ওকে হাণ্টার পেটা করব।

সুশান্ত ॥ কাকাবাবু, ও আজকাল যার তার গাড়ী জোর করে নিয়ে চালায়। সেদিন মুখার্জীবাবুদের গাড়ীটা নালায় ফেলে দিয়েছিল।

[মেয়েটির হাসি শোনা যায়।]

শশধর ॥ শাট্‌আপ!

শেফালী ॥ এই তো সেদিন বোস গিন্নী আমাকে বলছিল—

[মেয়েটির হাসি শোনা যায়।]

শশধর ॥ শাট্‌আপ!

সুশান্ত ॥ কলেজে মেয়েদের নিয়ে বিবেক আজকাল—

শশধর ॥ বেরিয়ে যাও এখান থেকে। অপদার্থ! [সুশান্ত চলে যায়]

শেফালী ॥ ও বেচারীর ওপর অত চোটপাট করছ কেন? ওতো ঠিক কথাই বলেছে।

শশধর ॥ [ফেটে পড়ে] তুমি কি চাও ও সুশান্তর মত বই-এর পোকা হয়ে

থাকুক ? তারপর ওই সব মাইনাস সিক্স পাওয়ার দিয়ে কি হবে বলতে পার ? এসব করতেও হিম্মতের দরকার। [শশধরের এই রূঢ় আচরণে শেফালীর চোখ দিয়ে জল বের হয়ে যায়। আঁচল দিয়ে চোখ ঢেকে ভেতরে চলে যায়।] চারদিক থেকে নালিশ। কেবল নালিশ। ব্যাটা কি চুরি করেছে ? ও তো ফেরত দিয়ে দিয়েছে। তবে ? কেন ও চুরি করে ? আমি ব্যাটাকে কি বলেছি ? আমি জীবনে কখন ওকে ভাল ছাড়া খারাপ শেখাইনি।

[বড় নব ওপরের ঘর থেকে নেমে শশধরের পেছনে আসে।]

নব ॥ বাপি, অনেক রাত হয়েছে, এবার শুয়ে পড়।

শশধর ॥ তোমার মাকে কেন সংসারের সব কাজ নিজের হাতে করতে হয়। ওকি তোমাদের ঝি ? এই করে একদিন মরবে।

নব ॥ তুমি আবার হঠাৎ ফিরে এলে যে ?

শশধর ॥ আমি আর পারছি না। আমার নিজের বাড়ীতে আমি ফিরে এসেছি। ভগবান, সেই সময় দাদার সঙ্গে আসামে গেলে আমার এ অবস্থা হত না। আমার দাদা একটা জিনিয়াস, নিজের জোরে নিজের বুদ্ধিতে বড় হয়েছে। উফ্ কি ভুলই করেছি। সারা আসাম এক ডাকে চেনে নটবর সামন্তকে।

নব ॥ এখন আর ও কথা ভেবে—

শশধর ॥ একেবারে নিঃসম্বল অবস্থায় বাড়ী থেকে বের হয়েছিল আর আসামের জঙ্গলে কাঠের কারবার করে কোটিপতি হয়েছে।

নব ॥ উনি কি করে সব করলেন ?

শশধর ॥ অদ্ভুত ! লোকটা জানত কি হতে চায় আর তাই হয়ে দেখাল। পৃথিবীটা যেন একটা প্রকাণ্ড ঝিনুক পেটভর্তি মুক্তো। শুধু তুলে আনা জানা চাই।

নব ॥ বাপি, তুমি এবার বিশ্রাম নাও। আমার মনে হয় তোমার আর কাজ করা উচিত নয়।

॥ আমি বিশ্রাম নেব—কিসের জোরে ? তোমার ঐ তিনশ' টাকা মাইনের জোরে ? তারপর সব টাকা সংসারে দিলে তোমার নেশাভাঙ চলবে কি করে ? বিশ্রাম নাও ! ভগবান ! আজ আমি কেন কাজ

করতে পারলাম না। ওরে তোরা কোথায় গেলি, সমস্ত জঙ্গলে আগুন জ্বলছে, আমি আর চালাতে পারছি না।

[গোপালবাবুকে ঢুকতে দেখা যায়। রাত্রের পোষাক পরনে, বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছেন বোঝা যায়। ধীর স্থিরভাবে কথা বলবে]

গোপাল ॥ ব্যাপার কি? কি হয়েছে?

নব ॥ কিছু না। কাকাবাবু—

শশধর ॥ কি ব্যাপার? তুমি এখানে?

গোপাল ॥ তোমার চিৎকার শুনতে পেলাম। মনে হল কিছু হয়েছে। তুমি যখন চেঁচাও তখন পাশের বাড়ীর কথা তোমার মনে থাকে না? তোমার চীৎকারে যে আমার ছাদ উড়ে যাচ্ছিল।

নব ॥ শুয়ে পড় বাপি। অনেক রাত হয়েছে।

[গোপালবাবু নবকে চলে যেতে ইঙ্গিত করেন। নব চলে যায়।]

শশধর ॥ তুই যা। আমার এখন ঘুম আসবে না। তুমি এখানে কি করছ?

গোপাল ॥ ঘুম আসছিল না। বুকটা জ্বলে যাচ্ছে।

শশধর ॥ গুচ্ছের লঙ্কা দিয়ে খাও আবার। কি করে খেতে হয় তাই আজ অবধি শিখলে না।

গোপাল ॥ কেন? আমি তো মুখ দিয়েই খাই।

শশধর ॥ মুখ দিয়ে সবাই খায়। কিন্তু তোমার মত কেউ লঙ্কা খায় না। খাবারে ভিটামিন খেতে হয়—বুঝলে?

গোপাল ॥ তুমি তো ঘুমচ্ছো না। কয়েক হাত হোক—কি বল?

শশধর ॥ এখন? তা—তোমার কাছে তাস আছে?

গোপাল ॥ (তাস বের করে) ওটা সব সময় আমার সঙ্গে থাকে। (তাস বেঁটে তাস তুলে নিয়ে) ভিটামিন খেলে কি হয়?

শশধর ॥ হাড় শক্ত হয়। বইতে লেখা আছে।

গোপাল ॥ তাই নাকি! তা' বুক-জ্বালা কি হাড় নরম হলে হয়?

শশধর ॥ কেন বাজে বকছ! ডাক্তারীর তুমি জানটা কি?

গোপাল ॥ তুমি চটছ কেন?

শশধর ॥ যা জান না, সে বিষয়ে কথা বলতে এস না। মুখ্যু কোথাকার!

[ওদের খেলা চলতে থাকে]

গোপাল ॥ তুমি আজ বাড়ী ফিরে এলে যে ? তোমার তো কাল ফেরবার কথা ছিল।

শশধর ॥ হ্যাঁ। কাজ মিটে গেল তাই চলে এলাম।

[ওদের খেলা চলতে থাকে]

গোপাল ॥ আমার একবার বম্বে যাওয়ার দরকার।

শশধর ॥ চলে যাও। হাওড়া দিয়ে অনেক গাড়ী যায়।

[ওদের খেলা চলতে থাকে]

গোপাল ॥ তোমার কি একটা চাকরী চাই ?

শশধর ॥ আমি চাকরী করছি, তুমি তো জান। (থেমে) তুমি কে-হে আমায় চাকরী দেনেওলা !

গোপাল ॥ তোমার কি মানে লাগছে ?

শশধর ॥ আমায় অপমান কর না।

গোপাল ॥ তোমার মাথায় কি আছে আমি বুঝি না। তুমি কি এভাবে চাকরী করতে পারবে ?

শশধর ॥ আমি যথেষ্ট ভাল চাকরী করছি। এখানে এসে তোমায় কে ফড় ফড় করতে বলেছে ?

গোপাল ॥ আমি এখানে আসি—তা কি তুমি চাও না ?

[খেলা চলতে থাকে।]

শশধর ॥ আমি বুঝতে পারি না সিনেমায় কি আছে ! কি হবে ওর সিনেমা করে ?

গোপাল ॥ করতে চায় করতে দাও।

শশধর ॥ আর কতদিন বসে থাকবে বলতে পার ? আমার বয়েস হচ্ছে, আয় কমে যাচ্ছে—আজ আমি ওর জন্যে সর্বস্বান্ত হয়েছি। আমার সমস্ত জমান টাকা শেষ। আমি চোখ বুঁজলে ও খাবে কি ?

গোপাল ॥ ঠিক খাবে। কেউ উপোস করে থাকে না। ওর কথা ভুলে যাও।

শশধর ॥ তাহলে আমি কার কথা মনে রাখব ?

গোপাল ॥ তোমার ছেলে এখন যথেষ্ট বড় হয়েছে। ওকে ওর পথে ছেড়ে দাও। আথ দুধ নষ্ট হয়ে গেলে কেউ যত্ন করে তুলে রাখে না।

শশধর ॥ তোমার পক্ষে কথাটা বলা খুবই সহজ।

গোপাল ॥ না। মোটেই সহজ নয়। তবু আমায় বলতে হল।

[খেলা আবার চলতে থাকে।]

শশধর ।। রান্নাঘরে কি রকম একটা চিমনী লাগিয়েছি, দেখেছ ? ঘরে আর ধোঁয়া আসে না।

গোপাল ।। দেখেছি। কি করে লাগালে ?

শশধর ।। কেন ? একটা মাপমত চিমনী তৈরী করে লাগিয়ে নিয়ে ছাদের ফাঁকটা কিছু সিমেন্ট বালি দিয়ে বন্ধ করে দেবে।

গোপাল ।। আমি কি করে চিমনী লাগাব ?

শশধর ।। তবে আর এত বকাচ্ছ কেন ?

গোপাল ।। তুমি আবার রেগে যাচ্ছ ?

শশধর ।। এই সামান্য কাজটা যে করতে পারে না—সে একটা অপদার্থ। তুমি একটা বাজে লোক।

গোপাল ।। ভদ্রতাজ্ঞান কি তোমার লোপ পেয়ে গেছে ?

শশধর ।। দাদা, আজকাল আমি ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পরি।

[নটবরকে ঢুকতে দেখা যায়। হাতে একটা ফোলিও ব্যাগ। লাঠি। নীল সবুজ আব্ছা আলো এসে পড়ে।

গোপাল ।। তাহ'লে তুমি শুয়ে পড়। খেলা বন্ধ থাক। আচ্ছা, তুমি কি আমায় দাদা বলে ডাকলে ?

[নটবর ঘড়ির দিকে তাকায়]

শশধর ।। অদ্ভুত। তুমিও আমাকে আমার দাদার কথা মনে করিয়ে দিলে।

নটবর ।। আমার হাতে খুব কম সময় আছে, শশধর।

গোপাল ।। তোমার দাদার খবর কি ? বহুদিন কোন খবর শুনিনি।

শশধর ।। তার মানে ? আমি কি তোমায় বলিনি ?

গোপাল ।। কি ?

শশধর ।। কয়েক হপ্তা আগে আসাম থেকে বৌদির চিঠি পাই, তাতে জানতে পেলাম দাদা মারা গেছে।

গোপাল ।। তাই নাকি ?

নটবর ।। এই তাহ'লে তোমার নিজের বাড়ী ?

গোপাল ।। তাহ'লে দাদার সম্পত্তির কিছু তোমার হাতে আসছে ?

শশধর ।। না। তার নিজেরই সাত সাতটা ছেলে।

নটবর ॥ আমার ট্রেন ধরার তাড়া আছে, শশধর। অনেক কাজকর্ম জমে আছে।

শশধর ॥ নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমি যদি তখন দাদার সঙ্গে আসামে যেতাম আমার অবস্থা আজ অন্যরকম হত।

গোপাল ॥ তা' হত। ম্যালেরিয়া আর কালাজ্বরে এতদিনে টেঁসে যেতে।

শশধর ॥ তুমি কি বলছ?

নটবর ॥ আসামে তোমার বিরাট সুযোগ ছিল, শশধর। কেন যে তুমি গেলে না।

শশধর ॥ নিশ্চয়, বিরাট।

গোপাল ॥ কি?

শশধর ॥ ওই একমাত্র লোক আমি দেখেছিলাম যে উত্তরটা জানত।

গোপাল ॥ সে কে?

নটবর ॥ তোমরা সবাই কেমন আছ?

শশধর ॥ ভাল, খুব ভাল।

[হাতের কয়েকখানা তাস ফেলে দেয়।]

গোপাল ॥ বাঃ। বেশ মিলিয়েছ তো!

নটবর ॥ মা কি তোমার সঙ্গেই আছেন?

শশধর ॥ না অনেকদিন হল মারা গেছে।

গোপাল ॥ কে?

নটবর ॥ তাহলে মা'র সঙ্গে আমার দেখা হল না, বেচারী মা।

শশধর। কি?

নটবর ॥ আমার আশা ছিল মা'কে দেখতে পাব।

গোপাল ॥ কে মারা গেছে?

নটবর ॥ বাবার কোন খবর পেয়েছ?

শশধর ॥ তার মানে—কে মারা গেছে?

গোপাল ॥ কিসের কথা বলছ, তুমি?

নটবর ॥ সাড়ে আটটা বেজে গেছে, শশধর।

[গোপাল হাত ফেলে দেয়]

শশধর ॥ (সমস্ত কেন গোলমাল হয়ে যায়) কি করে হল? আমার জিৎ।

গোপাল ॥ বাঃ ! টেক্কা আমার ।

শশধর ॥ খেলতে না জেনে খেলতে আস কেন ? তার ওপর আবার বাজে কথা ।

গোপাল ॥ কি যা তা বলছ ? ওটা আমার টেক্কা ।

শশধর ॥ হতেই পারে না । ওটা আমার ।

নটবর ॥ মা কবে মারা গেছেন ?

শশধর ॥ বহুদিন হল । তুমি কোনদিনই তাস খেলতে শিখলে না ।

গোপাল ॥ (তাসগুলো গুছিয়ে প্যাকেটে রাখতে রাখতে) বেশ । এর পরের বার আমি প্যাকেটে পাঁচটা টেক্কা রেখে দেব ।

শশধর ॥ ওসব জোচ্চুরির মধ্যে আমি নেই ।

গোপাল ॥ আজকের ব্যবহারের জন্যে তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত ।

শশধর ॥ বটে !

গোপাল ॥ একশ' বার । [চলে যায়]

শশধর ॥ (ওর পেছন পেছন গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়) জোচ্চর কোথাকার !

[খানিক সময় দাঁড়িয়ে থাকে । আলো নিভে যায় । সঙ্গে সঙ্গে জলতরঙ্গের আওয়াজ শোনা যায় । এবার নটবর ও শশধর দুজনের ওপর নীল সবুজ রংএর আলো । জলতরঙ্গের আওয়াজ শোনা যায় ।]

নটবর ॥ কেমন আছ, শশধর ?

শশধর ॥ দাদা ! আমি কতদিন ধরে তোমার অপেক্ষা করে আছি । তুমি কোথায় ছিলে এতদিন ?

নটবর ॥ সে অনেক কথা । প্রায় একটা রামায়ণ ।

[শেফালী সংসারের কাজ করতে করতে আসে । আঁচল দিয়ে মুখ মুছে.........]

শেফালী ॥ দাদা নাকি ? তাই ত' । [এগিয়ে এসে প্রণাম করে ।]

নটবর ॥ থাক্ থাক্ । কেমন আছ বৌমা ?

শেফালী ॥ আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন ? উনি তো ভেবেই অস্থির—

শশধর ॥ (নটবরের একটা হাত ধরে) দাদা, তুমি কি করে শুরু করলে ?

নটবর ॥ তোমার কি সে সব কথা মনে আছে ?

শশধর ॥ তা বটে । আমি তখন খুবই ছোট । বোধহয় বছর চারেক বয়েস হবে ।

নটবর ॥ তিন বছর এগারো মাস।

শশধর ॥ তোমার মনে আছে, দাদা?

নটবর ॥ আমার অনেকগুলো ব্যবসা, অনেক লেনদেন। আমি কোনকিছু লিখে রাখি না।

শশধর ॥ আমার মনে আছে তুমি আমাকে আর মা'কে একটা মালগাড়ীতে গাদাগাদি করে ঢুকিয়ে দিয়েছিলে; বহু লোক ট্রেনে ছিল—

নটবর ॥ হ্যাঁ, ভূমিকম্পে যাদের সর্বস্ব যায়, তারা ঐভাবে পালায়। আমি তোকে একটিন লজেন্স দিয়েছিলাম।

শশধর ॥ আমার মনে পড়েছে—লাল রং-এর টিন কি একটা ছবি ছিল তুমিও যেন কোথায় যাচ্ছিলে?

নটবর ॥ হ্যাঁ, বাবাকে খুঁজতে ভুটানে।

শশধর ॥ উনি কোথায় এখন?

নটবর ॥ ঐ বয়েসে আমার ভূগোলের জ্ঞানটা খুব ভাল ছিল না। হাঁটা পথে আমায় যেতে হয়েছিল। অনেকদিন হাঁটার পর আমি বুঝতে পারলাম আমি আসামে পৌঁছিয়েছি। কিন্তু তখন আর আমার ফেরা সম্ভব ছিল না! সুতরাং যেতে চাইলাম ভুটান, পৌঁছে গেলাম ডিগবয়।

শেফালী ॥ ডিগবয়!

শশধর ॥ তেলের খনি!

নটবর ॥ হ্যাঁ। লিকুইড গোল্ড।

শশধর ॥ সোনা।

নটবর ॥ ঠিক তাই। আজ আমার কাছে তাল তাল সোনা আছে। কিন্তু আমার যে দেরী হয়ে যাচ্ছে—

শশধর ॥ একটু থাক দাদা। ব্যাটারা! আরে এই ব্যাটারা! দেখে যা কে এসেছে। হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি ব্যাটারা! রাজা এসেছে। তোদের জ্যাঠামশাই। প্রণাম কর।

[ওরা প্রণাম করে]

আমার ছেলেদের কিছু বল দাদা।

নটবর ॥ তবে শোন। আমার বয়েস যখন সতেরো তখন বাবা বাড়ী ছেড়ে চলে যান। ওই বয়েসে আমার ঘাড়ে সংসারের সব ভার এসে পড়ে। তারপর আমার বয়স যখন উনিশ তখন বিহারের ভূমিকম্পে আমাদের

সমস্ত নষ্ট হয়ে যায়। তোমাদের বাবা তখন খুবই ছোট। তোমাদের বাবা আর আমাদের মা'কে তাই বাধ্য হয়ে একটা মালগাড়ীতে তুলে দিই—কলকাতায়, আমাদের মামার বাড়ীতে আসার জন্যে। তারপর আমি বেরিয়ে পড়ি। ভগবানের কৃপায় আজ আমি ধনী।

শশধর ॥ দেখলি, ব্যাটারা চেষ্টা করলে মানুষ সব করতে পারে।

নটবর ॥ আমার ট্রেন ধরার তাড়া আছে, শশধর।

শশধর ॥ আর একটু দাদা। বাবার কথা কিছু বল। আমার ছেলেরা শুনুক। আমার শুধু মনে আছে বাবার লম্বা দাড়ি ছিল। আর কি যেন একটা বাজাতেন। আমি মা'র কোলে বসে শুনতাম।

নটবর ॥ বাঁশি। খুব ভাল বাঁশি বাজাতেন।

শশধর ॥ ঠিক, ঠিক বাঁশি। এবার আমার মনে পড়েছে।

[নতুন সুর শোনা যায়। আনন্দের সুর]

নটবর ॥ বাবা একজন বিরাট লোক ছিলেন। আর ছিলেন খুব খেয়ালী বেপরোয়া প্রকৃতির। আমরা অনেকদিন বাবার সঙ্গে নানা জায়গায় ঘুরেছি। ওর সব চেয়ে ভাল লাগত নৌকায় চেপে নানা জায়গায় বেড়াতে। একবার আমরা নৌকায় করে বারানসী অবধি গিয়েছিলাম। উনি আমাদের খুব ভালবাসতেন। সব কাজ চৌকস করে তুলতে চাইতেন।

শশধর ॥ দাদা—আমিও এদের তাই তৈরী করছি। সব বিষয়ে চৌকস। আর এরাও তাই হয়ে উঠছে।

নটবর ॥ তাই নাকি! (বিবেককে) দেখি তোমার পাঞ্জা কি রকম শক্ত হয়েছে? কই, দাও হাত। কি হে?

শশধর ॥ ধর। উনি নিজে বলছেন।

বিবেক ॥ বেশ। [এগিয়ে এসে হাত ধরে।]

শেফালী ॥ ওগো, একি হচ্ছে? ওঁর লেগে যেতে পারে।

নটবর ॥ শাবাস। আরো জোরে। হ্যাঁ।

শশধর ॥ কি রকম বুঝছ, দাদা?

নব ॥ দাদা, যুযুৎসুটা ঝেড়ে দে।

শেফালী ॥ না—না। ওঁর লেগে যাবে। কি যে কর?

নটবর ॥ ব্যস।

[হঠাৎ হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছাতাটা নেয়। তারপর লাঠির মত করে বিবেকের নাকের কাছাকাছি ধরে। বিবেক হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।]

শেফালী ॥ এই। লেগে যাবে। [বিবেক লাফ দিয়ে সরে যায়।]

নটবর ॥ (এগিয়ে এসে বিবেককে থাব্ড়া মারতে মারতে) লড়াইতে অচেনা লোককে প্রথমেই কাত করবে। নইলে কোনদিনই জঙ্গল কাটতে পারবে না। (সবার দিকে চেয়ে) তোমাদের সঙ্গে সময়টা বেশ ভালই কাটল।

শেফালী ॥ কিছু খেয়ে যাবেন না ?

নটবর ॥ না বৌমা। আজ দেরী হয়ে গেছে। (শশধরকে) তুমি কি কর এখানে ?

শশধর ॥ সেলস্‌ম্যানের কাজ করি।

নটবর ॥ তাই নাকি। আচ্ছা, আজ তাহলে চলি—

শশধর ॥ দাদা, তুমি হয়ত বিশ্বাস করবে না—যদিও এটা কলকাতা তবু এখানেও আমরা শিকার করি।

নটবর ॥ সত্যি।

শশধর ॥ সত্যি। গোড়ায় এখানে অনেক সাপ ছিল, খরগোস ছিল। সেই জন্যেই আমি এই জায়গাটা বেছে নিয়েছিলাম। তাছাড়া ব্যাটা খুব তাড়াতাড়ি গাছে উঠতে পারে। এক মিনিটে একটা নারকেল গাছ থেকে ডাব পেরে আনতে পারে। দেখবে ? যা তো বড় ব্যাটা বড় বাগানের গাছ থেকে চট করে একটা ডাব পেড়ে নিয়ে আয়। আমি ঘড়ি দেখছি।

বিবেক ॥ এক্ষুণি আনছি। চল ছোট।

নব ॥ (দৌড়ে দাদার পেছন পেছন যেতে যেতে) বাপি, আমার ওজন কমে যাচ্ছে।

[গোপালবাবু প্রবেশ করে। একটা শাড়ি লুঙ্গীর মত করে পড়া।]

গোপাল ॥ শশধর। বড় বাগানে নতুন পাহারাদার রেখেছে। ধরলে কিন্তু সহজে ছাড়বে না।

শেফালী ॥ একি হচ্ছে। ছাখ, এবার একটা খুনোখুনি হবে।

[নটবর জোরে হাসতে থাকে]

শশধর ॥ ওরা এর আগে মস্ত এক কাঁদি ডাব এনেছিল। প্রায় টাকা দশেক দাম হবে।

গোপাল ॥ যদি ওদের লোক একবার ধরতে পারে তবে সোজা থানায় পাঠাবে।

শশধর ॥ ওরা ধরতেই পারবে না। ব্যাটারা ভীষণ ডানপিটে।

গোপাল ॥ হ্যাঁ। জেলে এরকম অনেক ডানপিটে দেখতে পাওয়া যায়।

নটবর ॥ (জোরে জোরে হেসে ওঠে) আর আসামের জঙ্গলে! সেখানেও ডানপিটে দরকার। [শশধরও হাসিতে যোগ দেয়।]

শশধর ॥ আরে, আরে তোমার ব্লাউজটা কোথায়?

গোপাল ॥ এটা আমার গিন্নীর শাড়ী।

শশধর ॥ সে তো বুঝতেই পারছি। তা এখানে কেন। বাড়ী গিয়ে সোজা রান্নায় লেগে যাও। মানাবে ভালো। (নটবরকে) ইনি আমার প্রতিবেশী গোপাল সান্যাল, খুব ভাল রান্না করতে পারেন। আর এর ছেলে ভাল গান গায়।

ছোট সুশান্ত ॥ (ছুটে আসে।) বড় বাগানের দরওয়ান বিবেককে তাড়া করেছে।

শশধর ॥ চুপ কর। ও কিছু চুরি করছে না।

শেফালী ॥ (ভয় পেয়ে) কোথায় গেল হতচ্ছাড়া। যে খুনে ছেলে—

[নিজে বেরিয়ে যায়, সুশান্তও সঙ্গে যায়]

শশধর ॥ দাদা, তুমি এ নিয়ে কিছু ভেব না। কি হ'ল তোমার?

নটবর ॥ তোমার ছেলেরা বেশ ডানপিটে হয়েছে। খুব ভাল।

শশধর ॥ ওদের আমি একেবারে ইস্পাত তৈরী করছি—বিশেষ করে বড় ব্যাটা।

গোপাল ॥ একে কি বলে আমি জানি না। সেদিন ওরা অকারণে একটা লোককে পিটিয়ে আধমরা করে দিল। কোর্ট-কাছারী হলে জেলে যেত।

শশধর ॥ কিস্যু হত না। থানার সবাই আমার চেনা। ছাড়িয়ে আনতাম।

গোপাল ॥ বাঃ চমৎকার। এর উত্তর একদিন পাবে। তোমার প্রশ্রয়ে তোমার ছেলে একদিন জেলে যাবে—আর সেদিন এসে আমি উত্তর এর দিয়ে যাব। [চলে যায়]

শশধর ॥ ব্যবসাটা এখন খুব খারাপ যাচ্ছে দাদা। ভীষণ খারাপ। অবশ্য আমি প্রায় ভালই চালিয়ে যাচ্ছি।

নটবর ॥ ভাবছি আবার এদিকে যখন আসব দিন কয়েক থেকে যাব।

শশধর ॥ তুমি কি কয়েকদিন এখানে থাকতে পার না? তোমাকে আমার খুব দরকার দাদা—আমার অবস্থা এখানে ভালই। কিন্তু আমার—আমার ছোট্ট বয়েসে বাবা চলে যান—বাবাকে আমার একরকম মনেই নেই। তবুও মাঝে মাঝে আমার বাবার কাছে যেতে ইচ্ছে করে।

নটবর ॥ এবার সত্যিই আমি ট্রেন পাব না, শশধর।

[মঞ্চের দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে ওরা কথা বলছে।]

শশধর ॥ দাদা, আমার ছেলেরা—তুমি কি আর একটু থাকতে পার না? ওরা বোধহয় আমার জন্যেই গোল্লায় যেতে বসেছে—কিন্তু আমি—

নটবর ॥ তোমার ছেলেরা বেশ ভাল হয়েছে। চটপটে, বাধ্য। ভালই তো।

শশধর ॥ দাদা, ওকথা শুনতে ভালই লাগত। কিন্তু আজকাল আমার প্রায়ই মনে হয় ওরা বোধহয় ঠিক পথে যাচ্ছে না। আচ্ছা, আমি কি করে ওদের ঠিক পথে চালাব—বলতো দাদা?

নটবর ॥ (নিজের প্রতিটি কথায় গুরুত্ব দিয়ে) শশধর, নিঃসম্বল অবস্থায় উনিশ বছর বয়সে আমি আসামের জঙ্গলে ঘুরতে শুরু করি আর মাত্র দু'বছরে আমি কয়েক লক্ষ টাকা করে ফেলি।

[মঞ্চের ডানদিকের অন্ধকারে নটবর আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়।]

শশধর ॥ কয়েক লক্ষ টাকা মাত্র দু' বছরে। আমিও তো ওদের একথা বোঝাতে চাই। চেষ্টায় সব হয়। চোখ থাকলে জঙ্গলে সোনা পাওয়া যায়। আমি তো ওদের ঠিক বলেছিলাম—ঠিকই বলেছিলাম! তবে? তবে?

[শশধর আপনমনে কথা বলে যায়। ভেতর থেকে শেফালী আসে]

শেফালী ॥ হ্যাঁ গো, বাতাসা তো ফেলে রাখলে। যাক্‌গে। এবার শুয়ে পড়।

শশধর ॥ (মাথা তুলে ওপর দিকে দেখে] এখান থেকে আজকাল আর আকাশ দেখা যায় না। বাড়ীগুলো চোখ আটকে দেয়।

শেফালী ॥ শোবে না?

শশধর ॥ আমার সেই সোনা বাঁধান ঘড়িটার কি হল বলতো? দাদা যেটা আমায় দিয়েছিল।

শেফালী ॥ বছর বারো তের আগে ওটাকে বিক্রী করতে হয়। বড় খোকা

কাশ্মীর যাবে বলে জেদ ধরেছিল, তোমার কাছে টাকা ছিল না—তুমি ওটা বিক্রী করে ওকে টাকা দিয়েছিলে।

শশধর ॥ খুব সুন্দর ছিল ঘড়িটা। যাই আমি একটু বেড়িয়ে আসি।

শেফালী ॥ এখন। তবে জামাকাপড় ঠিক মত পরে যাও।

শশধর ॥ (বাঁদিকে এগিয়ে) আমি ঠিক বলেছিলাম। কি একখান্ লোক। এরকম লোকের সঙ্গে কথা বলেও আরাম আছে, ঠিক।

শেফালী ॥ ওগো! এভাবে বের হলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

[শশধর চলে যেতে বড় বিবেক এসে দাঁড়ায় বাইরে থেকে শশধরের গান শোনা যায়—মুকুন্দ একাই পারিত জগতটারে দিতে একটা টান।]

বিবেক ॥ উনি বাইরে কি করছেন ?

শেফালী ॥ চুপ।

বিবেক ॥ কতক্ষণ ধরে এ পাগলামী চলছে ?

শেফালী ॥ চুপ কর! উনি শুনতে পাবেন।

বিবেক ॥ এ কি শুরু করেছেন, আজকাল ?

শেফালী ॥ সকাল হলেই ঠিক হয়ে যাবেন।

বিবেক ॥ আমাদের একটা কিছু করা উচিত।

শেফালী ॥ করতে তুমি অনেক কিছুই পারতে বাবা—কিন্তু এখন আর কিছুই করার নেই—যাও। শুতে যাও।

[বড় নব ঘর থেকে এসে দাঁড়ায়]

নব ॥ আজ যেন দেখছি মাত্রা ছাড়িয়েছে ?

শেফালী ॥ আজকাল রোজই এরকম চলছে। ক'দিনের খবর তোমরা রাখ ?

বিবেক ॥ তুমি তো আমাকে এ ব্যাপার আগে কোনদিন বলনি।

শেফালী ॥ কখন তোমায় বলব ? তোমার বাড়ীতে থাকার কোন ঠিক আছে না বাইরে যাওয়ার সময় কোনদিন জানান দরকার বোধকর—কোথায় যাচ্ছ, ফিরবে কিনা।

বিবেক ॥ কি করব ? আমার কাজের কি কোন বাঁধাধরা আছে ? (থেমে) আমি বাড়ীতে থাকি না বলে কি তোমাদের কথা ভাবি না ? অন্তত তুমি তো জান।

শেফালী ॥ জানি, বাবা। কিন্তু কিছু করার ইচ্ছে শুধু মনে থাকলেই চলে না

বাইরেও দেখাতে হয়। তোদের কখনও ওঁর কাছে থাকতে দেখি না। আর তোদের বাবা সব সময় তোদের কাছে পেতে চান।

বিবেক ॥ আমি থাকতে চাইলেও থাকতে পারি না। বাবা অনেক বদলে গেছে।

শেফালী ॥ তার জন্যেও তুই দায়ী!

বিবেক ॥ তার মানে?

শেফালী ॥ মানে—তুই নিজেকে জিজ্ঞেস করে দেখ।

বিবেক ॥ কেন? আমি কি করেছি?

শেফালী ॥ বুঝতে পারিস না? তোকে আজ কোথায় দেখার স্বপ্ন ছিল আর আজ তুই কোথায় দাঁড়িয়ে!

বিবেক ॥ স্বপ্ন শুধু দেখলেই চলে না মা, স্বপ্নের দুনিয়া গড়ে তোলার ক্ষমতা থাকা চাই। তাই সবার স্বপ্ন সত্যি হয় না।

শেফালী ॥ কি বলতে চাস তুই? সোজা করে বল। (বিবেক কোন উত্তর দেয় না।) কি উনি করেন নি তোদের জন্যে? তোদের কোন সাধ উনি অপূর্ণ রেখেছেন? উনি শুধু চেয়েছিলেন—ছেলেরা লেখাপড়া শিখবে, প্রতিষ্ঠিত হবে, ভাল হবে। এটা কি একটা অসম্ভব স্বপ্ন ছিল? পাশের বাড়ীর দিকে দ্যাখ। আজ কোথায় সুশান্ত আর কোথায় তোরা।

বিবেক ॥ ওসব পুরোন কথা বাদ দাও। এ ব্যাপারে আমার কোন দায়িত্ব নেই।

শেফালী ॥ দায়িত্ব নেই?

বিবেক ॥ না—নেই?

শেফালী ॥ বাঃ! চমৎকার! এমন না হ'লে ছেলে?

বিবেক ॥ কি বলব মা তোমাকে? আমাদের সবাইকে তুমি ভালবাস অথচ কারুর আসল চেহারা তুমি জান না।

শেফালী ॥ আমি সব জানি।

বিবেক ॥ কতটুকু জান তুমি? যাকগে—বাদ দাও।

শেফালী ॥ বাদ দেওয়ার কিছু নেই—অন্ততঃ এইটুকু জানি তুমি যদি ওঁর কথা শুনে পড়াশুনা করতে কিম্বা ওঁর পছন্দমত সেলসের কাজ করতে তবে আজ তোমার এ দশা হত না। সব সময় তুমি ওঁর অপছন্দের কাজ কর—বাপের ওপর কেন তোমার এই অবিশ্বাস?

বিবেক ॥ অবিশ্বাস হবে কেন ?

শেফালী ॥ তাহলে ওর কোন কথা শুনিস না কেন ? কেন প্রতি কথায় ওর মুখোমুখি শুরু করিস ?

বিবেক ॥ আমি ভালভাবে কথা বলতে চাই মা—কিন্তু জানিনা কেন তা হয় না। আমি প্রত্যেকবার চেষ্টা করেছি—কিন্তু পারিনি।

শেফালী ॥ তুই কি ফিল্মেই থাকবি, ঠিক করেছিস ?

বিবেক ॥ কোন কিছুই আমি ঠিক করিনি মা। আর কিছু ঠিক করার মত মনের অবস্থা আমার নয়।

শেফালী ॥ আর কতদিন এভাবে চলতে পারে ? আচ্ছা, খোকা, তুই কি ভাবিস তুই আগের মত ছোট আছিস আর তোর বাপের বয়স বাড়ছে না ?

বিবেক ॥ আমি সব বুঝি মা। কিন্তু—কিন্তু আমি সহ্য করতে পারি না। মা ! আমি তোমায় ঠিক বোঝাতে পারব না। কিছুতেই পারব না।

শেফালী ॥ সহ্য করতে পারবি না মানে ? তাহলে তুই কি ধরনের সন্তান ?

বিবেক ॥ মা—তোমার চুল এত পেকে গেছে ?

শেফালী ॥ চুল কি আর আজ পেকেছে বাবা। বহুদিন হল পেকেছে।

বিবেক ॥ কই আমি তো এর আগে দেখিনি। (মাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে) মা তুমি চুলে কলপ লাগাও। আমার বুড়ি মা দেখতে ভাল লাগে না।

শেফালী ॥ তোর ওপর রাগ করেও রাগ রাখতে পারি না। মনে হয় তুই সেই ছোটই আছিস। ওরে বাপ-মা কারুর চিরকাল থাকে না। আজ হঠাৎ তোর চোখে পড়ল আমার চুল পেকেছে, ঠিক এমনি হঠাৎ তোর একদিন চোখে পড়বে আমি মরে পড়ে আছি। সংসারের দিকে মন দে খোকা, তোর যথেষ্ট বয়েস হয়েছে।

বিবেক ॥ তোমার আর এমন কি বয়েস হয়েছে মা—ষাটই পার হয়নি।

শেফালী ॥ তোমাদের বাবা কিন্তু ষাট পার হয়েছেন। খোকা, আজ যদি তোর বাপের ওপর কোন টান না থাকে, তবে আমার ওপরও কোন টান থাকতে পারে না।

বিবেক ॥ আমার টান নেই ?

শেফালী ॥ না। নেই। শুধু আমার জন্যে তুই বাড়ী ফিরে আসিস। ওঁর

ওপর তোর কোন টান নেই। যদিও জানি ওঁর সঙ্গে মানিয়ে চলা আজকাল খুবই শক্ত, তবু এ বাড়ীতে থাকতে গেলে—

শশধর ॥ (নেপথে) আরে, আরে, এই ব্যাটা।

বিবেক ॥ (বিবেক তেড়ে বাইরে যেতে চায়। শেফালী বাধা দেয়।) রাত দুপুরে এ কি পাগলামী শুরু করেছে ?

শেফালী ॥ তুমি এখন ওঁর কাছে যাবে না।

বিবেক ॥ সব সময় বাবার দোষ ঢাকার চেষ্টা কর না। তোমার সঙ্গে কি ব্যবহার করেন ? তুমি কি মনে কর আমি কিছু বুঝি না। জীবনে কোনদিন—তোমার কোন মর্যাদা ওঁর কাছে নেই।

নব ॥ বাজে কথা। বাপি চিরকাল মা'কে—

বিবেক ॥ তুই এসব ব্যাপারের কতটুকু জানিস ?

নব ॥ তাই বলে বাপিকে পাগল বলবি ?

বিবেক ॥ না। প্রধানমন্ত্রী বলব। গোপালকাকুকে কোনদিন এরকম করতে দেখেছিস ? দুনিয়া শুদ্ধ লোকের কাছে ঘরের কেচ্ছা বের করছে।

নব ॥ বাপিব চেয়ে গোপালকাকুর অনেক ভাল অবস্থা। ওঁর কোন দুঃশ্চিন্তা নেই।

বিবেক ॥ শশধর সামন্তের চেয়ে খারাপ অবস্থা অনেকের হয়—তবু তারা এরকম করে না।

শেফালী ॥ তাহলে তাদের কাছে গিয়ে থাক। আমি জানি তোমাদের বাবা একটা বিরাট লোক নন। উনি অগাধ টাকাও করতে পারেন নি। কিন্তু একজন সাধারণ লোকও একজন অসাধারণ লোকের মত ক্লান্ত হয়। আজ একটানা ছ'ত্রিশ বছর ধরে প্রতিদিন প্রচণ্ডভাবে খেটে নিজের ভালমন্দের দিকে না তাকিয়ে উনি যে কোম্পানীকে বড করলেন, বুড়ো হয়েছেন এই অপরাধে তারা সামনের মাস থেকে মাইনে ছাড়া শুধু কমিশনে ওকে রাখতে চায়। কারণ ওকে মাইনে দেওয়া নাকি ওদের কাছে লোকসান।

নব ॥ আমি তো এটা জানি না মা।

শেফালী ॥ কি করে জানবে বল ? সংসারের কোন খবরটা রাখতে চাও ? নিজে যা রোজগার কর নিজের খেয়াল খুসিতে উড়িয়ে দাও।

নব ॥ কেন ? আমি তো তোমায় টাকা দিয়েছি—

শেফালী ॥ দেবে না কেন, নিশ্চয় দিয়েছ। চাকরী পাওয়ার প্রথম বছর পুজোর সময় দিলে পঞ্চাশ টাকা আর গত বছর নিজের শখে দু'শ টাকা দিয়ে একটা রেকর্ড প্লেয়ার কিনেছ। আর তোমার চাকুরে জীবনে ওই লোকটাকে শুধুমাত্র তোমার জন্যে কত খরচ করতে হয়েছে, তার হিসেব রেখেছ ?

বিবেক ॥ সব ক'টা অকৃতজ্ঞ, স্বার্থপর।

শেফালী ॥ ওরা ওঁর কি নিজের ছেলেদের চেয়েও খারাপ ? যৌবনে নিজের শক্তিতে উনি সব কষ্ট সহ্য করেছেন তখন লোকে ওঁকে শ্রদ্ধা সম্মান করেছে। তোমাদের সব খেয়াল উনি মিটিয়েছেন। কিন্তু আজ বার্দ্ধক্যের ভারে উনি শক্তিহীন। তাই উনি সকলের কাছে উপহাসের পাত্র। আজ সব হারিয়ে বসে আছেন তাই অনিশ্চিত ভবিষ্যতও ওঁর রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। গাড়ীটা থাকলে এসময় উনি এতটা ভেঙ্গে পড়তেন না। কিন্তু তোমার জন্যে (বিবেককে)—তোমার কুকীর্তির খেসারৎ দেওয়ার জন্যে গাড়ীটা বেচে দিতে হল। জেল থেকে ছাড়িয়ে এনে উনি তোমায় কিছু বলেন নি কিন্তু ওঁর কান্নার শব্দে মাঝরাতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল—বল্লেন, "বুড়ো বয়সের লাঠিগাছটা দিয়ে দিতে হল কলঙ্কের ভয়ে, আর কি আমি খাড়া হতে পারব !" আজ সম্বল বলতে আছে শুধু অতীতের স্মৃতি। তাই যতক্ষণ একা থাকেন ওই স্মৃতিকে আঁকড়ে থাকেন—সেই জন্যে তোমরা ওঁকে পাগল বল। কিন্তু কেন উনি বলবেন না ? গোপালবাবুর কাছ থেকে টাকা ধার করে এনে আমায় কমিশন পেয়েছি বলে নিশ্চিন্ত করেন। সারাজীবন যাদের জন্যে প্রাণপাত করলেন তাদের কাছ থেকে কোন পুরস্কার পেলেন ? যে ছেলেদের উনি প্রাণের চেয়েও ভালবাসতেন—মৃত্যুর দিকে পা বাড়িয়ে উনি দেখতে পেলেন তাদের মধ্যে একজন হয়েছে কারখানার এক মিস্ত্রী—যার নেশা হ'ল মেয়েদের সর্বনাশ করা—

নব ॥ মা !

শেফালী ॥ তাছাড়া কি ? তুমি কি মনে কর ঘরে বসে থাকি বলে কোন খবর রাখি না ? (বিবেককে) আর তুমি—বাপের ওপর তোমার টান আজ কোথায় গেল ? যে তুমি তাঁকে দেখতে না পেলে অস্থির হতে, আজ সেই তুমি সব সময় তাঁকে এড়িয়ে চল, তাঁকে আঘাত দিয়ে

কাজ কর। কিন্তু কেন? কেন? কেন? কি অপরাধ উনি করেছেন তোমাদের কাছে?

বিবেক॥ ঠিক আছে মা। আমি ওঁর পছন্দমত কাজই করব। যদি—যদি তোমার তাই ইচ্ছে হয়। আমি বোধহয় নিজেকে বদলাতে পারব।

শেফালী॥ আর তুমি নিজেকে বদলাতে পারবে না। অনেক সুযোগ পেয়েছিলে। তুমি এখানে থাকা মানেই অশান্তি ডেকে আনা।

বিবেক॥ এক হাতে তালি বাজে না মা। আমি পরীক্ষায় ফেল করার পর যখন এ বাড়ীতে ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হল—তোমার মনে আছে সামান্য কারণে বাবা আমায় বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছিল।

শেফালী॥ হ্যাঁ। ও ব্যাপারটা আমি তখনও বুঝতে পারিনি—তারপরেও না।

বিবেক॥ কারণ বাবা চায়নি আর আমি এ বাড়ীতে থাকি। ওঁর আসল চেহারা আমি জেনে গিয়েছিলাম।

শেফালী॥ কি বলছিস তুই—আসল চেহারা! তার মানে?

বিবেক॥ এর বেশি আর কিছু জানতে চেও না মা। সইতে পারবে না। ও ব্যাপারটা আমাদের দুজনের মধ্যেই থাক। এ বাড়ীতে শান্তি ফিরে আসুক—এটা আমিও চাই মা। চাই তোমার জন্যে। এবার থেকে আমি যা পাব তার অর্দ্ধেক তোমাকে দিয়ে দেব—এখন তোমার কপাল। ওঁকে বল আমি সেলসম্যানের কাজ করতে রাজী আছি। আশাকরি উনি খুসি হবেন। [যাওয়ার উদ্যোগ করে।]

শেফালী॥ গোড়া কেটে আগায় জল দিলে গাছ বাঁচে না খোকা।

বিবেক॥ (হিংস্রভাবে বিকট স্বরে) আমার এ ধরনের জীবন অত্যন্ত নোংরা লাগে। তবু আমি তাই মেনে নেব। আর কি চাও তোমরা?

শেফালী॥ উনি মরবার চেষ্টা করছেন, খোকা।

[নব চমকে ফিরে তাকায়, স্তম্ভিত হয়ে যায়।]

বিবেক॥ তার মানে?

শেফালী॥ উনি আত্মহত্যা করতে চাইছেন।

বিবেক॥ কি করে? [ভীষণ ভয় পায়।]

শেফালী॥ (ভগ্নস্বরে) আমি মৃত্যুকে সঙ্গে নিয়ে চলছি, খোকা।

বিবেক॥ কি বলছ তুমি?

শেফালী ॥ ঠিকই বলছি। ওঁর ট্রেন অ্যাকিসডেণ্টের আসল কারণটা আমি তোকে বলিনি—উনি ইচ্ছে করে—

বিবেক ॥ তার মানে ?

শেফালী ॥ পাটনা হাসপাতালে আমি পুলিশের রিপোর্টে জানতে পারি যে একটি মেয়ে পুলিসকে বলে—আর মেয়েটি……

বিবেক ॥ (খুব তাড়াতাড়ি একই সঙ্গে) কোন মেয়ে ?

শেফালী ॥ কি ?

বিবেক ॥ কিছু না। তুমি বল।

শেফালী ॥ তুই কি যেন বল্লি ?

বিবেক ॥ কিছু না। আমি বল্লাম কোন মেয়ে ?

নব ॥ মেয়েটি কি বল্ল ?

শেফালী ॥ মেয়েটি পুলিশকে জানায় যে ট্রেনটা পাটনার আগের স্টেশন ছাড়ার পরই উনি দরজা খুলে দাঁড়ান। তারপর ভেতরটা ভাল করে দেখে নিয়ে লাফ দেন। মেয়েটি জেগে ছিল উনি খেয়াল করেন নি। [থেমে যায়।]

বিবেক ॥ তারপর ?

শেফালী ॥ গতমাসে ··...(খুব কষ্ট হয়) ওরে আজ তোদের আমি কেমন করে সব কথা বলি ? উনি আজ তোদের কাছে একটা অপদার্থ বুড়ো বাপ—কিন্তু ওঁর মধ্যে অনেক ভালো গুণ আছে, যা খুব কম লোকের থাকে। [আবেগে গলা বন্ধ হয়ে আসে, আঁচল দিয়ে চোথ মুছে] ফিউজ তার খুঁজতে আমি ওঁর ড্রয়ারটা খুলেছিলাম। আর ওই ড্রয়ারের মধ্যে-ই আমি দেখতে পেলাম—ওটার ওপরই আমার প্রথম হাত পড়ল—একটা সরু লম্বা খুব মজবুত নাইলনের দড়ি।

নব ॥ নাইলনের দড়ি তো কি ?

শেফালী ॥ তার একদিকে সুন্দর করে একটা ফাঁস লাগান। আমি দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম, ভয়ে আমি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম।

নব ॥ এ সব আবার কি ?

বিবেক ॥ ওটা সরিয়ে নিয়েছ তো ?

শেফালী ॥ আমি—আমি পারলাম না। আমার কি রকম যেন লজ্জা হল। ওকে আমি কিছু জিজ্ঞেস করতেও পারলাম না। প্রত্যেকদিন উনি

বেরিয়ে যাওয়ার পরই দড়িটা বের করে নিই কিন্তু উনি বাড়ী ফেরার আগেই আবার রেখে দিই। আমি জানতে পেরেছি জানলে উনি নিজের কাছে ছোট হয়ে যাবেন। আমি সারাদিন পাগলের মত ভাবি ওটা দিয়ে কি করব ? ওটা বারবার দেখি আর আমার যেন মনে হয় আমি একটা জীবন্ত মৃত্যুকে আগলে নিয়ে বেড়াচ্ছি। সারারাত আমার চোখে ঘুম থাকে না-সমানে ওঁকে আগলে রাখি। এটা তোদের কাছে খুব বোকা বোকা সেকেলে কথা শোনাবে—কিন্তু জেনে রাখ ওঁর জীবন উনি তোদের জন্যে উৎসর্গ করেছেন আর বড় হয়ে সময় বুঝে তোরা সরে দাঁড়ালি। (ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে) খোকা, আমি তোর গা ছুঁয়ে বলতে পারি, একমাত্র-তুই ওঁকে বাঁচাতে পারিস।

নব ॥ (নিজের মনে) কিন্তু বাপি এরকম করছে কেন ?

বিবেক ॥ (এগিয়ে এসে মাকে ধরে) তাই হবে মা। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি আবার নতুন করে শুরু করব। আমি তোমাদের কোনদিন শান্তি দিতে পারিনি—এবার আমি পুরোন সব কথা ভুলে যাব। তুমি আমার ওপর ভরসা রাখ। (হাটু গেড়ে মা'র সামনে বসে পড়ে, শেফালীর একটা হাত নিয়ে নিজের গালে রাখে) কিন্তু মা ! চাকরী আমি ঠিকমত করতে পারি না। চাকরী করতে আমার ভীষণ কষ্ট হয়। কেমন যেন মনে হয় আমি যন্ত্র হয়ে গেছি। তবু—তবু আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব। আমি ঠিক দাঁড়াব। [শেফালী বিবেক-কে টেনে তোলে, আনন্দে চোখ জলে ভরে যায়।]

নব ॥ এবার তুই ঠিক পারবি দাদা। শুধু ওপরওয়ালাদের চটাস না।

বিবেক ॥ কাউকে তেল দিয়ে আমি চলতে পারব না। [ওপরে ওঠে।]

নব ॥ তেল দেওয়ার কথা হচ্ছে না। যেমন তুই জেসপে একবার করলি। যেই তোর বস বল্ল তোর হাতের কাজ ভাল অমনি তুই কাজের সময় গান জুড়ে দিলি।

বিবেক ॥ আমার গান গাওয়ার ইচ্ছে হলে আমি গাইব না ?

নব ॥ কাজের সময় গান গাওয়া কোন অফিসেই পছন্দ করে না। চাকরী মাত্রেই একটা নিয়ম থাকে।

বিবেক ॥ চুলোয় যাক, তোর চাকরী—

শেফালী ॥ বালাই যাট, অমন কথা বলিস না।

বিবেক ॥ বাবা তো ওদের জন্যে সারা জীবন খেটে কি পেলেন ?—আমিও সারাজীবন ওদের জন্যে খাটব—আমার পরিশ্রমে ওরা বড় হবে কিন্তু আমি কিছু পাব না। এর চেয়ে কুলীর কাজ অনেক ভাল। তারও স্বাধীনতা আছে, ইচ্ছেমত কাজের সময় সে গান গাইতে পারে, আর তাতে কেউ কিছু মনে করে না—বুঝলি।

[শশধর বিবেকের কথার মাঝে প্রবেশ করে। ওপরে ওঠে কথার শেষে।]

শশধর ॥ তোমার চোদ্দপুরুষে কেউ কোনদিন কুলী ছিল না—বুঝলে। [থামে। দুজন পরস্পরকে দেখে] তুমি আর কোনদিন বড় হলে না। সুশান্ত কাজের সময় গান গায় না।

বেবেক ॥ (হালকা করার চেষ্টা করে) কিন্তু তুমি তো কাজের সময় গান কর।

শশধর ॥ আমি কাজের সময় গান করি না। কোন ব্যবসাদার আমায় পাগল ভাবে না।

বিবেক ॥ আমি কথাটা তা' বলতে চাইনি। তুমি সমস্ত ব্যাপারটা ভুল বুঝেছ।

শশধর ॥ ফের মিথ্যে কথা ? দালালীর কাজটা খারাপ নয়। তাছাড়া সেলসম্যানরা দালাল নয়। তোমার যা ইচ্ছে হতে পার—তবে এ বাড়ীতে আর থেকো না।

শেফালী ॥ ওগো, খোকা তা বলতে চায়নি—

শশধর ॥ আমি নিজের কানে ওকে বলতে শুনেছি।

নব ॥ তুমি শুনেছ ঠিক। তবে দাদা বলছিল যে—

শশধর ॥ আমাকে বোকা বানানর চেষ্টা কর 'না। তোমাদের চেয়ে আমি কিছু কম বুঝি না। তুমি সব সময় আমায় নিয়ে ঠাট্টা কর—যাও বিহারের যে কোন জায়গায় গিয়ে আমার নাম কর—বলবে, দারুণ কাজের।

বিবেক ॥ তাই বলবে।

শশধর ॥ গুরুদেব !

বিবেক ॥ নিশ্চয়।

শশধর ॥ তুমি সব সময় আমায় অপমান করার চেষ্টা কর কেন ?

বিবেক ॥ আমি কিন্তু একটা কথাও বলিনি। (শেফালীকে) আমি কিছু বলেছি মা?

শেফালী ॥ ও কিন্তু সত্যিই কিছু বলেনি।

শশধর ॥ বেশ বলেনি। (যেতে থাকে।)

শেফালী ॥ ওগো, খোকা ঠিক করেছে—

শশধর ॥ আমার আর শোনার কোন ইচ্ছে নেই, আমি সব বুঝে নিয়েছি।

বিবেক ॥ আমি কাল কাজের চেষ্টায় বের হব।

নব ॥ বাপি, দাদা গণেশের সঙ্গে কাল দেখা করতে যাবে।

শশধর ॥ গণেশ? মানে গণেশপ্রসাদ? কেন?

বিবেক ॥ ও আমাকে অনেকদিন ওর ওখানে যেতে বলেছে। আমি ভাবছি সেলস্ লাইনেই যাব—তাই ওকে দিয়েই শুরু করব।

শেফালী ॥ এটা খুব ভাল হবে, তাই না?

শশধর ॥ এর মধ্যে ভালোর কি আছে? অন্ততঃ পঞ্চাশজন লোক আমার জানা আছে যারা ওকে আজকেই চাকরী দিতে পারে। [বিবেককে] স্পোর্টস গুডস্?

বিবেক ॥ ওতো এই ব্যবসাই করে। আর এ লাইনটা আমি ভাল জানি—

শশধর ॥ কোন লাইনটা তুমি জান? কি করে খেলতে হয় তুমি শুধু তাই জান। কত দেবে?

বিবেক ॥ আমি জানিনা, ওর সঙ্গে আমার অনেকদিন দেখা হয়নি। আমি কাল—

শশধর ॥ তবে তুমি কি বিষয়ে বলছ?

বিবেক ॥ (রেগে গিয়ে) আমি শুধু বলেছি আমি ওর সঙ্গে দেখা করব। ব্যস।

শশধর ॥ কিছু ঠিক না করে তবে ওখানে যাওয়ার কথা বলছ কেন?

বিবেক ॥ আমি আর পারছি না—উফ্ ভগবান!

শশধর। এ বাড়ীতে ভগবানের নাম কর না।

বিবেক ॥ এ আইনটা হল কবে থেকে?

নব ॥ দাদা!

শশধর ॥ এ বাড়ীতে আমার সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলবে। মনে রেখ এটা আমার বাড়ী।

নব ॥ চুপ কর। শোন আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে—দারুণ প্ল্যান। গণেশ আজকাল স্পোর্টসগুড্‌সের ফলাও কারবার শুরু করেছে। নিশ্চয় ও বিক্রী বাড়াবার কথা ভাবছে। এককালে গণেশ তোর খুব ভক্ত ছিল। তুই ওর কাছ থেকে ধারে কিছু টাকার মাল নিয়ে আয়। তারপর কলকাতার প্রায় সব ক্লাব তোর চেনা। তুই যদি তাদের সবাইকে সাপ্লাই দেওয়ার ব্যবস্থা করিস তবে অনেক লাভ করতে পারবি। তোর কথা সবাই শুনবে।

শশধর ॥ বাঃ। বেশ বলেছিস।

শেফালী ॥ সত্যি খুব ভাল।

বিবেক ॥ এ ভাবে আমি হয়ত কিছু করতে পারব।

নব ॥ আর কাজটাও তোর একঘেয়ে হবে না। খেলাধূলার কথা হবে—বিক্রীও হবে।

বিবেক ॥ ভালই পাব মনে হচ্ছে।

শশধর ॥ নিশ্চয়। অনেক টাকা।

নব ॥ তোর এ কাজ পছন্দমত হবে। আবার আমরা আগের মত হাসি আর আনন্দে মেতে থাকব। সেই পুরোন দিনগুলো আবার আমাদের ফিরে আসবে।

শশধর ॥ সবাই চমকে যাবে। সকলকে একেবারে অবাক করে দেব।

বিবেক ॥ আমি কালই গণেশের সঙ্গে দেখা করব। সত্যি যদি এভাবে কাজ করা যায়—

শেফালী ॥ সুদিন আবার ফিরে আসবে—

শশধর ॥ তুমি থাম। কিন্তু তোমার ওই আওয়ারা পোষাক পরে যাবে না।

বিবেক ॥ না, আমি—

শশধর ॥ ভদ্র পোষাক পরে যাবে, কম কথা বলবে আর ঠাট্টা ইয়ার্কির মধ্যে যাবে না।

বিবেক ॥ ও আমায় পছন্দ করত। খুবই পছন্দ করত।

শেফালী ॥ গণেশ তোকে ভালবাসতো।

শশধর ॥ থাম্‌বে তুমি! (বিবেককে) বেশ গম্ভীর হয়ে থাকবে। তুমি ওখানে ছেলেখেলা করতে যাচ্ছ না। শান্ত ভদ্র হয়ে যুক্তি সঙ্গত কথা

বলবে। ছেলেমানুষি সবাই পছন্দ করে কিন্তু ছেলেমানুষকে কেউ টাকা দেয় না।

নর॥ আমিও তোকে কিছু টাকা দিতে পারব।

শশধর॥ তুমি বড় হবে, আমাদের কষ্টের শেষ হবে। মনে রেখ বড় করে শুরু করলে বড় হওয়া যায়। কত চাইবে তুমি। পনেরো হাজার, নাকি, কি, কত?

বিবেক॥ আমি—আমি ওর কাছে—দেখি—

শশধর॥ আমতা আমতা কর না। যারা হাজার হাজার টাকার ব্যবসা করে তারা ওভাবে কথা বলে না।

বিবেক॥ তবে—দশ হাজার চাইব।

শশধর॥ ওই জন্যেই তোমার কিছু হল না। সব সময় তুমি নীচ থেকে ভাব। একমুখ হাসি নিয়ে যাবে—তোমায় যেন চিন্তিত মনে না হয়। গোড়াতে দু'একটা ভাল গল্প বলে জমিয়ে নেবে। মনে রেখ কি বলছ সেটা বড় কথা নয় কি ভাবে বলছ সেটাই আসল—জানবে যার ব্যক্তিত্ব বেশি সেই জেতে।

শেফালী॥ খোকা, একটা বিরাট লোক হবে এটা গণেশও চাইত—

শশধর॥ তুমি কি আমায় কথা বলতে দেবে?

বিবেক॥ মা'কে সব সময় খিঁচিয়ে কথা বলবে না।

শশধর॥ আমি দরকারী কথা বলছিলাম, কিনা?

বিবেক॥ মা'র সঙ্গে তোমার এই ধরনের কথা আমার ভাল লাগে না, ব্যস।

শশধর॥ তুমি আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে কথা বলছ—

শেফালী॥ চুপ কর!

শশধর॥ তোমার আদরে এরা উচ্ছন্নে গেছে। আবার তুমি—

বিবেক॥ (চীৎকার করে ওঠে) তুমি থামবে কিনা!

শশধর॥ (হঠাৎ গলার স্বর নামিয়ে) গণেশকে আমার কথা বল—হয়ত ওর আমার কথা মনে আছে। [সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে থাকে।]

শেফালী॥ (নিচু গলায়) তুই কি আমায় এই কথা দিলি। দেখলি তোর সম্বন্ধে একটু আশা পাওয়া মাত্র কত বদলে গেলেন। যা, ওঁকে গিয়ে দুটো ভাল কথা বলে আয়। এভাবে ছেড়ে দিস না। (নীচে নামতে থাকে।)

নব ॥ তাই চল দাদা।

শেফালী ॥ (দাঁড়িয়ে যায়) লক্ষ্মীছেলে আমার। চল। দেখলি তো কত অল্পেই ওঁকে খুসি করা যায়। (চলে যায়)

নব ॥ কি দিয়ে যে ভগবান তোমায় তৈরী করেছিলেন মা। আমাদের জন্যে তুমি সব সইতে পার।

বিবেক ॥ বাবাকে আর মাইনে দেবে না। শুধু কমিশনে কাজ করতে হবে।

নব ॥ কপালে থাকলে তাই হবে।

বিবেক ॥ কিছু টাকা ধার দিবি? একটা টাই কিনব।

নব ॥ নিশ্চয় দেব। আর কাল তোকে আমার একটা ভাল জামা দেব।

বিবেক ॥ মা'র চুল সাদা হয়ে যাচ্ছে। মা' কিরকম বুড়িয়ে যাচ্ছে। নাঃ। কাল গণেশকে কায়দা করে ধরে ওর কাছ থেকে কিছু আদায় করতেই হবে।

নব ॥ তবে চল। বাপিকে বলি যে তুই কাল যাবি ঠিক করেছিস, খুব খুসি হবে।

বিবেক ॥ পনেরো হাজার টাকার মাল আমায় আদায় করতেই হবে।

নব ॥ তুই এবার ঠিক পারবি দাদা! ছাখ, কত মনের জোর দিয়ে বলতে পারছিস। তুই আর আমি একসঙ্গে থাকব। আমিও তোকে সাহায্য করতে পারব। (ওদের শেষের দিকের কথা প্রায় শোনাই যায় না)

[আলো নীচে শশধরের ঘরে পড়ে]

শেফালী ॥ হ্যাগো, গণেশ কি সত্যিই ওকে অত টাকার জিনিস ছেড়ে দেবে? তোমার কি মনে হয়।

শশধর ॥ কে জানে দেবে কিনা, বড় চালাক ছেলে। গণেশের সঙ্গে গোড়া থেকে থাকলে ও এতদিনে বেশ বড় হয়ে যেত। ছাখ এখন গণেশ ওকে কি নজরে নেয়? ব্যাটার ওপর আজকাল আমি কোন ভরসা রাখি না। সিনেমায় নামা—(বিবেককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে) আবার কেন এসেছ? আমার কাছে আর টাকা নেই। আমি ফোঁপরা হয়ে গেছি।

বিবেক ॥ টাকা চাইতে আমি আসিনি। আমি কাল গণেশের সঙ্গে দেখা করতে যাব।

শেফালী ॥ কাল তোদের একটা ভাল জিনিস তৈরী করে খাওয়াব।

শশধর ॥ গেলার কথা এখানে আসছে কোথায়? তুমি ওকে বলো যে ইতিমধ্যে তুমি কিছু শুরু করে দিয়েছ। বুঝলে?

বিবেক ॥ আচ্ছা, তাই বলব।

শশধর ॥ নিজেকে খাট করবে না। পনেরো হাজারের নীচে কিছুতেই রাজী হবে না।

বিবেক ॥ (সহ্য করতে না পেরে) তাই হবে। আমি শুতে যাচ্ছি মা।

[চলে যায়।]

শশধর ॥ তোমার মধ্যে বিরাট সম্ভাবনা আছে—সমস্ত রকমের গুণ তোমার আছে—(শুয়ে পড়ে।)

নব ॥ মা, আমি ভাবছি বিয়ে করব—কথাটা তোমার জানা দরকার।

শেফালী ॥ (ক্লান্ত স্বরে) এখন শুতে যা, খোকা।

নব ॥ (যেতে যেতে) কথাটা তোমায় আমি জানিয়ে রাখলাম।

শশধর ॥ ভাল করে মন দিয়ে কাজ কর। বিয়ে করব। ভগবান······ তোমার মনে আছে, ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডে ওদের সেই ফুটবল ফাইনালের কথা?

শেফালী ॥ আর কথা বল না, এবার বিশ্রাম কর।

শশধর ॥ দু'টো টিম যখন মাঠে নামল আমার ব্যাটা দেখি সবচেয়ে স্মার্ট।

[ওপরের ঘরে অন্ধকারের মধ্যে চেয়ারে বসে বিবেককে সিগারেট ধরাতে দেখা যায়।]

ব্যাটাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছিল। সমস্ত মাঠ ফেটে পড়ছিল—সামন্ত, সামন্ত, সামন্ত! দেখবে এবার ব্যাটা ঠিক দাঁড়াবে—বিরাট হবে—একেবারে সূর্যের মত বড়। (শশধরের মুখ থেকে আলো চলে যায়।)

শেফালী ॥ হ্যাঁ গো, তোমার ওপর ওর কিসের নালিশ?

শশধর ॥ আজ আর পারছি না। এখন আর কোন কথা বল না।

শেফালী ॥ তুমি এবার ভোলাকে ভাল করে বুঝিয়ে কলকাতায় কাজ করার ব্যবস্থা করে নাও।

শশধর ॥ আমি কাল সকালে অফিসে গিয়ে ভোলার সঙ্গে কথা বলব। দ্যাখ, দ্যাখ, চাঁদটা কি সুন্দর মেঘের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

[আনন্দমধুর সঙ্গীতের মধ্যে পর্দা উঠে। শশধর চেয়ারে বসে চা খাচ্ছে। পাশে শেফালী দাঁড়িয়ে। শশধরকে বেশ হাসিখুসি লাগে।]

শশধর॥ (বেশ পরিতৃপ্তভাবে কাপে চুমুক দিয়ে) বাঃ! বেড়ে করেছ!

শেফালী॥ তোমাকে একটা ডিম ভেজে দেব?

শশধর॥ না। তুমি একটু বস।

শেফালী॥ (চেয়ারে বসে) তোমায় আজ বেশ ভাল লাগছে।

শশধর॥ হ্যাঁ। রাতে প্রায় মড়ার মত ঘুমিয়েছি। বোধহয় কয়েক বছর পরে। আশ্চর্য! মঙ্গলবার সকালে বেলা দশটা অবধি ঘুম! ব্যাটারা কখন উঠল?

শেফালী॥ ওরা সেই ভোর হতে না হতেই উঠেছে। জলখাবার খেয়ে সকাল আটটা নাগাদ বেরিয়েছে।

শশধর॥ বাঃ!

শেফালী॥ খোকাদের একসঙ্গে দেখতে বেশ লাগে। এমন সব কাণ্ড কবে যে মনে হয় সেই ছোট্টই আছে।

শশধর॥ হু হু হু...

শেফালী॥ বড় খোকা একেবারে পাল্টে গেছে। বহুদিন পর ওর মধ্যে একটা উৎসাহ দেখতে পেলাম। সেই ক'ন ভোর থেকে তৈরী হতে শুরু করেছে—যেন গণেশের কাছে যাওয়ার আর তর সইছে না।

শশধর॥ হ্যাঁ। বড় ব্যাটা পাল্টে যাবে। কিছু কিছু লোক একটু বেশি বয়েসে সাফল্য পায়। ভাল জামা কাপড় পরে গিয়েছিল তো?

শেফালী॥ হ্যাঁ। ওর নীল স্যুটটা। ওটা পরলে ওকে—ওকে যেন রাজপুত্র মনে হয়।

[শশধর ওঠে।]

শশধর॥ আমার আর কোন চিন্তা নেই। সেলস্‌লাইনে বড় ব্যাটা যখন ঢুকবে ঠিক করেছে—আর দেখতে হবে না। চড়চড় করে উন্নতি করবে। আজ ফেরার সময় কিছু বীজ কিনে আনব।

শেফালী ॥ একগাদা এনো না। আজকাল আর বাগানে রোদ আসে না। কোন গাছ কি বাঁচবে।

শশধর ॥ কিছু দিন সবুব কর। বড় ব্যাটা সেলস্‌লাইনে একটু স্থিতু হয়ে নিক। তারপর স্টে লেকে বেশ কিছু জমিওলা বাড়ী কিনব। তখন দেখবে সারা বাগান আনাজে ভরে যাবে। গোটা কয়েক মুরগীও রাখতে পারব। সারা বাড়ী রোদ আর তাজা হাওয়ায় ভরে থাকবে।

শেফালী ॥ খুব ভাল হবে।

শশধর ॥ ব্যাটাদের বিয়ে দেব। নাতি-নাতনী হবে। নাতি-নাত্‌নীদের নিয়ে আমি সারাদিন হৈ-চৈ কবব। দেখ, ওরা তোমার কাছে থাকতেই চাইবে না।

শেফালী ॥ সে আমি জানি—ওরা সব সময় দাদুর কাছে থাকবে।

শশধর ॥ বাগানেব বেড়া আমি নিজের হাতে লাগাব। আচ্ছা, বড় ব্যাটা গণেশের কাছে কত চাইবে—কিছু বলেছে?

শেফালী ॥ আমায় ঠিক কত তা' বলেনি। তবে মনে হয় হাজার পনেরো চাইবে। তুমি ভোলাকে আজকে বলবে তো?

শশধর ॥ নিশ্চয়ই! আমি ওকে খুব পরিষ্কার করে জানিয়ে দেব। ওর আমাকে কলকাতায় কাজ করতে দিতেই হবে।

শেফালী ॥ আর শুনছ, কিছু আগাম টাকা চেয়ে এনো। ইন্‌সিওরেন্সের টাকাটা দেওয়া হয়নি। বাড়তি সময়ও পার হতে চল্ল।

শশধর ॥ কত যেন? এক শ'...

শেফালী ॥ একশ আট টাকা আটষট্টি পয়সা। তাছাড়া বাড়ীর দেনার কিস্তিটা দেওয়া হয়নি।

শশধর ॥ কেন? দাওনি কেন?

শেফালী ॥ কি করে দেব? তোমার সেই অ্যাক্সিডেন্টের পর কত খরচা হয়ে গেল। কি ক'রে যে চলছে সে আমিই জানি।

শশধর ॥ কি যে কর তার ঠিক নেই। বাড়ীর টাকাটা না খেয়েও দেওয়া দরকার। এখন আমি কি করি? কোত্থেকে এত টাকা আসবে? মেয়েলোকের বুদ্ধিতে কোন কাজ হয়? কত যেন?

শেফালী ॥ প্রায় দেড়শ টাকার মত। এটাইতো শেষ। বাড়ীটা আমাদের হয়ে যাবে।

শশধর ॥ শেষ! সত্যি কতদিন হয়ে গেল। পঁচিশ বছর।

শেফালী ॥ হ্যাঁ, বড় খোকার বয়েস তখন মাত্র ন'বছর যখন আমরা এটা কিনি।

শশধর ॥ উফ্, এটা যে কোনদিন শোধ করতে পারব ভাবতেও পারিনি। একটানা এতগুলো বছর ধরে ঋণ শোধ! মেটালেই বোঝা নেমে যাবে। আমরা স্বাধীন হব।

শেফালী ॥ তোমার বাহাদুরি আছে।

শশধর ॥ না গো, সবই তোমার জন্যে হয়েছে। তুমি না থাকলে আমি ভেসে যেতাম। কিন্তু দেনাটা—

শেফালী ॥ কিছু ভেব না। কিছু সময় ওরা নিশ্চয় দেবে। তার মধ্যে একটা ব্যবস্থা হবে।

শশধর ॥ হলেই ভাল। এখন তোমার কপাল আর আমার হাত যশ। ভাবনা —ভাবনা—ভাবনা, চারিদিকে কত ভাবনা। ব্যাটারা যদি এ বাড়ী রাখতে না পারে। (যাওয়ার উদ্যোগ করে) যাক্‌গে—আমি আসি।

শেফালী ॥ (হঠাৎ মনে পরে যায়) এই শুনছ, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। বিকেলে তোমার চা থাওয়ার নেমতন্ন।

শশধর ॥ আমার ? কোথায় ?

শেফালী ॥ চৌরঙ্গীতে কি একটা ওপেন এয়ার রেস্টুরেণ্ট আছে—সেইখানে।

শশধর ॥ কে ? গোপাল বলে গেছে ?

শেফালী ॥ (হাসি চাপতে চাপতে) না গো, তোমার ব্যাটারা ঠিক করেছে। বিকেল ছ'টার সময়ে।

শশধর ॥ তাই নাকি ? তুমি যাবে না ?

শেফালী ॥ আমি গিয়ে কি করব ? তোমাদের বাপ-ব্যাটার ব্যাপার। আমি বরং বাড়ী বসে ভাল খবরগুলো শুনব।

শশধর ॥ তোমায় কে বলল ?

শশধর ॥ বড় খোকা। যাওয়ার সময় বলে গেল—অনেকদিন তোমার সঙ্গে বাইরে যায়নি।

শশধর ॥ আবার সেই পুরোনদিনগুলো ফিরে আসবে। আজ আমি ভোলাকে গিয়ে এইসা এক দাবড়ানি দেব, যে বাছাধন আমার কথা না শুনে পথ পাবে না। দেখ আমি কলকাতায় ঠিক কাজ করব।

শেফালী ॥ সব বদলে যাবে। (আঁচল দিয়ে চোখ মোছে) আবার সেই সুন্দর দিনগুলো আমাদের জীবনে ফিরে আসবে।

শশধর ॥ আসবে—আসবে—ঠিক আসবে। (যাওয়ার উদ্যোগ করে। পকেটে হাত দিয়ে অনুভব করতে করতে)

শেফালী ॥ (হাত বাড়িয়ে একটা রুমাল দিয়ে) এই নাও রুমাল।

শশধর ॥ ও—হ্যাঁ। দাও।

শেফালী ॥ সাবধানে বাসে উঠ। না থামলে উঠতে যেও না।

শশধর ॥ আচ্ছা। আচ্ছা। (হঠাৎ শেফালীর ছেঁড়া শাড়ীর দিকে নজর পড়ে) তুমি ছেঁড়া শাড়ী পরা বন্ধ করতে পার না? অন্ততঃ যখন আমি বাড়ী থাকি। (শেফালী তাড়াতাড়ি শাড়ীর ছেঁড়া জায়গাটা ঢেকে দেয়।) দুগ্‌গা—দুগ্‌গা।

শেফালী ॥ দুগ্‌গা—দুগ্‌গা। বিকেল ছ'টার কথা ভুলে যেও না।

[শশধর চলে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে তারপর হাসিমুখে ফিরে চলে। টেবিলের কাছে এসে খানিকটা অভ্যেস বশতঃই ড্রয়ারটা খুলে দেখে—দেখেই স্তব্ধ হয়ে যায়। টেলিফোন বেজে ওঠে। অত্যন্ত শ্লথ ভঙ্গীতে হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে নেয়।]

হ্যালো! কে? বড় খোকা! হ্যাঁ—হ্যাঁ—কি খবর বল? ওঃ হ্যাঁ —আমি বলেছি—বলেছি। খুব খুশি হলেন। হ্যাঁ—ঠিক ছ'টার সময় যাবেন। ওরে শোন, একটা ভীষণ কাণ্ড হয়ে গেছে। হ্যাঁ—ভীষণ। সেই নাইলনের দড়িটা পাচ্ছি না। কি বল্লি, তুই নিয়েছিস? ওফ্, বাঁচালি। না—না, আমি ঠিক ভয় পাইনি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। আজ সকালে উনি খুব হাসিখুশি ছিলেন—সেই আগেকার মত। হ্যাঁরে, গণেশের সঙ্গে তোর কথা হল? ওঃ। এখনও দেখা হয়নি? —তুই ওর ওখান থেকেই ফোন করছিস? —না-না, দেখা করে তবে বের হবি। একলা বসে আবল তাবল ভাবিস না। দেখিস সব ঠিক হয়ে যাবে। উনিও হয়ত তোদের একটা ভাল খবর দিতে পারবেন। —হ্যাঁ—ঠিক বলেছিস, কলকাতায় কাজের ব্যাপারে। (আবেগে গলা আটকে যায়) না। এইবার চান করে খাব। সব ভালমত করিস। (ছেড়ে দেয়)

[ওদের কথার মাঝে আলো কমে যেতে থাকে। ডানদিকের কোনে

ভোলা দত্তকে পাইপ মুখে দেখা যায়। বছর পঁয়ত্রিশ বয়েস। সামনে একখানা ছোট্ট টেবিল। তার উপর একটা টেপ রেকর্ডার। আলো এসে ভোলার ওপর পরে। শশধরকে ঢুকতে দেখা যায়। পায়ের শব্দে একবার তাকিয়ে আবার হাতের কাজ করতে থাকে। শশধর এসে খানিকক্ষণ দেখে গলা খাঁকারি দেয়।]

ভোলা ॥ আসুন শশধরবাবু।

শশধর ॥ তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটি কথা আছে, ভোলা।

ভোলা ॥ একটু দাঁড়ান, কাজটা শেষ করে বলছি।

শশধর ॥ ওটা কি!

ভোলা ॥ এটা এর আগে দেখেন নি? এটা টেপ রেকর্ডার।

শশধর ॥ ওঃ। ওটা দিয়ে তুমি কি করবে?

ভোলা ॥ আসলে এটা ডিকটেশনের জন্যে কিনেছি, কিন্তু এনিয়ে আপনি যা খুশি করতে পারেন—শুনবেন একটু? কাল বাড়ী নিয়ে গিয়েছিলাম—শুনুন, কি করেছি। প্রথমেই আমার মেয়ে…[গান শুরু হয়]

ভোলার মেয়ের স্বর ॥ ম্যয় কা করু রাম মুঝে বুড্ডা মিল গ্যয়া…(চলতে থাকে)

ভোলা ॥ দেখেছেন! কি দারুণ তুলেছে।

শশধর ॥ (মুখটা বিকৃত করে) বেশ গলা, বেশ তুলেছে।

ভোলা ॥ মাত্র সাত বছর বয়েস, মেয়েটা আমার খুব বাধ্য।

শশধর ॥ ভোলা, তুমি আমার কথাটা শুনলে—

ভোলার মেয়ের স্বর ॥ বাপি, তুমি এবার একটা গান কর, কর না। তাহলে যাও।

ভোলার স্বর ॥ আচ্ছা, আচ্ছা, শোন—ম্যয় ক্যা করু রাম মুঝে বুড্ডা মিল গ্যয়া…

ভোলা ॥ হা হা হা—আমার গলা।

শশধর ॥ তোমার গলাও তো বেশ ভাল।

[গান থেমে যায়। শশধর আরও কিছু বলতে যায়, কিন্তু ভোলা থামিয়ে দেয়।]

ভোলা ॥ চুপ করুন। এবার আমার ছেলে!

ভোলার ছেলের স্বর ॥ পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলিকাতা, বিহারের রাজধানী পাটনা, উড়িষ্যার রাজধানী ভুবনেশ্বর… (চলতে থাকে)

ভোলা ॥ (হাতের পাঁচটা আঙ্গুল দেখিয়ে) মাত্র পাঁচ বছর বয়েস—সব মুখস্থ।

শশধর ॥ বড় হয়ে তোমার মার্কেটিং এক্সপার্ট হবে।

ভোলার ছেলের স্বর ॥ অন্ধ্রের রাজধানী— (শব্দ ছাড়া চলতে থাকে)

ভোলা ॥ এক মিনিট। রেকর্ডিং-এর সময় প্লাগটা হঠাৎ খুলে গিয়েছিল।

শশধর ॥ এটা নিশ্চয়ই—

ভোলা ॥ শ্‌শ্‌প্‌।

ভোলার ছেলের স্বর ॥ এখানকার সময় অনুসারে···এখন রাত নটা। আমাদের প্রথম অধিবেশন এখানেই সমাপ্ত। এবার আমি ঘুমতে যাব।

শশধর ॥ তোমার ছেলে দেখছি—

ভোলা ॥ আর এক মিনিট, এবার আমার স্ত্রী। (চুপ করে অপেক্ষা করে)

ভোলার স্বর ॥ এই! এবার তুমি কিছু বল। (বিরতি) কই বল?

ভোলার স্ত্রীর স্বর ॥ আমি! আমি কি বলব।

ভোলার স্বর ॥ আরে যা হোক কিছু বল—ওটা ঘুরছে। বল না—আমরা তো সবাই বল্লাম।

ভোলার স্ত্রীর স্বর ॥ আমি এখন—ধ্যেৎ। আমি কিছুই মনে করতে পারছি না।

ভোলা ॥ (ভোলা বন্ধ করে দেয়) আমার স্ত্রী।

শশধর ॥ সত্যিই বড় চমৎকার জিনিস। এবার কি আমরা—

ভোলা ॥ আমি আপনাকে লিখে দিতে পারি—আজ পর্যন্ত যত জিনিস বের হয়েছে, তার মধ্যে টেপ রেকর্ডার হ'ল—দি বেস্ট। এত ভাল করে আর কিছু দিয়েই সময় কাটান যায় না। আমি পর্যন্ত জিনিসটা পেয়ে পাগলের মত করেছি।

শশধর ॥ আমিও ভাবছি একটা কিনব।

ভোলা ॥ কিনে ফেলুন খুব সামান্যই দাম। হাজার দুয়েকের মত। বেশির ভাগ সময় বাড়ীর বাইরে থাকেন—নাতি নাতনীদের গলা রেকর্ড করে নিন—বাইরে গিয়েও শুনতে পারবেন।

শশধর ॥ নাতি-নাতনী। হ্যাঁ-হ্যাঁ—ঠিক বলেছ। কিন্তু আমার তোমাকে কয়েকটা কথা বলার ছিল।

ভোলা ॥ ওঃ—হ্যাঁ। কি যেন বলবেন বলেছিলেন—কিন্তু এখন আপনার ট্যুরে থাকার কথা না?

শশধর ॥ কথা তো তাই, তবে ভাবছি আর ট্যুর করব না।

ভোলা ॥ করবেন না? এটা ঠিক করার আপনি কে?

শশধর ॥ মানে আমি বলছিলাম কি আমার আর ট্যুর করার ইচ্ছে নেই।

ভোলা ॥ বেশ তো বাড়ীতে থাকুন। আমার কাছে এসেছেন কেন?

শশধর ॥ মানে আমি ঠিক তা বলতে চাইনি। আমি বলছিলাম কি আমায় কলকাতায় কাজ করতে দাও।

ভোলা ॥ কলকাতায়!

শশধর ॥ হ্যাঁ। তাছাড়া তুমি আমায় এ রকম একটা ভরসাও তো দিয়েছিলে।

ভোলা ॥ আমি আপনাকে কলকাতায় আনব বলেছিলাম। কি ব্যাপার বলুনতো? আজকাল কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমার স্বপ্ন দেখেন?

শশধর ॥ তা দেখব কেন বাবা, তুমি বলেছিলে—মনে করে ছাখ।

ভোলা ॥ এসব বাজে ব্যাপার নিয়ে ভাবার আমার একেবারে সময় নেই। তাছাড়া—আপনাকে কলকাতায় আনা সম্ভব নয়।

শশধর ॥ ভোলা, আমার দিকে একবার তাকাও। শোন, আমার ছেলেরা এখন বড় হয়েছে। আগের মত পরিশ্রম করে আমার রোজগার না করলেও চলে। তুমি তো আমায় বলেইছিলে সামনের মাস থেকে মাইনে ছাড়া শুধু কমিশনে কাজ করতে হবে—আমি মেনে নিচ্ছি। তুমি আমায় কলকাতায় আন আর শতকরা দু' টাকা কমিশন দিও।

ভোলা ॥ কিন্তু কলকাতায় আমার আর লোকের দরকার নেই। তাছাড়া ফালতু লোক রাখার পয়সা কোথায়?

শশধর ॥ ভগবানের দিব্যি ভোলা, আমি জীবনে কারুর কাছে কোনদিন দয়া চাইনি। আমি তোমাদের ব্যবসার একেবারে গোড়া থেকে আছি।

ভোলা ॥ আমি সব জানি। কিন্তু তবুও—

শশধর ॥ তুমি যেদিন হ'লে তোমার বাবা এসে আমায় জড়িয়ে ধরে খবরটা দিয়ে বল্লেন—"শশধর তোমার চেলা হয়েছে"—আমি তোমায় দেখলাম। সুন্দর ফুটফুটে ছেলে, নাম দিলাম—ভোলানাথ।

ভোলা ॥ দেখুন শশধরবাবু। আপনার দরকার বলে তো আর কলকাতাকে বাড়িয়ে বড় করে দিতে পারি না। যদি সত্যিই কোন খালি জায়গা থাকত তবে আপনাকে আর এত বক বক করতে হত না।

শশধর ॥ ওঃ। আমি বক্ বক্ করছি!

[ভোলা লাইটারের খোঁজে পকেট হাতড়ায়, শশধর টেবিলের ওপর থেকে লাইটারটা তুলে দেয়।]

দ্যাখ, ভোলা, আমি শতকরা এক টাকা কমিশনেই কাজ করতে রাজী আছি।

ভোলা ॥ (একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে) কিন্তু আপনাকে আমি কোথায় কাজ করতে দেব ?

শশধর ॥ কিন্তু তোমার তো বিক্রী হওয়া নিয়ে কথা। তাই না ?

ভোলা ॥ না, এটা ব্যবসা। ঠিক লোককে ঠিক জায়গায় রেখেছি আমি।

শশধর ॥ আজ তোমাকে আমি একটা গল্প বলি—

ভোলা ॥ গল্প কেন উপন্যাস বল্লেও—বিজনেস ইজ্ বিজনেস।

শশধর ॥ (রেগে গিয়ে) সে আমায় শিখিও না। আমিও জানি বিজনেস ইজ বিজনেস। কিন্তু এখন আমার কথা শোন—আমার যখন মাত্র আঠারো উনিশ বয়েস—তখন আমি হাতে ব্যাগ নেই। কিন্তু আমার ভবিষ্যত সম্বন্ধে আমি তখন নিশ্চিন্ত ছিলাম না, প্রায়ই আমার মনে হত আমি কিন্তু সেলসের কাজ পারব! তুমি হয়ত বলবে—

ভোলা ॥ আমি আপনাকে কিছুই বলতে চাই না।

শশধর ॥ আমার মনের সেই অবস্থায় আমার আর একজন সেলসম্যানের সঙ্গে আলাপ হল—নাম জোসেফ তালুকদার, চুরাশি বছর বয়েস। ভদ্রলোক ঐ বয়েসেও সারা ভারতবর্ষ ঘুরে ব্যবসা নিয়ে আসতেন। ওঁকে দেখে আমার মনে হল পেশা যদি থাকে তবে ঐ একটাই—আর সব বাজে। মানুষের আর কি চাই। ওই বয়েসেও অত দব্‌দবা—মুঠো মুঠো টাকা। আর উনি যে ভাবে মারা গেলেন। আহা, যে কোন লোকের কাছে গর্বের। একেবারে কাজের মধ্যে। নিজের বাড়ীতে বসে। পায়ে সবুজ ঘাসের চটি, হাতের কাছে ফোন। উনি মারা গেছেন খবর পেয়ে কতলোক ছুটে এসেছিল। অনেক ডীলার তো দোকানই বন্ধ করে দিয়েছিল। আমাদের কাছে উনি ছিলেন—গুরুদেব। শ্রদ্ধা-প্রীতি-ভালবাসা-কৃতজ্ঞতা এ সবের ধর্ম তখনকার লোকেরা বুঝত, সবাই সেকেলে ছিল কিনা। আজকের মত এগুলো বোকামির লক্ষণ হয়ে দাঁড়ায়নি! কেউ—কেউ আমায় মনে রাখেনি।

ভোলা ॥ খুব স্বাভাবিক। ব্যবসার সঙ্গে এ সবের কোন সম্পর্ক নেই। তাছাড়া এখন দিন পাল্টাচ্ছে—কত কম্পিটিশন বেড়েছে।

শশধর ॥ আমিও সব বুঝি ভোলা। গালে চড় খেতে আমার ভাল লাগেনা। তুমি—তুমি আমায় শতকরা আট আনা কমিশন দিও তাতেই আমার চলবে।

ভোলা ॥ আমি ত আমার উত্তর আপনাকে আগেই জানিয়েছি।

শশধর ॥ তোমরা তোমরা এই বুড়োর জন্যই এখনও টিঁকে আছ। কারবার শুরু হওয়ার দু বছরের মধ্যেই—

ভোলা ॥ আমি দুঃখিত শশধরবাবু, আপনাকে আমি আর সময় দিতে পারছি না। আমাকে একটা জরুরী মিটিং-এ যেতে হবে।

শশধর ॥ (শেষ চেষ্টা করে) মিটিং, একটানা ছত্রিশ বছর ধরে নিজের বুকের রক্ত দিয়ে আমি এই প্রতিষ্ঠানকে বড় করলাম আর প্রতিষ্ঠান যখন বড় হল তখন ইনসিওরেন্স দেওয়ার টাকাও আমার নেই। আমি এখন তোমার কাছে ছিবড়ে হয়ে গেছি—(সুর পাল্টে) শোন, ১৯২৮ সালে তোমাদের এই কারবার ডুবতে বসেছিল মাত্র পনেরো হাজার টাকার জন্য। তোমার বাবা মাথা খুঁড়েও কোথাও টাকা পায়নি। কারণ কারবারের অবস্থা সবাই জেনে গিয়েছিল। তখন এই বুড়ো this old শশধর সামন্ত তার নিজের ভবিষ্যতের কথা না ভেবে নিজের যথা সর্বস্ব বিক্রী করে ওই টাকা তোমার বাবাকে এনে দিয়েছিল—তখন ওই টাকায় তোমাদের কম্পানী কিনে ফেলতে পারতাম!

ভোলা ॥ কিন্তু সে টাকা তো আপনি সুদ সমেত ফেরত পেয়েছেন—তবে!

শশধর ॥ হ্যাঁ, পেয়েছি। কিন্তু তবে ব্যবস্থাও এই বুড়োকেই করতে হয়, আজ তুমি আমায় নতুন লোক দেখাচ্ছ, আমাকে বাড়তির খাতায় ফেলে—কিন্তু তখন আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না তোমাদের। পশুর মত খেটে লাখ লাখ টাকার ব্যবসা এনে দিয়েছি, দুলাল কৃতজ্ঞতায় আমার হাত জড়িয়ে ধরেছিল। কারবারের অর্ধেক আমায় লিখে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু মালিকানা আমি কোনদিন চাইনি—আমি শুধু আমার প্রাপ্য সম্মান চেয়েছিলাম।

ভোলা ॥ কিন্তু এখন আপনি সারামাস খেটেও কিছুই দিতে পারেন না, অথচ নতুন ছেলেরা প্রত্যেকেই আপনার চেয়ে অনেক বেশী ব্যবসা দেয়। তাদের সরিয়ে আপনাকে রাখা মানেই আমার লোকসান। আমায় ব্যবসা রাখতে গেলে সেন্টিমেন্টাল হলে চলবে না। যাক্‌গে—আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। আমি যাচ্ছি—

[শশধর কাঁপতে কাঁপতে টেবিলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ায় একটা তীব্র আলো এসে শশধরের ওপর পড়ে।]

শশধর ॥ হায় ভগবান আজ এই চামারটার কাছে আমায় দয়াভিক্ষা চাইতে হল। আর বেঁচে থেকে আমার লাভ কি ?

[সজোরে ঘুসি মারে ঘুসির আঘাতে রেকর্ডার চলতে থাকে।]

ভোলার ছেলেব স্বর ॥ আসামের রাজধানী, আসামের রাজধানী শিলং।

শশধর ॥ (মারাত্মক ভয় পেয়ে চিৎকার করে ওঠে) দাদা—দাদা—দাদা ! (থরথর করে কাঁপতে থাকে)

ভোলা ॥ (শশধরের দিকে চেয়ে তারপর রেকর্ডার চলছে দেখে বন্ধ করে) কি কেলেঙ্কারী, অমন করছেন কেন ?

শশধর ॥ না—আমি বাড়ী যাই, বাড়ী যাই।

ভোলা ॥ দাঁড়ান। (জোর করে চেয়ারে বসিয়ে) বসুন এখানে। (টেবিলের ওপর থেকে জল এনে দেয়) নিন এটা খেয়ে ফেলুন।

শশধর ॥ (কাঁপা হাতে গেলাসটা নিয়ে এক নিঃশ্বাসে শেষ করে) আঃ বাঁচালে বেঁচে থাক বাবা বেঁচে থাক।

ভোলা ॥ শুনুন শশধরবাবু।

শশধর ॥ না, এবার আমি উঠি। আজই আবার ট্যুরে বেরিয়ে যাব।

ভোলা ॥ (শশধরের ওঠাতে বাধা দিয়ে) আপনাকে আর ট্যুরে যেতে হবে না।

শশধর ॥ (ভোলা কলকাতায় কাজ করার ইঙ্গিত করছে ভেবে আনন্দে) সত্যি ভোলা। তুমি তাহলে মত পাল্টেছ।

ভোলা ॥ না। ভোলা দত্ত অত সহজে মত পালটায় না। আপনাকে আর ট্যুরে যেতে হবে না।

শশধর ॥ কেন ?

ভোলা ॥ কারণ, আমি চাইনা আর আপনি আমাদের হয়ে কাজ করেন।

এ আমি আপনাকে বহুবার ইঙ্গিতে বলেছি। আজ স্পষ্ট করে বল্লাম।

শশধর॥ তুমি—তুমি চাওনা আমি আর তোমার এখানে কাজ করি! আমি তাহ'লে কি করব?

ভোলা॥ আপনার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। বিশ্রাম করুন।

শশধর॥ তার মানে তুমি কি এই বুড়ো বয়সে আমায় না খেয়ে মরতে বল?

ভোলা॥ ছিঃ ছিঃ, না খেয়ে মরবেন কেন? নিজের বাড়ী আছে দু দুজন উপযুক্ত ছেলে রয়েছে।

শশধর॥ ওরা ওরা সবাই বড় বড় চাকরি করে। ওদের ঘাড়ে বসে খেতে আমার লজ্জা করবে।

ভোলা॥ মিথ্যে দেমাক দেখাবেন না—শশধববাবু, আপনি বাড়ী গিয়ে ওদেব বলুন যে আপনি আর চাকরী করতে চান না।

শশধর॥ কিন্তু ভোলা আমি তো ট্যুর করতে পারব।

ভোলা॥ পারলেও তার দরকার নেই।

শশধর॥ আমি জড় নই—কেন আমি ছেলেদের পয়সায় খাব!

ভোলা॥ (অত্যন্ত স্থির গম্ভির স্বরে) আজ আমাকে অনেক লোকের সঙ্গে কথা বলতে হবে। জরুরী কথা। এখানে বসে খানিক বিশ্রাম করুন শরীর ভাল বোধ করলে বাড়ী যাবেন। (চলে যাওয়ার মুখে রেকর্ডার তুলে নেয়) এই সপ্তাহের যে কোনদিন এসে আপনার পাওনা বুঝে নিয়ে যাবেন, আর আপনার কাছে যা স্যাম্পল্ আছে দিয়ে যাবেন। আচ্ছা good night.

[ভোলা চলে যায়, টেবিলটাকে ভেতরের দিকে ঠেলে দিয়ে। শশধর শূন্যে তাকিয়ে থাকে। পরিশ্রান্ত বিপর্যস্ত। শশধরের ওপর থেকে আলো ক্রমশ কমে আসতে থাকে। জলতরঙ্গের আওয়াজ শোনা যায়, অলোর রঙ পাল্টে যায় মঞ্চের বাঁদিকে নটবর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেই পুরোন পে]

শশধর॥ দাদা, তুমি হলে কি করতে? এর কি উত্তর? [থেমে] তোমার কাজ এর মধ্যে শেষ হয়ে গেল?

নটবর॥ কি করতে হবে জানা থাকলে সময় খুব একটা লাগেনা। আমাকে আর এক জায়গায় যেতে হবে। তোমার সঙ্গে আর একবার দেখা করে গেলাম।

চাণক্য ও যোগেশের ভূমিকায় দানিবাবু

ষ্টুডিও মীরেন-এর সৌজন্যে

আলমগীর

নটসূর্য : শিশিরকুমার ভাদুড়ী

ষ্টুডিও মীরেন-এর সৌজন্যে

বন্দর' নাটকে : নট-পরিচালক

বিদ্যুৎ গোস্বামী ও মধু বসু

'ঢেউ' নাটকে প্রশান্ত

সুশান্ত বিশ্বাস

শশধর ॥ তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে, দাদা !

নটবর ॥ (ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) কিন্তু আমার যে সময় নেই শশধর ।

শশধর ॥ দাদা, আমি জীবনে কিছুই করতে পারলাম না ; আমি বুঝতে পারছি না কি করতে হবে ।

নটবর ॥ শশধর শোন, গারো হিল্‌সে আমি বিরাট জঙ্গল ইজারা নিয়েছি, তুমি ওখানকার ভার নিতে পার ।

শশধর ॥ গারো হিল্‌স ? ওখানে অনেক ফাঁকা জায়গা, তাই না ? আমি ব্যাটাদের নিয়ে খুব খেলতে পারব ।

নটবর ॥ সমস্ত মন দিয়ে লেগে যাও, লাখ লাখ টাকা হাতে আসবে ।

শশধর ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, কোথায় গেলে গো, শুনছ ?

[শেফালী তাড়াতাড়ি ঘরে ঢোকে, হাতে বালতি]

শেফালী ॥ ওঃ, আপনি ফিরে এসেছেন ?

নটবর ॥ হ্যাঁ বৌমা, কিন্তু আমায় এখনি যেতে হবে ।

শশধর ॥ একটু দাঁড়াও । ওগো, দাদা আমায় আসামে যেতে বলছেন ।

শেফালী ॥ কিন্তু তুমিতো এখানে— (নটবরকে) উনি তো এখানে খুব ভাল কাজ করছেন ।

শশধর ॥ কিন্তু দাদার সঙ্গে আসামে গেলে আমি—

শেফালী ॥ তুমি তো এখানে যথেষ্ট আয় করছ !

নটবর ॥ (হেসে) কত আয় করছে, বৌমা ?

শেফালী ॥ (নটবরকে ভয় পেয়ে শশধরের উপর রেগে) ওঁকে বাইরের লোভ দেখাবেন না । আমরা এখানে যথেষ্ট সুখে শান্তিতে আছি । (নটবর আবার হাসে) প্রত্যেককে কি কোটিপতি হতে হবে ! বিশ্বজয় করতে হবে ? এখানে সবাই তোমায় পছন্দ করে । ছেলেরা তোমায় কত ভালবাসে আর দেখবে হয়ত একদিন...(নটবরকে) কেন ওঁকে তো দুলাল দত্ত বলেছে যে উনি যদি কাজ ছেড়ে না দেন তবে ওর পার্টনার করে নেবে— (শশধরকে) বলেনি ?

শশধর ॥ সত্যি, দুলাল আমায় বলেছে । তা ছাড়া আমি ওকে ছেড়ে গেলে ও একেবারে ডুবে যাবে । আমি ছাড়া ওর আর কোন গতি নেই ।

নটবর ॥ কিন্তু এতে তোমার নিজের কি লাভ হচ্ছে ? যদি সত্যিই তুমি পার্টনার হও তাতেই বা কত পাবে ?

শশধর ॥ (শেফালীকে) তা বটে, কতই বা পেতে পারি? ও বিশেষ কিছুই না।

শেফালী ॥ যদি নাই পাও তাতেই বা কি? তুমি তো বলেছিলে বুড়ো বয়সের জন্য তোমার কোন ভাবনা নেই। চুরাশী বছর বয়সেও—

শশধর ॥ সত্যি আমি জোসেফ তালুকদারকে দেখতাম আর ভাবতাম বয়সের জন্য আমাকে কখনও দুশ্চিন্তায় পড়তে হবে না। চুরাশী বছর বয়সেও—

নটবর ॥ তাই নাকি!

শশধর ॥ হ্যাঁ দাদা, তালুকদার যে কোন শহরে গিয়ে ডীলারদের ফোন করত আর ডীলাররা হোটেলে এসে দেখা করে কত অর্ডার দিয়ে যেত। আমিও সেই কথা ভেবে একটা ফোন নিয়েছি।

শেফালী ॥ তবে? (নটবরের দিকে চায়)

নটবর ॥ (যাওয়ার উদ্যোগ করে) আমায় এবার যেতে হবে শশধর।

শশধর ॥ এই যে ব্যাটারা এসে গিয়েছে। (ছোট নব ও ছোট বিবেক ঢোকে) বড় ব্যাটা খেলায় খুব নাম করেছে। একবার গ্রাজুয়েট হতে পারলেই বিরাট চাকরী পাবে। কত বড় বড ক্লাব ওকে পাওয়ার জন্য পাগল। এখানে না থাকলে সবাই ওকে ভুলে যাবে দাদা, এ রকম ছেলে পাওয়ার গৌরব আমার কাছে বড় লোক হওয়ার চেয়ে বেশী। তুমি নিশ্চয়ই আমার কথা বুঝতে পেরেছ।

নটবর ॥ ঠিক আছে তাই হোক, আমি আসি শশধর।

শশধর ॥ দাদা, বল আমি ঠিক বলেছি কিনা? তোমার কি মনে হয়?

নটবর ॥ এক নতুন জগৎ তোমার অপেক্ষায় রয়েছে। এসো ওখানকার মুক্ত জীবনে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিতে পারবে। তুমি একবার শুরু করলেই বড়লোক হয়ে যাবে। বিরাট বড়লোক। [চলে যায়]

শশধর ॥ আমার এখানেই হবে দাদা। তুমি শুনছ? এখানেই আমি বিরাট লোক হয়ে যাব।

[ছোট সুশান্ত দৌড়ে ঢোকে, আনন্দ মধুর সঙ্গীত বাজতে থাকে]

সুশান্ত ॥ বিবেক! ওঃ কাকাবাবু, আমি ভেবেছিলাম আপনারা চলে গেছেন।

শশধর ॥ কেন কটা বাজে?

সুশান্ত ॥ দেড়টা বেজে গেছে কাকাবাবু।

শশধর ॥ তাই নাকি? ওরে কোথায় গেলি ব্যাটারা। আঃ কি যে সব করো; ওগো শুনছ? রুমালগুলো কোথায় রাখলে!

[বিবেকদের ঘরে ঢোকে]

শেফালী ॥ হ্যাঁরে খোকা, সব গুছিয়ে নিয়েছিস তো?

বিবেক ॥ হ্যাঁ মা, নীচে চল বাপি ডাকছে।

[এঘরে আসে—পেছনে নব, ওর কাঁধে বুট]

সুশান্ত ॥ (নবকে) এই আমায় বুট জোড়াদে।

নব ॥ কেন চাঁদ? তোমায় কেন?

সুশান্ত ॥ বারে! বিবেক, তুই যে কথা দিয়েছিলি তোর বুট আজ আমি বইব? (বিবেক নবর দিকে চায়)

নব ॥ যা যা ঝামেলা করিস না। দাদার বুট আমার নেওয়ার কথা।

সুশান্ত ॥ তাহলে আমি টেণ্টে ঢুকতে পারব না? বিবেক!

শেফালী ॥ অত করে বলছে, ওকে দিয়ে দে ছোট।

সুশান্ত ॥ (জোর বিক্রমে) ওই দ্যাখ কাকীমাও বলছেন। দে আমাকে।

নব ॥ (করুণ চোখে) তাহলে আমি টেণ্টে ঢুকব না?

বিবেক ॥ (এতক্ষণ সমস্ত ব্যাপারটা উপভোগ করছিল) ঠিক আছে, বুটজোড়া তুই ওকে দিয়ে দে, (নব হতাশভাবে গিয়ে সুশান্তকে দেয়) আমার কিড ব্যাগটা তুই নে।

[নবর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, শেফালীর হাত থেকে কিড ব্যাগটা নেয়]

নব ॥ ক্যাবলা কোথাকার! টেণ্টে ঢোকার সময় আমার পেছন ঢুকবি।

শশধর ॥ (শেফালীর হাত থেকে রুমাল নিয়ে নব ও সুশান্তকে একটা করে দেয় আর একটা নিজের হাতে রাখে)। মাঠে ব্যাটা যখন বল নিয়ে দৌড়বে তখন নাড়বি। (নব ও সুশান্ত দৌড়ে বেরিয়ে যায়) চল ব্যাটা।

বিবেক ॥ চল বাপি! (সঙ্গীত থেমে যায়)

শশধর ॥ (বিবেককে ধরে আদর করতে করতে) সাবাস ব্যাটা, ব্যাটা আমার ক্যাপটেন! বল, (গোপালবাবু এসে ঘরে ঢোকে) এই যে এসেছ, তোমার আর জায়গা হচ্ছে না।

গোপাল ॥ জায়গা! কোথায়?

শশধর ॥ গাড়ীতে।

গোপাল ॥ ওঃ। তোমরা বুঝি কোথাও বেড়াতে যাচ্ছ? আমি ভাবছিলাম একটু তাসে বসব।

শশধর ॥ (ভীষণ ক্ষেপে) তাস! আজকে? আজ কি.তুমি জান না?

গোপাল ॥ কেন জানব না। আজ রবিবার।

শেফালী ॥ কেন ওঁকে রাগাচ্ছেন ঠাকুরপো? (হাসি মুখে)

শশধর ॥ রাগাবে? কে রাগাবে আমাকে? গোপাল! আরে দুর—

গোপাল ॥ না বৌদি, আমি সত্যই কিছু জানি না।

শেফালী ॥ বড় খোকার যে আজ খেলা আছে। বড় খেলা। ওই যে ইন্টার ইন্‌ভার্সিটি ফুটবল—

শশধর ॥ যা বলতে পার না তা বলতে যেও না, ইণ্টার ইউনিভার্সিটি ফুটবল ফাইনাল। ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডে বম্বের সঙ্গে।

গোপাল ॥ তাই নাকি, আমি জানতাম না তো!

শশধর ॥ ন্যাকা! জানতাম না তো, আজ সব কাগজে ব্যাটার ছবি বেরিয়েছে ব্যাটা ক্যাপটেন। মুখ্যু কোথাকার!

গোপাল ॥ ওহে শশধর, এক মিনিট! তুমি বোধহয় খবরটা শোননি?

শশধর ॥ খবর, কিসের খবর? খবর তো আজ একটাই, ব্যাটার খেলা।

গোপাল ॥ এইমাত্র দুপুরের খবরে রেডিওতে বলল—ক্যালকাটা গ্রাউণ্ড বোমায় উড়িয়েছে।

শশধর ॥ ওফ্ অপদার্থ! ফিরে এসে আমি তোমার মাথা ওড়াব।

গোপাল ॥ হাঃ হাঃ হাঃ—তুমি একটা গাড়ল শশধর।

শশধর ॥ ত্মাথ গোপাল, সব সময় ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না। আজ এই খেলাটা আমার কাছে গর্বের—আর সেই জন্যে তোমার হিংসে হচ্ছে!

গোপাল ॥ এর উত্তর পরে দেবো।

শশধর ॥ উত্তর কি দেবে তুমি! যাও বাড়ী গিয়ে রীলে শোন। উত্তর সেখানে পাবে। (চলে যায়। গোপালও হাসতে হাসতে ওদের পেছনে যায়)

[আলো এবার এসে পড়ে ডান দিকে। গোপালবাবুর অফিস, রাস্তা দিয়ে মোটর গাড়ীর আওয়াজ পাওয়া যায়। বড় সুশান্ত অফিসে বসে খবরের কাগজ দেখছে। টেবিলের ওপর একটা ব্যাগ। আর একটা টেনিস র‍্যাকেট। [বড় সুশান্তকে খুবই নম্র ও ভদ্র দেখতে।]

শশধর ॥ [নেপথ্যে] কোথায় গেল গোপাল ? উত্তর দেবে বলেছিলে ; উত্তর পেয়েছ, তিন তিনটে গোল, সব কটা ব্যাটা দিল, বাবা চাঁদু। কি বলবে এবার বল ? [গোপালবাবুর অফিসের কর্মচারী বোস ছুটে আসে।]

বোস ॥ স্যার, আপনি একবার আসুন। আমরা কাজ করতে পারছি না।

সুশান্ত ॥ কেন ? কিসের গোলমাল হচ্ছে ওখানে !

বোস ॥ বড় সাহেবের সেই পাগল বন্ধুটা এসেছে। এসেই চিৎকার করতে শুরু করেছে।

সুশান্ত ॥ শশধর কাকা! তাই নাকি। ভবিষ্যতে ওঁর সম্বন্ধে ভদ্রভাবে কথা বলবেন। আপনারা কি ওঁকে বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

বোস ॥ না স্যার। ওঁকে দেখেই আমরা একেবারে পাথরের মত হয়ে গেলাম। কিন্তু উনি তাতেও ছাড়ছেন না—একাই চালিয়ে যাচ্ছেন।

সুশান্ত ॥ ঠিক আছে। ঠিক আছে। আপনি যান গিয়ে ওঁকে এঘরে পাঠিয়ে দিন।

[বোস বেরিয়ে যাওয়ার আগেই শশধর ওকে ঠেলে ঘরে ঢোকে।]

শশধর ॥ কি হে ? খুব যে বলেছিলে— (সুশান্তকে দেখেই থেমে যায়, বাস্তব অবস্থায় ফিরে আসে।]

সুশান্ত ॥ আসুন, শশধর কাকা।

শশধর ॥ ওঃ সুশান্ত, তুমি এখানে ? তুমি কি এখানে আজকাল কাজ করছ ?

সুশান্ত ॥ না কাকা। একটু বিশেষ দরকারে এখানে এসেছি, আজই দিল্লী যাচ্ছি।

শশধর ॥ দি—ল্লী যা—চ্ছ ! গোপাল কি এখানে নেই ?

সুশান্ত ॥ না, আছেন। একটু দরকারে বেরিয়েছেন। আপনি বসুন।

শশধর ॥ (বসে) তুমি দিল্লী যাচ্ছ কেন ?

সুশান্ত ॥ এই একটু কাজ।

শশধর ॥ ওঃ ! (টেবিলে টেনিস র‍্যাকেট দেখে) টেনিস খেলতে যাচ্ছ ?

সুশান্ত ॥ না, আমি যেখানে উঠব তাদের বাড়ীতে টেনিস লন আছে।

শশধর ॥ বাড়ীতে টেনিস লন ! খুব বড় বাড়ী, বড়লোক !

সুশান্ত ॥ বেশ বড়লোক ; আমারই এক বন্ধু।

শশধর ॥ তোমার অনেক বড়লোক বন্ধু আছে ?

সুশান্ত ॥ এই, জনকয়েক আছে।

শশধর ॥ বেশ, বেশ, খুব ভাল, খুব ভাল। (চুপচাপ)

সুশান্ত ॥ বিবেক কেমন আছে ?

শশধর ॥ ভাল আছে, বিরাট ব্যবসা করছে !

সুশান্ত ॥ তাই নাকি ? কিসের ব্যবসা ?

শশধর ॥ ও—ও—আসামে মস্ত কারবার করছিল। কাঠের কারবার। কিন্তু ব্যাটা এবার কলকাতায় কাজ করবে ঠিক করেছে। আমাকে ছাড়া যে থাকতে পারে না। শুনলাম তোমার নাকি একটা ছেলে হয়েছে ?

সুশান্ত ॥ হঁ্যা। আরেকটি।

শশধর ॥ তোমার কি দুই ছেলে ? ওদের তুমি কি করবে ?

সুশান্ত ॥ (হাসে) বিবেক এখানে কিসের ব্যবসা করবে।

শশধর ॥ বিরাট একটা কিছু করবে নিশ্চয়ই, জানইতো ছোট করে ও কোনদিন কিছু করতে পারে না। আজই তো গ্র্যাণ্ডে এই ব্যাপারে ডিনারপার্টি আছে। আমি ত যাব। গণেশপ্রসাদ—ওই যে যার বিরাট স্পোর্টস গুডস্‌ের কারবার—তোমাদের সঙ্গেই ত পড়ত—সেই বড় ব্যাটাকে খুব ধরেছে। ওর সঙ্গে পার্টনারশিপের জন্য। (থেমে) তোমার বন্ধুর বাড়ীতে তাহলে টেনিস লন আছে।

সুশান্ত ॥ আপনি ওই ওষুধ কোম্পানীতেই আছেন ?

শশধর ॥ তোমায় দেখে আমার খুব ভাল লাগল সুশান্ত। তুমি খুব ভাল ছেলে হয়েছ। তোমার মত ছেলেই তো চাই—তোমার মত ছেলে—তোমার মত ছেলে—সুশান্ত !

সুশান্ত ॥ কি হ'ল শশধর কাকা ?

শশধর ॥ কোন পুণ্যে এমন হয় ?

সুশান্ত ॥ কি হয় ?

শশধর ॥ তোমার মত ছেলে। ও কেন হ'তে পারল না ?

সুশান্ত ॥ কে—কি হতে পারল না ?

শশধর ॥ বড় ব্যাটা—বড় ব্যাটা কেন এমন হয়ে গেল ?

সুশান্ত ॥ ওঃ। বিবেক—

শশধর ॥ হঁ্যা, বাবা। ও যে সেই ইণ্টার য়ুনিভার্সিটি খেলেই ফুরিয়ে গেলো। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আর কোন বড় কাজ করতে পারল না।

কিন্তু কেন? তুমি তো ওর বন্ধু। ছোট থেকে একসঙ্গে বড় হয়েছ। তুমি আমায় বলতে পার—কেন এমন হ'ল? ওই রকম একটা ছেলে কি করে ওই বয়েসে থেমে গেল?

সুশান্ত ॥ (আন্তরিক দুঃখের সঙ্গে) ও যে কোনদিন কোন কিছু মন দিয়ে করল না।

শশধর ॥ না না। ও চেষ্টা করেছে। আই. এস. সি ফেল করার পরও কত কিছু করার চেষ্টা করল—রেডিও ইঞ্জিনীয়ারিং, রেফ্রিজারেশন কিন্তু কোথাও সুবিধে করতে পারল না। কিন্তু কেন?

সুশান্ত ॥ (চোখ থেকে চশমা খুলে গম্ভীর গলায়) শশধর কাকা, আপনি কি খোলাখুলি আলাপ করতে চান?

শশধর ॥ (খুব আগ্রহ ভরে) হ্যাঁ বাবা, তুমি খুব ভাল ছেলে, তুমি আমায় একটু পরামর্শ দাও।

সুশান্ত ॥ আমি আর আপনাকে কি পরামর্শ দেব? সে যোগ্যতা আমার নেই। তবে—একটা কথা আমি কোনদিন বুঝে উঠতে পারলাম না। একবার পরীক্ষায় ফেল করেই ও কেন পড়া ছেড়ে দিল? আর একবার তো পরীক্ষা দিতে পারত।

শশধর ॥ আমি ওকে অনেক বলেছি বাবা—কিন্তু ওর ওই এক গোঁ। হয় চাকরী করবে নয় অন্য কিছু। আর এই নিয়ে যতবার জোর করতে গেছি—বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে। আমায় যে মোটে মানল না।

সুশান্ত ॥ ভাল কথায় বোঝালে হয়ত কাজ হত।

শশধর ॥ ভাল কথা! আমি ওর পা অবধি ধরতে গেছি—কিন্তু তাতেও কিছু হল না।

সুশান্ত ॥ তবে বিবেক কেন এরকম করল?

শশধর ॥ (ভগ্ন স্বরে) কপাল, কপাল সবই কপাল, বাবা। তাই যদি না হবে তবে আমার এরকম কপাল হল কেন? (কপালে করাঘাত করতে করতে) কিন্তু কেন? কেন? কেন?

সুশান্ত ॥ আঃ, শশধর কাকা, এরকম ভেঙ্গে পড়লে কথা বলব কি করে? একটু স্থির হ'ন।

শশধর ॥ না—না তুমিই বল—ও যে পরীক্ষায় ফেল করল সে কি আমার দোষ?

আমার যেন সময় সময় মনে হয় আমিই এমন একটা কিছু করেছি যার জন্যে ও—

সুশান্ত ॥ শশধর কাকা। আপনি—

শশধর ॥ না—না, তুমি বল পরীক্ষায় কি কেউ ফেল করে না?

সুশান্ত ॥ (অতীত স্মৃতি মনে করতে করতে) আমার মনে আছে, জুন মাসে আমাদের রেজাল্ট বের হয়েছিল—বিবেক পাশ করতে পারেনি—mathematics-এ ফেল করেছিল—

শশধর ॥ হতচ্ছাড়া, অপদার্থ, গবেট—

সুশান্ত ॥ কিন্তু, আমার পরিষ্কার মনে আছে, ও আর একবার পরীক্ষা দেবে বলে ঠিক করেছিল।

শশধর ॥ কি করেছিল?

সুশান্ত ॥ পরীক্ষা দেবে বলে ঠিক করেছিল।

শশধর ॥ ঠি-ক ক-রে-ছি-ল!

সুশান্ত ॥ নিশ্চয়ই। অবশ্য খুব ভেঙ্গে পড়েছিল। কিন্তু আমায় বলেছিল—"রি—এগজামিন করাব, বাপিকে দরকার। তাতেও যদি না হয়—দেখিস সামনের বার ঠিক পাশ করব।" আপনি তখন ট্যুরে ছিলেন—বোধহয় পাটনায়। বিবেক তো আপনার সঙ্গে দেখা করতে পাটনায় গিয়েছিল। তারপর কি হ'ল? (শশধর শূন্যদৃষ্টিতে সুশান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।) শশধর কাকা!

শশধর ॥ (বেশ একটু সামলে নিয়ে) হ্যাঁ, ওর সঙ্গে আমার পাটনায় দেখা হয়েছিল—কিন্তু ওতো থাকেনি—ওই দিনই চলে এসেছিল।

সুশান্ত ॥ কিন্তু ও তো ক'লকাতায় আসেনি।

শশধর ॥ এঁ্যা!

সুশান্ত ॥ আমার পরিষ্কার মনে আছে। কাকীমা আপনাদের কোন খবর না পেয়ে অনেকগুলো চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনটার উত্তর পান নি। আমরা সবাই খুব চিন্তিত ছিলাম। তারপর মাস তিনেক বাদে হঠাৎ একদিন বিবেককে বাড়ী ঢুকতে দেখলাম। ওকে কি রকম অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। আমার কোন কথার জবাব দিল না। বাড়ী এসেই ওর সমস্ত সার্টিফিকেট, ব্লেজার, খেলার জিনিসপত্র এক জায়গায় করে আগুন ধরিয়ে দিল। (শশধরের মুখটা বিকৃত হয়ে যায়।) কাকীমা

বাড়ী ছিলেন না—আমি সাধ্যমত বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। পাটনায়—কি—হয়েছিল? পাটনায় কি হয়েছিল? (শশধর এবারও কোন উত্তর দেয় না।) আপনি তুল্লেন বলেই আমি এত কথা বল্লাম।

শশধর॥ (রেগে) কিছু হয় নি। "কি হয়েছিল"—এ কথার কোন মানে হয়?

সুশান্ত॥ শশধর কাকা, আপনি রেগে যাচ্ছেন?

শশধর॥ তুমি কি বলতে চাও—সব দোষ আমার? একটা অপদার্থ ছেলে যদি পাশ করতে না পারে—সে দোষ তার বাপের?

সুশান্ত॥ না কাকা, আমি তা বলতে চাইনি—

শশধর॥ বলতে চাওনি মানে? তবে বল্লে কেন—"কি হয়েছিল।"

[গোপাল সান্যাল ঢোকে। হাতে একটা প্যাকেট।]

গোপাল॥ এই নে। এই প্যাকেটটা দিল্লীর ম্যানেজারকে দিবি। (শশধরের দিকে চেয়ে একটু হাসে।) তোর তো প্লেনের সময় হয়ে এল।

সুশান্ত॥ (ঘড়ি দেখে) হ্যাঁ, বাবা। (প্যাকেটটা নিয়ে ফোলিওর মধ্যে রেখে উঠে দাঁড়ায়।) শশধর কাকা, আপনি এ নিয়ে বেশি ভাববেন না। আপনি তো জানেনই—প্রথমেই যদি আপনি সফল না হ'ন—

শশধর॥ হ্যাঁ, বাবা, ওটা আমি মানি।

সুশান্ত॥ কিন্তু সময় সময় নির্বিকার থাকা ভাল।

শশধর॥ নির্বিকার?

সুশান্ত॥ হ্যাঁ।

শশধর॥ কিন্তু তা যদি থাকতে না পারি?

সুশান্ত॥ তাহলে দুঃখ এড়াবার আর উপায় নেই। আচ্ছা, আজ তাহলে আসি।

শশধর॥ এসো, বাবা, এসো।

গোপাল॥ (সুশান্তর কাঁধে হাত দিয়ে) জান শশধর। সুশান্ত আজ দিল্লী যাচ্ছে। পরশু সুপ্রীম কোর্টে ওকে একটা মামলা লড়তে হবে।

সুশান্ত॥ (অনুচ্চ কণ্ঠে) বাবা!

শশধর॥ সুপ্রীম কোর্ট! (অবাক হয়ে সুশান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে)

সুশান্ত ॥ আর দেরি করব না। আমি আসি—

গোপাল ॥ ঠিক আছে। তুই যা, আর পৌছেই চিঠি দিস, নইলে তোর মা আবার ভাববে—

[সুশান্ত প্রথমে গোপাল পরে শশধরকে প্রণাম করে চলে যায়।]

শশধর ॥ (সুশান্তর যাওয়া দেখে।) সুপ্রীম কোর্ট! অথচ ও আমাকে একবারও বল্ল না।

গোপাল ॥ এতে আর বলার কি আছে। ও আজকাল প্রায় ওখানে থাকে।

[দু'জনে চেয়ারে বসে।]

শশধর ॥ তাই নাকি। বেশ, বেশ। (থেমে) আচ্ছা তুমি তো ওকে বলে দাও না কি করতে হবে। আসলে ওর ব্যাপারে তুমি কোনদিনই খুব একটা ইণ্টারেস্ট নাওনি।

গোপাল ॥ (পকেট থেকে এক তাড়া নোট বের করতে করতে) খুব একটা ইণ্টারেস্ট আমি কোনদিন কোন ব্যাপারে নিই না। ব্যাঙ্কে গিয়েছিলাম।

শশধর ॥ গোপাল শোন……(খুব কষ্ট করে) আমাকে প্রিমিয়াম দিতে হবে। তোমার যদি অসুবিধে না হয় তবে আমাকে—শ'দেড়েক টাকা দেবে। (গোপাল একমুহূর্ত কোন উত্তর দেয় না।) আমি ব্যাঙ্ক থেকে তুলতে পারতাম কিন্তু গিন্নী টের পাবে তাই—

গোপাল ॥ একটু বস।

শশধর ॥ আমি সমস্ত টাকার হিসেব রাখছি। তোমার সব টাকা আমি শোধ করে দেব।

গোপাল ॥ শশধর। তুমি আমার একটা কথা শোন—

শশধর ॥ আমি জানি গোপাল, তুমি কি বলবে!

গোপাল ॥ (টেবিলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়।) এ তুমি কি শুরু করেছ? দু'দিন পর সবাই যে তোমায় পাগল বলবে।

শশধর ॥ কেন? আমি তো—

গোপাল ॥ শোন, শোন, আমি তোমায় একটা চাকরী দিতে চাইলাম। মাসে শ' পাঁচেক টাকা তোমার আসত, কিন্তু তুমি নিলে না। নিলে কিন্তু তোমায় এভাবে ঘুরে বেড়াতে হত না।

শশধর ॥ কিন্তু আমি তো চাকরী করছি।

গোপাল ॥ হ্যাঁ, মাইনে ছাড়া? বিনি মাইনের চাকরীকে কেউ চাকরী বলে না। শোন, বেশি বাড়াবাড়ি ভাল নয়। আমি তোমার বন্ধু, তোমার প্রতিবেশী, আমি তোমার সব খবর রাখি। আর আমারও নিজের একটা মান অপমান জ্ঞান আছে।

শশধর ॥ কেন! আমি কি তোমায় অপমান করেছি? তাহলে না হয় আমি মাফ্—

গোপাল ॥ তুমি আমার এখানে কাজ করতে চাইছ না কেন?

শশধর ॥ তুমি সেই এক কথা বলে যাচ্ছ। আমি তো তোমায় বল্লাম আমি করছি।

গোপাল ॥ তাহলে, আমার অফিসে তুমি এত ঘন ঘন আস কেন?

শশধর ॥ ওঃ! এই ব্যাপার। আজ টাকা চেয়েছি বলে! দেবে না বলে দিলেই হতো—নিজের জায়গায় পেয়ে খুব জুতো মারলে—(চলে যাওয়ার উদ্যোগ করে।)

গোপাল ॥ আমি শুধু তোমাকে আমার এখানে কাজ করতে বলেছি।

শশধর ॥ (ফিরে দাঁড়িয়ে) শশধর সামন্ত করবে তোমার এখানে কাজ? ফুঃ!

গোপাল ॥ তোমার মাথায় কি আছে? গোবর?

শশধর ॥ (হিংস্রভাবে গোপালের দিকে অগ্রসর হয়।) কি বল্লে? আমার মাথায় গোবর আছে? আজ টাকা করেছ বলে কি আমার মাথা কিনেছ? (চুপচাপ)

গোপাল ॥ (নীরবতা ভঙ্গ করে।) তোমার কত চাই বল্লে—দেড় শ?

শশধর ॥ (একেবারে ভেঙ্গে পড়ে) আমি হেরে গেছি, গোপাল। সব জায়গায় আমি হেরে গেছি—আজ আমার চাকরী গেছে।

গোপাল ॥ সেকি, ভোলা তোমায় ছাড়িয়ে দিয়েছে?

শশধর ॥ হ্যাঁ, সে কুলাঙ্গারটা! নামটা আবার আমি দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম হবে শিব, হল বাঁদর।

গোপাল ॥ ছাখো শশধর, যা ভাবা যায় সব সময় তা হয় না। মনকে আগের থেকে প্রস্তুত করে রাখলে আঘাত কম লাগে। ভোলাদের কাছে এ সব সেন্টিমেন্টের কোন দাম নেই। তুমি একজন সেলস্‌ম্যান, মানুষ চিনতে তোমার এত দেরি হয় কেন?

শশধর ॥ গোপাল, আমি জীবনে কাউকে কোনদিন কষ্ট দিইনি। অন্তত

জ্ঞানতঃ আমি কখনও কারুর ক্ষতি করিনি। তবু লোকে আমার শত্রুতা করে কেন ?

গোপাল॥ শশধর, তুমি তো তুমি। পৃথিবীর সবচেয়ে মহৎ লোকেরও শত্রু থাকে। এবার তুমি আমার কথা শোন। আমি জানি তুমি আমায় বিশেষ পছন্দ কর না, আর আমারও তোমাকে খুব একটা ভাল লাগে না। তবু তোমায় আমি মোটামুটি একটা চাকরী দিতে পারি—আর তাতে ধর আমাদের দুজনেরই উপকার হবে। (চুপচাপ) কই, কিছু বল ?

শশধর॥ আমি তোমার এখানে চাকরী করতে পারব না।

গোপাল॥ কেন—হিংসেয়।

শশধর॥ (বিকটভাবে) আমি তোমার এখানে চাকরী করতে পারব না। ব্যস ! এর বেশি আমায় কিছু জিজ্ঞেস কর না।

গোপাল॥ (রেগে) ঠিক আছে। আজও যখন বুঝলে না তখন তোমার কপালে অশেষ দুর্গতি আছে। এই নাও তোমার প্রিমিয়ামের টাকা।

শশধর॥ তোমার কাছ থেকে যা নিয়েছি, টু দি পাই ফেরত দিয়ে দেব।

গোপাল॥ ঠিক আছে, দিও। এবার তুমি বাড়ী যাও। সাবধানে যেও।

শশধর॥ (যেতে যেতে দাঁড়িয়ে যায়।) একটা মজা, জান গোপাল, জীবনের হাজার হাজার চড়াই উতড়াই পার হয়ে, নানাজনের সঙ্গে নানা সম্পর্ক তৈরী করে জীবনের শেষ সীমায় এসে দেখছি আমি নির্বান্ধব নিঃস্ব। এখন আমি প্রতি মুহূর্তে আমার মৃত্যু কামনা করছি।

গোপাল॥ শশধর, এ পৃথিবীতে যার সবচেয়ে বেশি টাকা, সবচেয়ে বেশি বন্ধু, তাকেও জীবনের কোন না কোন সময়ে আন্তরিকভাবে মৃত্যু কামনা করতে হয়। আশা করি, তুমি আমার কথা বুঝতে পেরেছো।

[শশধর নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, স্বপ্ন দেখছে] শশধর !!

শশধর॥ এ্যাঁ। ওঃ গোপাল। গোপাল তুমি ভাই—সুশান্তর কাছে আমার হয়ে মাফ চেয়ে নিও। আমি ওকে আঘাত দিয়েছি। ও বড় ভাল ছেলে। বড় ভাল ছেলে। সংসারে কত ভাল ছেলে আছে, প্রত্যেকেই বড় হয়, প্রতিষ্ঠিত হয় তারা, সবাই একসঙ্গে টেনিস খেলে। গোপাল, বড় ব্যাটা আজ গণেশের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে, যদি কোন কাজ না হয় ?

গোপাল ॥ (আন্তরিকভাবে) কেন হবে না। নিশ্চয় হবে।

শশধর ॥ (প্রায় কেঁদে ফেলে) তুমিই শেষ পর্যন্ত আমার সত্যিকারের বন্ধু রইলে, আশ্চর্য ! (টলতে টলতে চলে যায়।)

গোপাল ॥ ভগবান ! লোকটাকে একটু শান্তি দাও !

[গোপাল শশধরের প্রস্থানপথে এগিয়ে যায়। সব অন্ধকার হয়ে যায়। ওপন এয়ার রেষ্টুরেণ্ট। উদ্দাম সঙ্গীত। স্বপ্নালী আলো আবেশ সৃষ্টি করে। ফটিক দোকানের বেয়ারা, একটা টেবিল বয়ে নিয়ে আসে, পেছনে নব, হাতে দুটো ফোল্ডিং চেয়ার।]

ফটিক ॥ ঠিক আছে নববাবু ; আপনি যা বল্লেন আমার মনে থাকবে।

[পেছন ফিরে চেয়ার নিয়ে রাখে।]

নব ॥ (চারদিকে চেয়ে দেখে।) এই জায়গাটা ঠিক আছে।

ফটিক ॥ এটা চমৎকার জায়গা। দেখবেন কোন গোলমাল নেই। বাড়ীর লোকজন নিয়ে এলে এই রকম জায়গায় বসতে হয়। অনেকে আবার আলাদা বসতে ভালবাসেন না। তারা এসে সবার মাঝখানে বসবেন। পেটে পড়লে এক একজন এক একরকম করে কি না! তাদের আবার ওই দেখায় আনন্দ। আপনি কিন্তু একটু আলাদা আলাদা থাকতে পছন্দ করেন। আমি সবাইকে লক্ষ্য করি।

নব ॥ তোর তাহলে সময় ভালই কাটে, কি বল ?

ফটিক ॥ কোথায় ভাল ? এ আবার একটা জীবন না কি ? কুকুরেও এর চেয়ে ভাল থাকে। মাঝে মাঝে মনে হয় যুদ্ধে চলে যাই। সৈন্যদলে কত লোক নিচ্ছে। প্রথমেই চলে গেলে এত দিনে মরে শান্তি পেতাম।

নব ॥ সে কিরে ফটিক, নেশা করেছিস না কি ? না গন্ধে গন্ধে এরকম হয়েছে !

ফটিক ॥ আমরা এ জিনিস কোথায় পাব ? আমরা হলাম চিনির বলদ।

নব ॥ থাম্, আর কাব্যি করিস না। কিছু নিয়ে আয় দিকি চট করে। বাবা আসার আগে আহ্নিকটা সেরে নিই। ওঃ হ্যাঁ। ফ্রায়েড প্রণ ভাল হবে তো !

ফটিক ॥ খুব ভাল হবে বাবু। আপনাকে কোনদিন খারাপ দিয়েছি ! আমরা লোক চিনি বাবু।

নব ॥ গ্যাস দিচ্ছিল। যা যা চট করে একটা ডবল ডিপ্লোম্যাট নিয়ে আয়। কিরে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে?

ফটিক ॥ এক সঙ্গে ডবল!

নব ॥ তোর কি? তোর বাপের পয়সায় খাচ্ছি? ঘাঁটাসনে ফটিক। তাড়াতাড়ি নিয়ে আয়। শালা, চারদিকে মালের গন্ধ পাচ্ছি আর শালা নিজের টেবিল ফাঁকা! জলদি কর।

[ফটিক হাসতে হাসতে চলে যায়। রেষ্টুরেণ্টে উদ্দাম সঙ্গীত জোর হয়ে উঠে। নব তালে তালে মাথা নাড়তে থাকে। ফটিক একটা গেলাসে করে খানিকটা হুইস্কি আর সোডা নিয়ে আসে। পকেট থেকে বটল ওপনার দিয়ে সোডা খুলে গেলাসে খানিকটা ঢেলে দেয়। নব তাড়াতাড়ি নিয়ে একটান লম্বা চুমুক মারে।]

নব ॥ মাণিক আমার। যুগ যুগ জিও। মাঝে মাঝে তোকে আমার এত ভাল লাগে। তোর টানেই আমি আর অন্য জায়গায় যেতে পারি না।

ফটিক ॥ কেন বাবু মন খারাপ করছেন?

নব ॥ মন খারাপ কিরে? আমি তো তোকে ভাল কথা বলছি?

ফটিক ॥ সেই জন্যেই তো বলছি বাবু। আমি দেখেছি বাবুদের যেদিন যত মন খারাপ থাকে সেই দিন পেটে খানিকটা গেলেই আমায় মিষ্টি কথা বলতে থাকেন।

নব ॥ যা-চ্চলে। তুই শেষে আমায় বাবু ঠাউরালি! আমি তোর মত আপনার লোক।

ফটিক ॥ নিশ্চয় বাবু—আপনার মত মেজাজি লোক দেখা যায় না।

নব ॥ (একটা লম্বা চুমুক দিয়ে) তবে—আজ যদি দাদা ভাল খবর নিয়ে আসে, তোকে পাঁচ টাকা বকশিস দিয়ে দেব। আর শোন, বাবার সামনে কারণ বারির নাম মুখে আনবি না, আর—যদি দেখিস বাবা বিলটা দিয়ে দিচ্ছে, তবে এটার দামটাও ঢুকিয়ে দিবি, বুঝলি? মালটালের কথা লিখিস না।

ফটিক ॥ বুঝেছি বাবু। আজ এখানে আপনাদের জোর খাওয়া হবে?

নব ॥ না রে, এই ছোটখাট। দাদা আজ একটা মস্ত ব্যবসাদারের সঙ্গে কথা বলে আসবে। যদি প্ল্যান মত কাজ হয়, তবে মাসে বহু টাকা ঘরে আসবে।

ফটিক ॥ খুব ভাল হবে বাবু। আপনারা দু'ভায়ে ব্যবসা করবেন, খুব ভাল হবে। বাবু, আমাকেও ঢুকিয়ে নিন না—আপনাদের ব্যবসায়।

নব ॥ আমিও তাই ভাবছিলাম। তুই ছেলেটা বেশ চালাকচতুর আছিস।

ফটিক ॥ এখানকার কাজের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে। কোনরকমে একবার ছাড়তে পারলে বেঁচে যাই, নয় ত—

নব ॥ শ্‌ শপ্‌!

ফটিক ॥ কি হল? (হাত দিয়ে ফটিককে একপাশে সরিয়ে দেয়।)

[পেছন দিকে একটি মেয়েকে ঘুরতে দেখা যায়। সমস্ত জামাকাপড় টক্‌টকে লাল রং-এর।]

নব ॥ ডা—ডা—ডারলিং, আই-আই-আই লাভয়ু—কে র‍্যা?

ফটিক ॥ কি জানি, কাল থেকে এখানে দেখছি।

নব ॥ শালা! এ সব খবর আগে দিবি তো। তুই শালা এক নম্বরের—যা দিকি, গিয়ে বল আমি ডাকছি—মনে হচ্ছে বেওয়ারিশ মাল। জলদি কর, আর কেউ ডেকে নেবে। [ফটিক মেয়েটির দিকে যায়। মেয়েটিকে কি যেন বলে নবকে দেখায়। নব জামার কলারটা ঠিক করে নেয়। মেয়েটিকে নবর দিকে আসতে দেখা যায়। নব একটু ভালভাবে ঘুছিয়ে বসে তারপর মেয়েটি কাছাকাছি আসতে উঠে দাঁড়ায়। মেয়েটি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নবর দিকে তাকিয়ে থাকে।] বসুন ম্যাডাম, আপনাকে আমার খুব চেনা মনে হল, তাই সাহস করে ডেকে ফেল্লাম। কিছু মনে করেন নি তো?

শতমিতা ॥ নাঃ। মনে করব কেন? কিন্তু আমি তো আপনাকে চিনতে পারছি না। আপনি আমায় কোথায় দেখেছেন বলুন তো?

নব ॥ সেটাই তো মনে করতে পারছি না। আপনি আমায় আগে কখনও দেখেন নি।

শতমিতা ॥ আমি? কই না ত?

নব ॥ তবে যে আমার আপনাকে এত চেনা মনে হল? বসুন না!

শতমিতা ॥ (একটু ইতস্তত করে বসে) আমার একজনের সঙ্গে এখানে দেখা হওয়ার কথা ছিল।

নব ॥ বেশ তো। যার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা, সে এলেই দেখা হবে।

আমি তো আর আপনাকে ভ্যানিস করে দিচ্ছি না। আপনার নিজের দিক থেকে কোন বাধা নেই তো?

শতমিতা॥ না না। বাধা কিসের?

নব॥ বাঃ। এই তো চাই। এবার বলুন কি খাবেন—ঠাণ্ডা না গরম?

শতমিতা॥ আমি! ঠাণ্ডা।

নব॥ সেই ভাল। আমারও বেশ একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাল লাগে। এই ফটকে! [ফটিককে দেখা যায়। প্রবল উৎসাহে বলে 'একটা ঠাণ্ডা'] ম্যাডাম্। যদি কিছু মনে না করেন—তবে আপনার নামটা জানতে পারি?

শতমিতা॥ আমার নাম শতমিতা পুরোকায়স্থ।

নব॥ বাঃ। বেড়ে নাম তো আপনার। রীতিমত জাঁকিয়ে বলার মত। আমার নাম নবকুমার সামন্ত। এন্‌জিনীয়ার।

শতমিতা॥ সামন্ত। তাই নাকি?

নব॥ সামন্ত শুনে যেন একটু ভেব্‌ড়ে গেলেন মনে হল?

শতমিতা॥ না—তা কেন হবে।

নব॥ আপনি কি করেন—স্টুডেণ্ট?

শতমিতা॥ না, ও পাট বহুদিন মিটে গেছে। ফিল্মে একটু আধটু চেষ্টা করছি।

নব॥ ফিল্মে? ওঃ! না—,তা কেন হবে।

[দুজনেই হেসে ওঠে। ফটিক একটা গ্লাসে অরেঞ্জ নিয়ে আসে। টেবিলে রেখে চলে যায়। বিবেক ঢোকে। ধীরে ধীরে ওদের দিকে আসে। নব বিবেককে আসতে দেখে বেশ কায়দা মাফিক ওঠে দাঁড়িয়ে আলাপ করতে যায়।]

এই আমার দাদা—বিবেকানন্দ সামন্ত।

শতমিতা॥ (এক গাল হেসে) এসেছ?

বিবেক॥ আরে চুমকি? এখানে কি ব্যাপার? (নবর দিকে চেয়ে) তোদের মধ্যে আলাপ আছে নাকি?

[চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে। উদ্দাম সঙ্গীত আবার জোর হয়ে ওঠে।]

শতমিতা॥ না। তোমার খোঁজে এসেছি; গতকালও এসেছিলাম। তা’ আমি আসার পর উনি একটু আলাপ করতে চাইছিলেন।

বিবেক॥ খবরদার নব! এদিকে নজর দিসনি। এ তোর গুরুজন। (ফটিককে দেখতে পেয়ে) আরে ফটিক, আর একটা চেয়ার দিয়ে যা।

নব॥ (তাড়াতাড়ি নিজের চেয়ার ছেড়ে দেয়।) দাদা, তুই বস।

বিবেক॥ নারে, ঠিক আছে। (ফটিক এসে আর একটা চেয়ার দিয়ে যায়। শতমিতার কাছাকাছি টেনে নিয়ে বসে।) কাল রাতে তোকে যার কথা বলেছিলাম—চুম্‌কি।

শতমিতা॥ ধেৎ অসভ্য! নামটা ওঁকে বলে দিয়েছ?

বিবেক॥ তাতে কি হয়েছে? ঘরের লোকতো জানবেই। তারপর বল?

শতমিতা॥ তোমার খবর কি? কাল এখানে আসনি কেন? একা একা এই অচেনা জায়গায় কি রকম লাগে বলতো? ভয় করে না বুঝি?

বিবেক॥ ভয়ের কি আছে? একমনে ডাকবে আমি এসে যাব।

শতমিতা॥ এই অসভ্য, আবার! (ইঙ্গিতে নবকে দেখায়।)

নব॥ মা তারা আনন্দময়ী, মা তারা! মা তারা আনন্দময়ী, মা তারা!

[সবাই একসঙ্গে হেসে ওঠে।]

বিবেক॥ এই শোন, ছটার সময়—কই থাও! ছ’টার সময় বাবার আসার কথা আছে। আজ একটা ব্যাপারে আমরা এখানে চা খাব।

শতমিতা॥ তা হলে?

বিবেক॥ কি করি বলতো? মানে—বাবা যদি হঠাৎ তোমায় দেখে অন্য কিছু ভেবে বসে থাকেন—তাই বলছি—

শতমিতা॥ আজ তা’হলে বরং আমি চলে যাই—কেমন?

বিবেক॥ সেটা কি রকম দেখাবে না? মানে তুমি আসবে আমি জানতাম না তো!

শতমিতা॥ তাতে কি হয়েছে—ওরকম কিন্তু কিন্তু করছ কেন? (গ্লাসটাতে একটা চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। হাসিমুখে তাকায়।]

নব॥ এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি।

বিবেক॥ কি?

নব॥ (শতমিতাকে) আপনি বুঝতে পারেন নি?

শতমিতা॥ (একটু ঘাবড়ে গিয়ে) আমি? কই না ত? কি?

নব ॥ এই জন্যেই গোড়াতে আপনাকে এত চেনা মনে হচ্ছিল—তাই না বৌদি ?

শতমিতা ॥ (গাল লাল হয়ে উঠে) আচ্ছা, আমি আসি।

বিবেক ॥ এই, কিছু মনে করলে না তো ? শোন, কাল এখানে এস, কেমন ?

শতমিতা ॥ কাল ? কখন ?

বিবেক ॥ ছ'টার সময়ে ? কেমন ?

শতমিতা ॥ বেশ তুমি থেকো কিন্তু। (চলে যায়)

[নব চট করে বিবেকের পায়ের ধুলো নেয়।]

বিবেক ॥ জ্বালাসনি ছোট। আসল জায়গায় কিছু হতে চায় না আর এদের পাল্লায়—

নব ॥ কি করবি বল ? তোর হ'ল মেয়ে কপাল।

বিবেক ॥ এ সব কথা বাদ দে ছোট, শোন, তোকে আমার কিছু বলার আছে।

নব ॥ তার আগে, একটু করে হোক না।

বিবেক ॥ এখন। (ঘড়ির দিকে তাকিয়ে।) বাবা আসার প্রায় সময় হয়ে গেছে (চারিদিকে চেয়ে) তা হোক একটু করে।

নব ॥ [ফটিককে] এই ফটিক, দু'টো ডবল। তারপর—গণেশ তোকে দেখে খুব অবাক হয়ে গেছে, নিশ্চয়।

বিবেক ॥ শোন, আমি বাবাকে গোটাকতক কথা বলতে চাই, আর তাতে তোর সাহায্যের খুব দরকার।

নব ॥ তোর আবার কি হল ?

বিবেক ॥ একটা সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে গেছে। আমি এখনও বুঝতে পারছি না কি করে হল। আমি একদম বেকুব হয়ে গেছি।

নব ॥ সে কি রে ? কোন মেয়ে তোকে অপমান করেছে ? কোন মেয়ে ? তার ঠিকানা বল !

[ফটিক গ্লাসে করে দু'পাত্র আনে, সঙ্গে মদের বোতল। গ্লাস রেখে সোডা ঢেলে দেয়।]

বিবেক ॥ আমি প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে গণেশের জন্যে অপেক্ষা করেছি প্রায় সমস্তদিন। তিন চারবার দেখা করার জন্যে তাগাদা মারলাম। ওর স্টেনোকে কত দিলাম, কিন্তু কিছু হলো না।

নব ॥ তুই নিশ্চয় ঘাবড়ে গিয়েছিলি (লম্বা চুমুক দেয়)

বিবেক ॥ ঠিক তা নয়। অনেকদিন পর গেলাম দেখি একেবারে ভোল পাল্টে গেছে। বিরাট হয়েছে ওর ব্যবসা। (গ্লাসে একটা চুমুক দেয়।) প্রায় পাঁচটা নাগাদ গণেশপ্রসাদ বের হল। আমায় চিনতে পারল না। আমি বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

নব ॥ তোর সঙ্গে তাহলে ব্যবসার কথা কিছু হয়নি ?

বিবেক ॥ গণেশ আমার সামনে দিয়ে চলে গেল। মিনিট খানেকের জন্যে ওকে দেখতে পেলাম। আমার দিকে একবার তাকাল যেন আমি একটা অচেনা লোক, এমনিই দাঁড়িয়ে আছি—সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝতে পারলাম—আমার জীবন কি প্রচণ্ড মিথ্যে—মনে হল যেন আমি একটা ভাঁড়।

নব ॥ তুই কি করলি ?

বিবেক ॥ (এক নিঃশ্বাসে বাকীটুকু শেষ করে) গণেশ চলে গেল। ওর সেই মেয়ে স্টেনো এল। আমার দিকে একটু মুচকে হেসে চলে গেল। আমি একা দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর আমার কি হল জানি না। দেখি, আমি গণেশের ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। বেশ বড় ঘর। দু দু'টো রুমকুলার। কাঁচ বসান টেবিল, দেওয়াল জোড়া ম্যাপ। টেবিলের উপর দেখি সুন্দর একটা গোল্ড ক্যাপ পেন পড়ে আছে। আমি আমি—আমি পেনটা তুলে নিলাম।

নব ॥ কেউ দেখতে পায়নি ?

বিবেক ॥ জানি না। আমি ঘর থেকে বেড়িয়ে এলাম। তারপর দৌড়, দৌড়, আমি দৌড়োতে লাগলাম।

নব ॥ কিন্তু তুই পেনটা নিতে গেলি কেন ?

বিবেক ॥ আমার মনে হল, কিছু নেওয়া উচিত। তাই নিলাম। কেন মনে হল তাও জানি না। ছোট, তুই আমায় একটু সাহায্য কর, আমি ব্যাপারটা বাবাকে বলতে চাই।

নব ॥ ক্ষেপেছিস্ নাকি ? বাবা শুনলে কি তোকে কোলে তুলে আদর করবে !

বিবেক ॥ তুই বুঝতে পারছিস না। বাবাকে বুঝতেই হবে যে অত টাকা ধার পাওয়ার আমার কোন যোগ্যতা নেই—কোনদিন ছিল না।

নব ॥ তবু। তুই এবারও বাবাকে কিছু ভাল কথা বল।

বিবেক ॥ আমি পারব না।

নব ॥ তুই বল যে গণেশ ভাল করে সমস্ত ব্যাপারটা বোঝার জন্যে তোকে কাল লাঞ্চে নেমন্তন্ন করেছে।

বিবেক ॥ তারপর কাল কি বলব ?

নব ॥ তারপর—কাল সকালে বেরিয়ে যাবি, রাত্রে ফিরবি। বাবাকে বলবি, যে এতবড় একটা ব্যাপার—তাই ভাববার জন্যে গণেশ কয়েকটা দিন সময় নিয়েছে।

বিবেক ॥ তারপর ?

নব ॥ আরো সময় নিয়েছে।

বিবেক ॥ তারপর ?

নব ॥ (হেসে ওঠে) তারপর আর আসবে না। তোর সত্যি একটা কিছু হ'চ্ছে ভেবেই দেখবি বাপি পাল্টে যাবে। (শশধর ঢোকে) বাপি এস বাপি, আমরা কখন থেকে তোমার অপেক্ষা করছি। তুমি দেরি করে ফেলেছ।

[শশধর একটা চেয়ার নিয়ে বসে তারপর ওদের গা দিয়ে যেন গন্ধ পায়।]

শশধর ॥ তোরা কি খেয়েছিস ?

নব ॥ কিছু নাত বাপি। এই মাত্র টেবিলটা খালি হল। যারা ছিল তারা drink করছিল।

শশধর ॥ ওঃ। তা এত জায়গা থাকতে তোরা এখানে ঠিক করলি কেন ?

নব ॥ কেন এটা ত বেশ ভাল জায়গা। বাপি, সব বিরাট বিরাট লোক এখানে আসে। আর এরা ফ্রায়েড প্রণ যা করে না একটা খেলেই প্রাণটা তর হয়ে যায়।

শশধর ॥ কোন কিছু খেলেই আর আমার প্রাণ তর হবে না।

[ফটিক এসে দাঁড়ায়]।

নব ॥ এই বেয়ারা, জলদি জায়গাটা পরিষ্কার কর। কখন থেকে বলছি ! [ফটিক টেবিলটা পরিষ্কার করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।] ফ্রায়েড প্রণ আর কফি। আর কিছু খাবে বাপি ?

শশধর ॥ না ঠিক আছে। [ফটিক চলে যায়।] কি হল ? (নিশ্চয় ভাল কিছু হয়েছে এই বিশ্বাসে।) সব ভাল মত হল তো ?

বিবেক ॥ (একটু সহজ হওয়ার চেষ্টা করে) বাবা, আমার আজ একটা দারুণ অভিজ্ঞতা হয়েছে!

নব ॥ দারুণ—দারুণ বাপি।

শশধর ॥ (খুব খুশি হয়ে) তাই নাকি—কি হ'ল?

বিবেক ॥ (একটু মাদকতাময় স্বরে যেন অপার্থিব জগত হতে] আমি তোমাকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব বলছি। আজ একটা অদ্ভুত দিন। [চুপচাপ, চারদিকে চায়। যতটা সম্ভব গুছিয়ে নিতে চায়। কিন্তু কথা শুরু করতে গিয়ে গলা ভেঙ্গে আসে।] ওর জন্যে আজ আমাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে। তারপর—

শশধর ॥ গণেশের জন্যে?

বিবেক ॥ হ্যাঁ, গণেশের জন্যে। কে বলেছিল বাবা—আমি গণেশের ওখানে কিছুদিন কাজ করতাম?

শশধর ॥ কেন? তুই নিজে বলেছিলি।

বিবেক ॥ না। আমি কোনদিন ওর ওখানে কাজ করিনি।

শশধর ॥ কি বলছিস তুই?

বিবেক ॥ সত্যি কথা। আজ যে আমার জীবনে সত্যি বলার দিন। আমি ...আমি কোনদিন ওর ওখানে কাজ করিনি—কোনদিন কাজ করিনি—কোনদিন—

শশধর ॥ বেশ, করনি, এবার আমার কথা শোন।

বিবেক ॥ তুমি আমায় বলতে দিচ্ছ না—কেন?

শশধর ॥ কারণ অতীতে তুমি আমায় ক' ঝুড়ি মিথ্যে বলেছ, তা' শোনার আমার ইচ্ছে নেই—ধৈর্যও নেই। আমার জীবন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—আজ আমার চাকরী গেছে।

বিবেক ॥ তা কি করে হবে?

শশধর ॥ হ্যাঁ, তাই। আজ আমি একটা যে কোন ভাল খবরের অপেক্ষা করছি যাতে বাড়ী গিয়ে তোমাদের মা'কে কিছু বলতে পারি। আমার নিজের তরফে আর কোনদিন ভাল খবর আসবে না—সুতরাং—তোমার সঙ্গে গণেশের দেখা হয়েছে।

বিবেক ॥ ওফ্, ভগবান!

শশধর ॥ তার মানে—তুই কি ওর ওখানে যাস নি?

নব ॥ দাদা, গিয়েছিল বাপি !

বিবেক ॥ আমি গিয়েছিলাম। আমি ওকে দেখেছি। ভোলা তোমায় কি করে ছাড়াল ?

শশধর ॥ এখন আমায় বল—ও তোমার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করল ?

বিবেক ॥ ভোলা শুধু কমিশনেও তোমায় কাজ করতে দিল না ?

শশধর ॥ না, দেয় নি। বল, ও তোমায় কি ভাবে নিল ?

নব ॥ খুব খাতির করে, বাপি।

বিবেক ॥ বাবা, একটু ঠাণ্ডা মাথায় সব গুছিয়ে বলতে দেবে ?

শশধর ॥ বেশ বল, কি হয়েছে ? কোন ভাল খবর আছে ? ও কি ওর অফিস কামরায় তোমায় ডেকে নিয়ে গেল ?

বিবেক ॥ গণেশ এল, আমায় দেখল, তারপর—

শশধর ॥ ও নিজে থেকে উঠে এল। তারপর তোকে দেখে খুব খুশি হল ?

বিবেক ॥ এক রকম তাই।

শশধর ॥ দুপুরে কি তুই ওর সঙ্গে খেলি ?

বিবেক ॥ দুপুরে ও আমাকে ওর সঙ্গে—না—না—

নব ॥ আমার প্ল্যানটা দাদা দুপুরে গণেশকে বলেছে।

শশধর ॥ তুই থাম্! (খুব উৎসাহের সঙ্গে) প্ল্যানটা শুনে গণেশ কি বল্ল ?

বিবেক ॥ বাবা, তোমাকে গুছিয়ে বলার জন্যে আমায় একটু সময় দেবে ?

শশধর ॥ তার মানে, ব্যাপারটা শোনার জন্যে আমি সেই তখন থেকে অপেক্ষা করছি—এখন সময় দেবে, মানে ? তাড়াতাড়ি বল।

বিবেক ॥ গণেশ—আমি বল্লাম। আর—ও শুনল। তারপর—

শশধর ॥ শাবাস্! ভাল করে শুরু করলে শুনতেই হবে। কি বল্লরে ?

বিবেক ॥ বল্ল— (ভেঙ্গে পড়ে, তারপর হঠাৎ রেগে যায়।) আমি তোমাকে যা বলতে চাইছি তা আমায় বলতে দিচ্ছ না কেন ?

[একটা সুর ভেসে আসে, গাছের পাতার ছায়া আবার এসে পড়ে। রাতের প্রভাব, স্বপ্নের ইঙ্গিত।]

ছোট সুশান্ত ॥ (নেপথ্যে) কাকীমা—কাকীমা !

নব ॥ কি হয়েছিল বল ?

বিবেক ॥ চুপ কর। নিজের চরকায় তেল দে।

শশধর ॥ না-না, তোকে বড় হতে হবে ; আর শেষে তুই কিনা mathematics-এ ফেল করলি !

বিবেক ॥ কিসের mathematics ? তুমি কি বলছ ?

সুশান্ত ॥ কাকীমা, [নেপথ্যে] কাকীমা !

শশধর ॥ (বন্য চিৎকারে) Mathematics, mathematics, mathematics

বিবেক ॥ আস্তে, এটা একটা পাব্লিক প্লেস ।

সুশান্ত ॥ (নেপথ্যে) কাকীমা !

শশধর ॥ তুই যদি ফেল না করতিস তবে আজ অন্য অবস্থা হত ।

বিবেক ॥ (কঠিন স্বরে) শোন, কি হয়েছিল আমি তোমায় বলছি, আর আমার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত শুনবে ।

সুশান্ত ॥ (নেপথ্যে) কাকীমা—

বিবেক ॥ আমি ছ'ঘণ্টা অপেক্ষা করেছিলাম—

নব ॥ কি বলছিস তুই ?

বিবেক ॥ আমি সমানেই তাগাদা পাঠাচ্ছিলাম কিন্তু গণেশ আমার সঙ্গে দেখা করেনি । শেষে গণেশ—

[এই কথার ওপর আলো চলে যায় শশধরের ঘরে । ছোট সুশান্ত ও শেফালী স্পষ্ট হয়ে ওঠে ।]

সুশান্ত ॥ কাকীমা, বিবেক ফেল করেছে ।

শেফালী ॥ না ।

সুশান্ত ॥ প্রোফেসার মিত্র অনেকবার বলেছিলেন—

শেফালী ॥ কিন্তু ওকে যে পাশ করতেই হবে । ওকে যে আরও পড়তে হবে । কোথায় গেল মুখপোড়া ! খোকা—খোকা !

সুশান্ত ॥ বিবেক বাড়ী আসেনি । হাওড়া স্টেশনে গেছে ।

শেফালী ॥ হাওড়া স্টেশন ! তবে কি পাটনায় গেল ?

সুশান্ত ॥ কাকাবাবু কি পাটনায় আছেন ?

শেফালী ॥ তাইতো থাকবার কথা । তবে বোধহয় ওঁর কাছেই ছুটে গেছে । কিন্তু উনি পাটনা থেকে কি করবেন ? এখন আমি কি করি !

[ওরা আবার অন্ধকারে চলে যায় । আলো এসে আবার রেস্টুরেণ্টকে স্পষ্ট করে তোলে ।]

বিবেক ॥ (হাতে একটা গোল্ডক্যাপ পেন ধরা)···সুতরাং আমি গণেশের

সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে এলাম। তুমি কি আমার কথা বুঝতে পেরেছ ?

শশধর ॥ সব ব্যাপারে আমায় দোষ দিবি না। আমি ফেল করিনি—ফেল করেছিল তুই ! কি পেন ?

নব ॥ একটা বাজে কলম বাপি। কতই বা দাম হবে ওটার ?

শশধর ॥ (এই প্রথম পেনটা নজরে পরে) তুই গণেশের কলম নিয়েছিস ?

বিবেক ॥ (দুর্বলভাবে) এটাই তো তোমায় আমি এতক্ষণ বোঝালাম।

শশধর ॥ তুই গণেশের কলম চুরি করেছিস ?

বিবেক ॥ না।

নব ॥ দাদা ওটা হাতে নিয়ে দেখছিল এমন সময় গণেশ ঢুকে পড়ে। দাদা ভরকে গিয়ে পেনটা পকেটে রেখে দেয়।

শশধর ॥ হায়, ভগবান !

বিবেক ॥ আমি ঠিক ইচ্ছে করে এটা নিইনি, বাবা।

ভোলার স্বর ॥ আপনাকে আর ট্যুর করতে হবে না।

শশধর ॥ না না। ট্যুর আমায় করতেই হবে।

বিবেক ॥ (ভয় পায়) তুমি কি বলছ ?

ভোলার স্বর ॥ আপনার দু-দুজন উপযুক্ত ছেলে। বিশ্রাম নিন।

শশধর ॥ (মুখটা বিকৃত হয়ে যায়) নেই—নেই। আমার একটাও ছেলে নেই, সব মরে গেছে। (টলে পড়ে যেতে থাকে, বিবেক ধরে ফেলে।)

বিবেক ॥ বাবা—স্থির হয়ে বস।

শশধর ॥ খবরদার আমায় ছুঁবি না। তোরা দূর হয়ে যা—যতসব অপদার্থ !

ভোলার স্বর ॥ কথাটা আজ স্পষ্ট করে বল্লাম।

শশধর ॥ না—না—না—(চেয়ার থেকে টলে পরে যেতে থাকে।)

বিবেক ॥ (শশধরকে ধরে, মরিয়া ভাবে) বাবা, শোন। আমার কথা শোন। আমি তোমায় একটা ভাল খবর দিচ্ছি। গণেশ ওর পার্টনারকে আমার কথা বলেছে। তুমি কি আমার কথা শুনছ ? (বিবেকের গলা ক্রমশঃ আসপাশের লোক সম্বন্ধে সচেতন হয়ে চড়ায় উঠতে থাকে।) ওর পার্টনার আমার সঙ্গে কথা বলেছে। ওর পার্টনার আমায় বল্ল—অনেক টাকার ব্যাপার একটু ভেবে ঠিক করতে

হবে। তুমি কি শুনছ? (শশধর একটু স্বাভাবিক হয়) তুমি বুঝতে পেরেছো?

শশধর॥ তাহলে তুই পেরেছিস—বড় ব্যাটা তুই পেরেছিস।

নব॥ দাদা সমস্ত ব্যাপারটা খুব ভাল করে বুঝিয়েছে।

বিবেক॥ এবার তুমি আমার বাকী কথাটা শোন। কাল ওদের সঙ্গে আমার লাঞ্চ খাওয়ার কথা আছে—কিন্তু আমি যাব না।

শশধর॥ কেন— যাবি না কেন?

বিবেক॥ এই কলমটার জন্যে—

শশধর॥ তাতে কি হয়েছে। কাল গিয়েই ফেরৎ দিয়ে দিস। বলবি, ভুল করে—

বিবেক॥ (খুব গম্ভীর গলায়) শোন, কয়েক বছর আগে ভাওতা দিয়ে আমি অনেক টাকার জিনিস আনি, আর তার জন্যে একটা পয়সাও দিই নি—আজ কলম। সব মিলিয়ে মানে একটাই দাঁড়াবে।

গোপালের স্বর॥ শশধর, তোমার প্রশ্রয়ে তোমার ছেলে একদিন জেলে যাবে—আর সেদিন এসে আমি এর উত্তর দিয়ে যাব।

শশধর॥ তুই কি জীবনে দাঁড়াতে চাস না?

বিবেক॥ বাবা, কোনমুখে ওদের কাছে যাব?

শশধর॥ তুমি চোর ছাড়া আর কিছু হতে পারবে না—তাই ওদের কাছে যাওয়ার সাহস তোমার নেই।

বিবেক॥ (শশধর বুঝছে না বলে দুঃখের সঙ্গে) তুমি এভাবে এটাকে নিচ্ছ কেন? তুমি কি মনে কর আমি যা করেছি তারপর ওদের ওখানে যাওয়া আমার পক্ষে সহজ? একটা হাতিতেও আমায় ওখানে টেনে নিয়ে যেতে পারবে না।

শশধর॥ তাহলে আজ গেলে কেন?

বিবেক॥ কেন গেলাম? আজ আমি ওখানে কেন গেলাম? তোমার জন্যে। তোমার এই অবস্থার জন্যে।

[মেয়েটির হাসি শোনা যায়।]

শশধর॥ তুই ওদের সঙ্গে কাল লাঞ্চ খাবি—ব্যস।

বিবেক॥ না, আমি যাব না। আমার যাওয়ার কথা নেই।

নব॥ দাদা, তুই কি বলছিস?

শশধর ॥ তাহলে আমায় নিয়ে এতক্ষণ মজা করছিলে ?

বিবেক ॥ আবার তুমি ভুল করছ। আমি যে কি করি ?

শশধর ॥ রাস্কেল, ইডিয়ট, আমার সঙ্গে ঠাট্টা! (কথার শেষে সজোরে বিবেককে চড় মারে।)

মেয়েটির স্বর ॥ এই—এই গ্যাখ। কে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে।

বিবেক ॥ (লজ্জায় অপমানে হিংস্র হয়ে।) বাবা, আমি সত্যিই অপদার্থ।

নব ॥ তোমরা দুজনেই ক্ষেপে গেছ। এরকম করলে এখান থেকে বের করে দেবে। (শতমিতাকে আসতে দেখা যায়।) এই দাদা—চুমকি। (বিবেক এক মুহূর্ত শশধরের দিকে তাকায়। শশধরের দৃষ্টি তখন অন্য জগতে) আরে আসুন, আসুন। (শশধরকে দেখিয়ে) বাবা।

শতমিতা ॥ (হাতজোড় করে নমস্কার করে) নমস্কার!

শশধর ॥ (সম্বিত ফিরে পেয়ে) এটি কে ? (ভাল করে দেখে) আগে তো কখনও দেখিনি!

[মেয়েটির হাসি আবার শোনা যায়।]

শতমিতা ॥ আমার নাম শতমিতা।

নব ॥ দাদার সঙ্গে একটা ছবিতে হিরোইন হবেন—কথা হয়েছে।

[শতমিতা একটু বিস্মিতভাবে বিবেক ও নবর দিকে তাকায়।]

শশধর ॥ ওঃ। আজ কি এখানে ছবি তোলা হবে ?

বিবেক ॥ (শশধরকে অগ্রাহ্য করে।) কি ব্যাপার ? আবার ফিরে এলে যে ?

শতমিতা ॥ একটা কথা মনে হল, তাই আবার এলাম।

বিবেক ॥ বেশ করেছো—তুমি ফিরে আসাতে ভাল হয়েছে।

শশধর ॥ এদের এখানে বেসিনটা কোথায় ?

নব ॥ (খুব তাড়াতাড়ি।) বেসিন ? ওই তো ওইদিকে—চলে যাও।

[শশধর ওইদিকে চলতে থাকে।]

বিবেক ॥ (শশধরের চলে যাওয়া লক্ষ্য করে ইঙ্গিতে শতমিতাকে বসতে বলে।) হ্যাঁ—এবার বল কি মনে করে আবার দর্শন দিলে ?

শতমিতা ॥ আমি ভাবলাম যে কাল এখানে না এসে আজ তুমি আমাদের বাড়ীতে চল। তোমার সঙ্গে সকলের আলাপ করিয়ে দেব। চল চল।

[ওদের ওপর দিয়ে আলো চলে যায়।]

[পাটনা হোটেলের দৃশ্য। শশধরের ঘরের দিকে। নেপথ্যে ঠুংরীর আওয়াজ। শশধর ও মেয়েটির হাসি শোনা যায়।]

মেয়েটি ॥ এই বাঃ। কি করছ? আবার! (খিলখিল করে হাসে।) এই ছাড়, নইলে চলে যাব।

শশধর ॥ (মাদকতাময় কণ্ঠে) যেতে দেওয়ার জন্যে তো আর ধরিনি। সারারাত এভাবে আটকে রেখে দেব। আবার কতদিন পর দেখা হবে বল তো!

মেয়েটি ॥ তোমার তো খালি ওই কথা। দু'দিনের জন্যে এসে আবার আমায় কাঁদিয়ে চলে যাবে। আমি তো তোমার কাছে একটা ওয়েটিং রুম।

শশধর ॥ হু হু হু! মনটা যে তোমার কাছে ফেলে রেখে যাই, সেটা বুঝি কিছু নয়!

মেয়েটি ॥ রেখে যাও না ছাই—মনটা সতীনের কাছে পড়ে থাকে। আমি বুঝি গো—বুঝি।

[দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ]

শশধর ॥ আমি তোমার কাছে থেকে গেলে—তুমি খুসি হবে?

মেয়েটি ॥ তুমি পারবেই না। (কড়ানাড়ার আওয়াজ) এই ছাখো, অনেকক্ষণ থেকে কে যেন কড়া নাড়ছে।

শশধর ॥ অন্য ঘরে। আমার কাছে এখন কেউ আসবে না।

[এবার খুব জোরে কড়া নাড়ার আওয়াজ পাওয়া যায়।]

মেয়েটি ॥ না গো, তোমার ঘরে। (আবছা আলোয় দেখা যায় মেয়েটি উঠে শাড়ী ঠিক করছে।] ছাখো না—কে?

শশধর ॥ না, জ্বালালে! বোধহয় কোন ডাক্তার বা 'ডীলার এসেছে স্যাম্পেলের লোভে। এক মিনিটে বিদেয় করে দিচ্ছি। তুমি বরং একটু বাথরুমের ভেতর থাক। (আবার কড়ানাড়ার আওয়াজ) য়েস্—ক্যামিং—ক্যামিং—(দরজা খোলে। ছোট বিবেক দাঁড়িয়ে। ভীষণ চম্‌কে যায়।) তুই—এখানে?

বিবেক ॥ কখন থেকে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছি। কি করছিলে?

শশধর ॥ আমি—আমি বাথরুমে ছিলাম। তুই এখানকার ঠিকানা জানলি কি করে?

বিবেক ॥ পাটনায় এসে এই হোটেলে থাক—কতদিন বলেছ। তোমার ঘরে কে আছে ?

শশধর ॥ কই, কেউ নেই তো! হ্যাঁরে, বাড়ীর খবর সব ভাল ?

বিবেক ॥ ভাল। তুমি যে কার সঙ্গে কথা বলছিলে ?

শশধর ॥ কোথায় ? ঘরে তো কেউ নেই। তবে যে তুই হঠাৎ এলি ?

বিবেক ॥ বাপি। আমি ফেল করেছি—Mathematics-এ।

শশধর ॥ বলিস কি ?

বিবেক ॥ হ্যাঁ, বাপি। কিন্তু আমার ফেল করার কথা নয়। আমার পাশেই সুশান্ত বসেছিল। আমি ওর কয়েকটা অঙ্ক দেখেছিলাম। ও লেটার পেল আর আমি ফেল করলাম! তুমি রি-এগজামিন করাও।

শশধর ॥ কত পেয়েছিস তুই ?

বিবেক ॥ নব্বই। একশ'য় পাশ।

শশধর ॥ মাত্র দশ! তবে ওদের দিতেই হবে। আমি গিয়েই ব্যবস্থা করছি। তুই এক কাজ কর, নীচে গিয়ে ম্যানেজারকে বল আমার বিলটা তৈরী করতে। আমি এক্ষুণি নামছি। আজই গাড়ী নিয়ে চলে যাব। সব ঠিক হয়ে যাবে। যা। (বিবেক চলে যেতে থাকে। দরজার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। ঘুরে দাঁড়িয়ে সমস্ত ঘরটা ভাল করে দেখতে থাকে। তারপর হঠাৎ বাথরুমের দরজার দিকে যায়। শশধর অস্বস্তি বোধ করে। বিবেক প্রায় পর্দার কাছে যেতেই—) কই—যা। (সঙ্গে সঙ্গে বাথরুমের ভেতর থেকে মেয়েটির চিৎকার শোনা যায়। ভয় পেয়ে মেয়েটি বের হয়ে আসে। বিবেক একটু আড়ালে চলে যায়।]

মেয়েটি ॥ এই বাথরুমে কি যেন রয়েছে। নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। আমি থাকতে পারলাম না। ভয় করল।

শশধর ॥ তাই নাকি। ঠিক আছে। তুমি বরং তোমার ঘরে চলে যাও। (মেয়েটির দিকে চেয়ে চোখ টেপে। মেয়েটি আমল দেয় না।) যাও, চলে যাও। (প্রায় একরকম বের করে দিতে যায়।)

মেয়েটি ॥ আরে দাঁড়াও। চুলটুলগুলো ঠিক করে নিই।

শশধর ॥ পরে কর। এখন যাও। আমায় এক্ষুণি বের হতে হবে।

মেয়েটি ॥ যাচ্ছি। আমার শাড়ীটা দাও।

শশধর ॥ আমার কাছে কোন শাড়ী নেই।

মেয়েটি ॥ বাঃ—বল্লে যে একটা খুব ভাল শান্তিপুরি শাড়ী এনেছো। দাও বলছি।

শশধর ॥ (দাঁত কিড়মিড় করে) ওফ্! (খাটের গদির নীচ থেকে শাড়িটা এনে দেয়।) এই নাও। যাও, এখন বিদেয় হও।

মেয়েটি ॥ যাচ্ছি গো যাচ্ছি। একটু আগেই তো বলছিলে—আর ছাড়বে না। সবই বুঝি কাজ মিটে গেছে কিনা—

শশধর ॥ Get out ! Get out I say [হাত ধরে দরজার দিকে ঠেলে দেয়]

মেয়েটি ॥ (খিলখিল করে হেসে ওঠে। চলে যাওয়ার পথে বিবেককে দেখতে পায়।) বাঃ—বেশ ছেলে তো। (আবার হেসে চলে যায়। শশধর ও বিবেক পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে।)

শশধর ॥ ও আমার কেউ নয়রে। একজন ডাক্তার—লেডী ডাক্তার। আমায় অর্ডার দিতে এসেছিল। মস্ত বড় অর্ডার। আমার অনেক কমিশন হবে। তোকে একটা স্যুট করে দেব। কিরে? কি হল?

বিবেক ॥ বাপি। (কেঁদে ফেলে।)

শশধর ॥ তুই এখন এসব বুঝবি না। আমি বড় একা রে!

বিবেক ॥ তুমি মা'র জন্যে কেনা শাড়ীটা ওকে দিয়ে দিলে?

শশধর ॥ ওটা তোর মা'র জন্যে হবে কেন? শোন, বোকার মত কাঁদিস না। চল নীচে যাই, আজই কলকাতায় ফিরে যাব।

বিবেক ॥ আমি কলকাতায় যাব না।

শশধর ॥ বেশ তো—এখানে থাক। আমার আর কয়েকটা দিন পাটনায় কাজ আছে—শেষ করি, তারপর বাপ-বেটায় একসঙ্গে চলে যাব। চল। (বিবেককে ধরে।)

বিবেক ॥ তুমি আমায় ছোঁবে না, ছোটলোক!

শশধর ॥ কি বাপকে ছোটলোক বলা! চড়িয়ে গাল উল্টে দেব।

বিবেক ॥ তুমি—তুমি একটা মিথ্যেবাদী, একটা জোচ্চর। [চলে যায়]

শশধর ॥ (উন্মাদের মত) এই শোন, ফিরে আয় বলছি। এই যা করতে বলছি কর—ভাল হবে না বলছি— (আলো কেটে গিয়েই রেস্টুরেণ্টের বাজনা ও আলো এসে পড়ে। ফটিককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। শশধর ফটিকের সামনে হাত নাড়াচ্ছে।) যা করতে বলছি কর—

ফটিক ॥ বলুন স্যার—কি করব ?

শশধর ॥ (সম্বিত ফিরে পায়) এ্যাঃ—একি ওরা কোথায় গেল ?

ফটিক ॥ ওনারা বিল মিটিয়ে দিয়ে চলে গেছে। বলেছেন বাড়ীতে দেখা হবে।

শশধর ॥ চলে গেছে ! আজ যে এখানে খাওয়ার কথা ছিল ?

ফটিক ॥ আপনি খেয়ে নিন স্যার।

শশধর ॥ না, ঠিক আছে। (চলে যেতে থাকে।)

ফটিক ॥ স্যার !

শশধর ॥ (ঘুরে দাঁড়িয়ে) ছ্যাখো তো আমার জামা কাপড় ঠিক আছে কিনা ?

ফটিক ॥ (বিস্মিতভাবে) ঠিক আছে স্যার।

শশধর ॥ ওঃ। আচ্ছা, এখানে ফুলগাছ কোথায় কিনতে পারব বলতে পার ?

ফটিক ॥ নিউ মার্কেটে। কিন্তু এখন কি পাবেন ? বোধহয় বন্ধ হয়ে গেছে

শশধর ॥ তাহলে একটা ট্যাক্সি—

ফটিক ॥ ডেকে দেব স্যার ?

শশধর ॥ না। ঠিক আছে— আমিই ধরে নেব। (চলে যায়।)

[অন্ধকার। এবার আলো এসে পড়ে শশধরের বাড়ীতে। ফাঁকা ঘর। বড় নব ঢোকে হাতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। পেছনে বড় বিবেক। নব শশধরের ঘর খোঁজে। তারপর ভেতরের ঘরে চলে যায়। খানিক পরে এসে জানায়, কেউ নেই। নিজেদের ঘর দেখে। শেফালীকে সিঁড়ির ওপর দেখতে পায়।]

নব ॥ মা ! তুমি এখানে কি করছ ? (শেফালী উত্তর দেয় না।) বাপি কোথায় মা ?

শেফালী ॥ বাপের খবর তো তোমাদের রাখার কথা—নেমন্তন্ন করেছিলে।

নব ॥ (জোর করে মুখে হাসি আনার চেষ্টা করে) আমরা, সে অনেক কথা মা। দাদার এক বান্ধবীর বাড়ী গিয়েছিলাম—খুব ভাল মেয়ে। মা, ছ্যাখো, তোমার জন্যে রজনীগন্ধা এনেছি। তোমাদের ঘরে রেখ। (শেফালীর হাতে দেয়, শেফালী ছুঁড়ে ফেলে দেয়, নীচে এসে পড়ে।)

নব ॥ ছিঃ ছিঃ, ফুলগুলো ফেলে দিলে ! তুমি ভালবাস তাই কত কষ্ট করে নিয়ে এলাম।

শেফালী ॥ (নবকে আমল না দিয়ে নীচে বিবেকের সামনে এসে দাঁড়ায়।) মানুষটা বাঁচল কি মরল একবার দেখার দরকার মনে করলি না ?

নব ॥ দাদা, চলে আয় ওপরে ।

বিবেক ॥ তুই যা, (শেফালীকে) বাঁচল কি মরল মানে ? কেউ মরেনি মা ।

শেফালী ॥ আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা । কেন যে তোদের আঁতুড়ে নুন খাইয়ে মারিনি !

বিবেক ॥ বাবা কোথায় মা ?

শেফালী ॥ কি দরকার তার খবরে ?

বিবেক ॥ কোথায় বাবা ? (ভেতরের ঘরের দিকে যায়)

শেফালী ॥ তোরা নিজেরা ওঁকে চা খাওয়ার জন্যে ডাক্লি । সারাদিন ধরে উনি বিকেলটার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন—আর তোরা ওঁকে ওখানে ফেলে রেখে চলে গেলি ?

নব ॥ সব দোষ বাবার । এসেই চ্যাঁচাতে লাগলেন । শোন, আমি—আমরা সন্ধ্যেটা নষ্ট করতে চাইনি বলেই চলে গিয়েছিলাম ।

[নব নেমে আসে ।]

শেফালী ॥ আমার সামনে থেকে চলে যাও ।

নব ॥ মা, শোন, তুমি···

শেফালী ॥ সন্ধ্যেটা যাদের সঙ্গে ভাল কাটালে বাকী রাতটুকু কাটাতে পারলে না ? পকেটের পয়সা কি ফুরিয়ে গিয়েছিল ?

নব ॥ (বিবেককে) আজ সন্ধ্যেটা দারুণ কেটেছে, নারে দাদা ?

শেফালী ॥ মরে যা, মরে যা—তোরা মরে যা, আমার হাড় জুড়োক । শোন, এ বাড়ী থেকে এক্ষুণি চলে যাবে—আর কোনদিন মুখ দেখাবে না । যাও, নিজেদের জিনিসপত্র নিয়ে বিদেয় হও । (এসে ছড়ান ফুলগুলো তুলতে গিয়ে থেমে যায়) আমি কি তোমাদের চাকরাণী নাকি ? তোল এগুলো তোল—এক জোড়া জন্তু এসে আমার গর্ভে জন্মেছে । কোথাকার কে একটা মেয়েছেলে তোদের কাছে বাপের চেয়ে বড় হল ?

বিবেক ॥ বাবা কি তাই বলেছে ?

শেফালী ॥ ওঁর কিছু বলার দরকার ছিল না । ওঁর মুখ দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি ।

নব ॥ কিন্তু মা, বাবা আজ আমাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ—

বিবেক ॥ Shut up ! (নবকে থামি দেয় । নব কোন কথা না বলে ওপরে চলে যায়)

শেফালী ॥ তুই! তুই একবার দেখা দরকার মনে করলি না, উনি কোথায় গেলেন?

বিবেক ॥ (হাঁটু গেড়ে বসে ফুল তুলতে তুলতে) না। মনে করিনি। আমার লজ্জা করছিল। এক ঘর লোকের সামনে নিজের ঘরের কেচ্ছা শুনিয়ে চিৎকার করছিলেন। লজ্জা করে না!

শেফালী ॥ তা তো করবেই। পরগাছা কোথাকার!

বিবেক ॥ এতদিনে একটা ঠিক কথা বলেছ মা। (ওঠে, ফুলগুলো একটা ঝুড়িতে ফেলে দেয়) আমি এই সমাজের একটা পচা অংশ, আর তোমরা বার বার আমার উপর নির্ভর করেছ। (পাগলের মত হাসে)

শেফালী ॥ চুপ কর। এটা ভদ্রলোকের বাড়ী। মাতলামি করার জায়গা নয়।

বিবেক ॥ আমায় বাবার সঙ্গে কথা বলতেই হবে।

শেফালী ॥ তুমি আর ওঁর কাছে যাবে না। দয়া করে এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাও। আমাদের নিষ্কৃতি দাও।

বিবেক ॥ তাই যাব, মা, কিন্তু বাবার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া শেষ করে যাব। বল মা, বাবা কোথায়?

শেফালী ॥ বাগানে।

বিবেক ॥ বাগানে?

শেফালী ॥ হ্যাঁ, ফুলগাছ লাগাচ্ছেন।

বিবেক ॥ বাবা—ফুলগাছ!

শেফালী ॥ হ্যাঁ।

বিবেক ॥ এত রাত্রে!

শেফালী ॥ হ্যাঁ। ফুলের মত ছেলে পেয়ে, সারা জীবন ফুলগাছ লাগান নি।

[শশধর প্রবেশ করে।]

কিন্তু আজ—তোমার ফুলগাছ লাগান হয়ে গেল?

[শশধর চেয়ারে বসে]

বিবেক ॥ আমি আজ চলে যাচ্ছি, আর কোনদিন ফিরব না।

শশধর ॥ তাহলে তুমি গণেশের সঙ্গে কাল দেখা করছ না?

বিবেক ॥ আমার দেখা করার কথা নেই।

শশধর ॥ ও তোমার কাঁধে হাত রেখে কথা বল্ল, আর তোমার দেখা করার কথা নেই?

বিবেক ॥ এখন আর আমাকে কিছু বল না। প্রত্যেকবার এই রকম অশান্তির মধ্যে আমি বাড়ী ছেড়েছি। আজ আমি নিজেকে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি আর তোমাকে তা বারবার বোঝাবার চেষ্টা করেছি—কিন্তু আমি কিছুতেই তোমায় বোঝাতে পারলাম না। (শশধরের হাত ধরে) যাক্‌গে, সব কিছু ভুলে যাও, বাবা, আমাকে হাসি মুখে যেতে দাও।

শেফালী ॥ ওকে আশীর্বাদ কর ?

শশধর ॥ কত নীচ দেখলে ?

বিবেক ॥ আমায় এ ভাবে যেতে হবে আমি ভাবি নি।

শশধর ॥ তোমার এ ভাবেই যাওয়া উচিত।

বিবেক ॥ (দাঁড়িয়ে যায়) তুমি আমার কাছে ঠিক কি চাও বল তো ?

শশধর ॥ আমি চাই। পৃথিবীর যে কোন জায়গাতেই তুমি যাও তোমার জীবন যেন ধ্বংশ হয়। তারপর একদিন নর্দমার পাঁকে যখন পচে মরবে তখন আমায় দোষ দিও না।

বিবেক ॥ আমি তোমায় কোনদিন দোষ দেব না।

শশধর ॥ আমি নিজেও কোনদিন এর জন্য নিজেকে দায়ী করব না, বুঝলে !

[নব সব শুনে নেমে এসে দাঁড়ায়]

বিবেক ॥ আমি তোমার মুখ থেকে এইটাই শুনতে চেয়েছিলাম।

শশধর ॥ (একটা চেয়ারে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে) তুমি সব সময় আমায় পেছন থেকে ছুরি মারতে চেয়েছো—ভেব না আমি বুঝতে পারিনি তুমি কি চাও ?

বিবেক ॥ বেশ, তাহলে আজ খোলাখুলি সব কথা হোক।

[ফস্‌ করে নাইলনের দড়িটা বের করে ফাঁসটা নীচু করে ঝোলাতে থাকে]

নব ॥ তুইও কি পাগল হলি—

শেফালী ॥ খোকা ! (এগিয়ে এসে নিয়ে নিতে চায়, কিন্তু বিবেক সরিয়ে দেয়। শেফালী ছিটকে গিয়ে একটা চেয়ারে পড়ে কাঁদতে থাকে)

বিবেক ॥ আমায় ছেড়ে দাও। এটা আমার কাছে থাকবে।

শশধর ॥ ওটা কি ?

বিবেক ॥ তুমি জান না এটা কি ?

শশধর ॥ না।

বিবেক ॥ মিথ্যে কথা ! এটা দিয়ে কি করতে—নিজেকে বীর প্রমাণ করতে ? এইভাবে তুমি কি আমায় দুঃখ দিতে চেয়েছিলে ?

শশধর ॥ আমি কিছু জানি না।

বিবেক ॥ তোমার জন্যে আমার কোন দুঃখ নেই।

শেফালী ॥ চুপ কর।

বিবেক ॥ (নবকে) এই লোকটা জানে না আমি কি ? এইবার জানবে (শশধরকে) এ বাড়ীতে কোনদিন আমরা সত্যি কথা বলিনি।

নব ॥ কেন বলব না ?

বিবেক ॥ তোকে দালালি করতে কে ডেকেছে ? তুই কি এ বাড়ীর ছোট দালাল ?

নব ॥ আমি কথনই—

বিবেক ॥ তুইও ওই এক রাস্তায় চলছিস। আসলে আমরা সবাই তাই। আমিও নিজেকে এড়াতে পারি নি। এবার কথা শোন, শশধর সামন্ত—এই হলাম আমি।

শশধর ॥ আমি তোমায় চিনি।

বিবেক ॥ তুমি জান কেন ওই তিনমাস আমি কেন কোন ঠিকানা দেইনি ? কারণ আমি জেলে ছিলাম (শেফালী কাঁদছে) কান্না থামাও। আমাকে বলতেই হবে।

শশধর ॥ আমার মনে হয় ওটা আমার দোষ !

বিবেক ॥ স্কুলে পড়ার সময় থেকেই আমি চুরি করতে শিখি।

শশধর ॥ এটাও কি আমার দোষ ?

বিবেক ॥ আমি কোনদিন মন দিয়ে কোন কাজ করিনি। কারণ তুমি সব সময় এমন ভাবে আমায় ফাঁপিয়ে রাখতে যে, আমার ধারণা ছিল, যে কোন কাজ পৃথিবীর যে কোন লোকের চেয়ে অনেক ভালভাবে করতে পারি। তাই কাজ না করে করে আমি অকর্মা হয়ে গেলাম। এটা কার দোষ ?

শশধর ॥ চমৎকার !

শেফালী ॥ খোকা !

বিবেক ॥ গতকাল তুমি হঠাৎ ঠিক করলে যে রাতারাতি আমায় বড়লোক হতে হবে। যেন বড়লোক হওয়াটা হাতের মোয়া।

শশধর ॥ না পারবে তো মর। তোমার অপদার্থের মত গলায় দড়ি জোটে না।

বিবেক ॥ না—শশধর সামন্ত! কেউ ইচ্ছে করে গলায় দড়ি দেয় না। আজ আমি পেনটা নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছি। তারপর হঠাৎ থেমে গেলাম গড়ের মাঠে এসে, সমস্ত ব্যাপারটা মনে করে আমার ভীষণ হাসি এল। ছ' ঘণ্টা ধরে আমি কি করছিলাম? আমি যা ভালবাসি সবতো বাইরে, খোলা আকাশ, প্রচুর বাতাস, অবাধ স্বাধীনতা—সব তো রয়েছে মাঠে। আমার হাতে-ধরা পেনটার দিকে চেয়ে আমি নিজেকে বল্লাম—'এ আমি কি করছি। আমি যা নই বারবার কেন তাই প্রমাণ করতে চাইছি।' কি করছিলাম আমি ওই অফিসে। প্রত্যেকের বিদ্রূপ কুড়োচ্ছিলাম, নিজেকে বোকা প্রমাণ করছিলাম। আমি যা চাই তা তো ওখানে নেই। আর সেই মুহূর্তে আমি নিজেকে চিনতে পারলাম: আমি কি? তুমি—তুমি কেন তা বলতে পার না? (শশধরের সামনাসামনি দাঁড়াবার চেষ্টা করে)

শশধর ॥ হ্যাঁ, গরু-ছাগলের মত তোমার মুক্ত জীবন বাইরেই থাকবে।

বিবেক ॥ বাবা, আমি একটা অপদার্থ আর তুমিও তাই।

শশধর ॥ না। আমি অপদার্থ নই, আমি শশধর সামন্ত আর তুমি অপদার্থ সামন্ত! (বিবেক তেড়ে শশধরকে ধরতে যায়। মাঝপথে নব আটকে দেয়। বিবেকের চেহারা দেখলে মনে হয় যেন শশধরকে খুন করে ফেলবে।)

বিবেক ॥ তুমি বা আমি কেউই কিছু বিরাট লোক নই। তুমি একটা গাধার মত তোমার নিজের সংসারের বোঝা পিঠে নিয়ে বয়েছ, আর ভাবে দেখাতে চেয়েছ, যেন বিরাট কিছু করছ। তুমি যদি কিছু করে থাক তবে নিজের গরজেই করেছ—কারণ তুমি আমাকে জন্ম দিয়েছ। বাজারে আজ আমাদের কারোর কোন দাম নেই। তবুও একটা কুলীর কাজ করেও আমি আমার পেট চালাতে পারব। কারণ, আমি অপদার্থ সামন্ত, আর তুমি—তোমার মোহ নিয়ে—

শশধর ॥ শয়তান!

বিবেক ॥ (সজোরে নবকে সরিয়ে দিয়ে শশধরকে ধরে। কিন্তু শশধরের অসহায়তা বিচলিত করে তোলে।) বাপি, সত্যিই আমি একটা অপদার্থ! এটা সবাই বুঝতে পারে, তুমি কেন পার না? আমি

কোনদিন কোন কিছু করতে পারব না, এর মত সত্যি আমি জীবনে আর কখনও বলিনি। (শশধরকে ধরে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকে)

শশধর ॥ (অবাক হয়ে) একি করছিস ! একি করছিস ! (শেফালীকে) কাঁদছে কেন ?

বিবেক ॥ ভগবানের দোহাই, তুমি কি আমায় যেতে দেবে ? আমার সম্বন্ধে তুমি কি তোমার সব স্বপ্ন মুছে ফেলবে ? আমি যে একটা খুব সাধারণ ছেলে ! (নিজেকে জোর করে শক্ত করে) আমি কাল সকালে যাব, তুমি শুতে যাও। (টলতে টলতে ওপরে যায়)

শশধর ॥ ওঃ, বড় ব্যাটা ! (পাগলের মত চারিদিকে চায়) কেঁদে ফেল্লে, আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেল্লে ? (বাৎসল্যে চোখ বন্ধ হয়ে আসে) ছেলেটা—ছেলেটা বিরাট হবে—বিরাট—বিরাট—

শেফালী ॥ (শশধরের এই মানসিক পরিবর্তন বুঝতে পেরে বাস্তবে আসার চেষ্টা করে) এবারে চল, শুতে চল। সব মিটে গেছে।

শশধর ॥ হ্যাঁ। এবার শোব। চল। শুতে যা ছোট ব্যাটা।

নব ॥ বাপি, তুমি দেখ, আমি ঠিক বড় হব। এক বছরের মধ্যে ফোরম্যান হয়ে যাব।

শেফালী ॥ (নবকে) তাই হও বাবা। তোমরা দুজনেই খুব ভাল—সেইভাবে থাক।

নব ॥ আমিও শুতে যাচ্ছি, বাপি।

শেফালী ॥ এটাই সবচেয়ে ভাল হল, না গো ?

শশধর ॥ হ্যাঁ, সবচেয়ে ভাল। একমাত্র উপায়। প্রত্যেক জিনিসই—যাকগে, শুয়ে পড়। তোমার বিশ্রাম দরকার।

শেফালী ॥ তুমি কিন্তু দেরী কর না।

শশধর ॥ না গো, না। ব্যাটা আমায় ভালবাসে। এতদিন ধরে আমায় ভালবেসেছে। আমি আগে কেন ওকে বুঝতে পারিনি ! দাদা কাল যদি বড় ব্যাটা আমার ইনসিওরেন্সের বিশ হাজার টাকা পায়—ভাবতে পার কত বদলে যাবে। আবার আমার ব্যাটা সুশান্তকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাবে।

নটবরের স্বর ॥ নিশ্চয় যাবে। আসামের জঙ্গলে আমি বহু টাকা ফেলে এসেছি।

শশধর। তোমার ব্যাটা সেখানে যাবে—তবে ঐ বিশ হাজার টাকা পাওয়ার পর।

শশধর ॥ তুমি ঠিক বলছ তো দাদা?

নটবরের স্বর ॥ আমি ঠিকই বলছি।

শশধর ॥ তবে আমি এই ব্যবস্থাই করব। তুমি দেখেছ দাদা, বড়ব্যাটা কি রকম ছেলেমানুষের মত কাঁদল। আমি যদি ওকে আবার আগের মত আদর করতে পারতাম।

নটবরের স্বর ॥ সেদিন অনেক পেছনে ফেলে এসেছ শশধর। আর ফেরা যায় না। এবার চল, নইলে আমাদের দেরী হয়ে যাবে।

শশধর ॥ আমি জানতাম দাদা, ব্যাটা বিরাট হবে।

নটবরের স্বর ॥ আর দেরী করা যায় না, শশধর। চল।

শশধর ॥ আমি বেঁচে থেকে তোর জন্যে কিছু করতে পারিনি। তাই আজ তোর জীবনের পথ খুলে দিচ্ছি। তুই স্বাধীন হবি, বিরাট হবি। সুশান্তকে ছাড়িয়ে অনেক এগিয়ে যাবি। আমি দূর থেকে দেখব। দাদা—দাদা, তুমি কোথায়? আমি যে তোমার সঙ্গে যাব। অচেনা রাস্তায় আমি একা কি করে চলব?

শেফালী ॥ ওগো শুনছ?

শশধর ॥ চুপ! [এদিক ওদিক খোঁজে, শব্দ জোর হয়] চুপ, চুপ...

শেফালী ॥ ওগো......

শশধর ॥ দাদা, দাদা, আমি যাব। তুমি দাঁড়াও আমি যাচ্ছি। দাদা! [ছুটে বেরিয়ে যায়]

শেফালী ॥ কি হলো গো?......[দূরে গাড়ীর শব্দ হয়ে ওঠে, বাড়ীর কাছাকাছি এসে জোরে ব্রেক কষে] শশধরের আর্তনাদ শোনা যায়।] না—না। [বিবেক শেফালীর ওগো শুনছ'য় ওঠে দাঁড়িয়েছিল। বেগে নীচে নেমে আসে—থেমে যায়। নব দাঁড়িয়েছিল, বসে পড়ে। শেফালী একজায়গায় দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছিল। বিবেক এসে মাকে ধরে, ছেলের স্পর্শে শেফালী সম্বিত ফিরে পায়—ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে।]

পর্দা নেমে আসে।

*অভিনয়ের জন্যে নাট্যকারের অনুমতি প্রয়োজন   যোগাযোগের একমাত্র ঠিকানা চতুর্মুখ, ৪৯।১, বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-৯।

মঞ্চস্থাপনা প্রসঙ্গে নাট্যকারের বক্তব্য ঃ—

সমগ্র মঞ্চটিকে মোট তিনভাগে ভাগ করলে ভাল হয়। বাঁদিকে শশধরের ঘর, পেছনে একটু উঁচুতে ছেলেদের। ছেলেদের ঘরের নীচ দিয়ে বাথরুম ও রান্নাঘরে যাওয়ার দরজা রাখা যেতে পারে। ডানদিকে কাল্পনিক ভোলা দত্ত। গোপাল সান্ন্যাল ও ওপেন এয়ার রেষ্টুরেন্টের দৃশ্যগুলি দেখান যায়।

কাল্পনিক (বা অতীত) দৃশ্যের পাত্র পাত্রীরা কোন সাধারণ দরজা ব্যবহার করবে না। এদের আসা যাওয়া অস্পষ্ট করতে পারলে সুবিধে হবে।

কাল্পনিক (বা অতীত) দৃশ্যে শশধর ও শেফালী চশমা ব্যবহার না করে শুধুমাত্র বর্ত্তমান দৃশ্যগুলিতে চশমা ব্যবহার করলে বয়স কমান বা বাড়ান দেখানর ব্যাপারে খানিকটা সুবিধে হতে পারে।

প্রয়োগের দায়িত্ব পরিচালকের নিজস্ব—তিনি ইচ্ছামত সাজিয়ে নিতে পারেন।

এই নাটক অভিনয়ে এঁরাও বিভিন্নভাবে অংশ গ্রহণ করেছেন।

আলোক বিভাগে ঃ অজিত মিত্র

ছোটনব-র ভূমিকায় ঃ বাবু সরকার

মেয়েটি-র " ঃ রেণু ঘোষ

চুমকি-র " ঃ উত্তরা দাস

একাঙ্ক নাটক

উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে

শৈলেশ গুহ নিয়োগী

: চরিত্র :

পশুপতি, জিতেন, অনিল, পটল, মৃণাল, পুরোহিত, বসন্ত, রতন, মিনু, ক্ষ্যান্তমণি।

[একটি বিবাহ-বাসর। জিতেনকে ঘিরে তুমুল হৈ চৈ চলছে। জিতেন বরের ছোট ভাই। সে তার দাদার অনুপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে। কন্যাপক্ষ তার কোন কৈফিয়ৎ শুনতে রাজী নয়। পর্দা খুলতে দেখা যায় কনের বাবা, দাদা, মামা এবং আরো দু' একজন জিতেনকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে প্রাঙ্গনের এক কোণ থেকে আরেক কোণ পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে। কেউ তার জামার কলার ধরেছে; কেউ তার হাত ধরেছে। কনের বাবা পশুপতির গলা শোনা যায়।]

পশুপতি॥ এটা কি ছেলে খেলা! বিয়ের সব ঠিক—এখন এসে বললেন দাদার ছুটি ক্যানসেল হয়ে গেছে! দাদা আসতে পারবে না! ন্যাকামো করবার জায়গা পাওনি!

জিতেন॥ আপনারা বুঝতে পারছেন না কেন, দাদার পুলিশের চাকরী।

পশুপতি॥ সব বুঝতে পারছি, চালাকী করে অন্য মেয়ে বিয়ে করতে গেছে।

জিতেন॥ ছি ছি—ও কথা বলবেন না। দাদা দেবতুল্য লোক।

পশুপতি॥ তোমার দাদা একটি আস্ত জোচ্চর। চোর ডাকাতদের সঙ্গে কাজ করে সেও একটি ঠগবাজ তৈরী হয়েছে।

জিতেন॥ কি মুশকিল! আপনাদের কি করে বোঝাই—পুলিশের ছুটি যে কোন সময় ক্যানসেল হয়ে যেতে পারে।

পশুপতি॥ বিশ্বাস করি না। যে অফিসার ছুটি ক্যানসেল করেছে সে কি কোনদিন বিয়ে দেখেনি না তার নিজের বিয়ে হয়নি?

জিতেন॥ তিনি অল্প বয়েসের অফিসার। তাঁর এখনও বিয়ে হয়নি।

পশুপতি ॥ (চিৎকার করে) তার হয়নি, তার বাবার তো বিয়ে হয়েছে !

[কনের মামা অনিল পশুপতিকে থামানোর চেষ্টা করে]

অনিল ॥ জামাইবাবু, আপনি চুপ করুন। সকাল থেকে না খেয়ে আছেন। আমি দেখছি কি করা যায়।

পশুপতি ॥ কি সর্বনাশের কথা বলতো অনিল ! এতগুলো টাকা খরচা করে বিয়ের সব ব্যবস্থা করলাম, টাকাগুলো কি জলে যাবে ?

জিতেন ॥ জলে যাবে কেন ? বিয়ের জিনিসপত্রগুলো তুলে রেখে দিন পরের লগ্নে বিয়ে দিলেই হবে।

পশুপতি ॥ (চড়াগলায়) মুর্খ—এ বছরে আর বিয়ের লগ্ন নেই।

[কনের বড় ভাই পটল জামার হাতা গুটিয়ে যায়]

পটল ॥ বাবা, সরো তো—ছোটলোককে আমি ঠাণ্ডা করে দিই—

জিতেন ॥ আমাকে শুধু শুধু ঠাণ্ডা করবেন কেন ? আমি একেবারেই গরম হইনি।

অনিল ॥ গরম না হওয়াটাই তো শয়তানী। ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে খুনের সমান।

পশুপতি ॥ অনিল, যা হোক একটা ব্যবস্থা করো। এরকম বদমাইসী কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।

অনিল ॥ আপনি চিন্তা করবেন না জামাইবাবু। এ বিয়ে হতেই হবে।

পটল ॥ না না মামা, দরকার নেই। এই রকম ছোটলোকের সঙ্গে মিনুর বিয়ে না দেওয়াই ভাল।

পশুপতি ॥ কি বলছিস হতভাগা। আমার জি, পি ফাণ্ডের তিন হাজার টাকা খরচ করে ফেলেছি। এই অবস্থায় পিছিয়ে আসব কি করে ?

পটল ॥ এগোলে যে তোমার আরো টাকা জলে যাবে বাবা।

অনিল ॥ পটল, তুই থাম। জামাইবাবুকে আর পাগল করে দিস না।

[পাড়ার মৃণাল ও বসন্ত এগিয়ে আসে]

মৃণাল ॥ পশুপতিবাবু, আপনারা নারভাস হবেন না। আমি এ পাড়ার ছেলে। পটল আমার বন্ধু। আমি থাকতে আপনাদের কোন ভয় নেই।

[হঠাৎ বাড়ীর ভেতর থেকে কনের পিসি ক্ষ্যান্তমণি সুর করে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে আসে]

ক্ষ্যান্তমণি॥ ওরে আমার কি হোলরে—। আমার মিনুর কপালে এই ছিল রে—

পশুপতি॥ দিদি, চুপ কর। ওরকম করে কেঁদে পাড়ার লোক জড় কোর না।

ক্ষ্যান্তমণি॥ (একইভাবে সুর করে কাঁদে) ওরে পশু, তাহলে আমি কেমন করে কাঁদব রে—

পশুপতি॥ আঃ, বাড়ীর মধ্যে যাও না। মেয়েছেলেদের এসব ব্যাপারে থাকতে নেই।

ক্ষ্যান্তমণি॥ (একইভাবে কাঁদে) আমি কেন ব্যাটাছেলে হোলাম নারে—

পুরোহিত॥ উন্মাদ হইলা নাকি তোমরা? শুভ কার্যে চোক্ষের জল ফ্যাল্‌লে বিঘ্ন ঘটে জান না?

পশুপতি॥ পুরুত মশাই, আপনি দিদিকে ভেতরে নিয়ে যান।

পুরোহিত॥ আইলাম নমঃ বিষ্ণু কইরা বিবাহ করাইতে, অহন দেহি সব কয়ডাই পাগল। আস আমার লগে।—

[পুরোহিত ক্ষ্যান্তমণির হাত ধরে ভেতরে চলে যায়]

বসন্ত॥ পশুপতিবাবু, আপনি বাড়ীর মধ্যে যান। ব্যাপারটা আমাদের হাতে ছেড়ে দিন।

পশুপতি॥ বেশ কথা বললে বসন্ত। আমার মেয়ের বিয়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আর আমি বাড়ীর মধ্যে গিয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকব?

বসন্ত॥ আপনাদের বাড়ীর মধ্যে কান্নাকাটি পড়ে গেছে। আপনার সবার আগে সেখানে সামলান উচিৎ।

পশুপতি॥ কোনটা উচিৎ কোনটা অনুচিৎ সেটা আমি বুঝব ছোকরা। অন্যের ব্যাপারে তোমাদের নাক গলাতে হবে না।

বসন্ত॥ (উত্তেজিত হয়ে) একশ'বার নাক গলাব। আমরা পাড়ার ছেলে, আমাদের একটা দায়িত্ব আছে।

পশুপতি॥ মায়ের চেয়ে যার বেশি দরদ তার নাম ডাইনি!

মৃণাল॥ আপনারা পাগল হলেন নাকি? সেম্‌-সাইড হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছেন না?

পটল॥ না না যা হচ্ছে হোক। এর একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওয়া দরকার।

অনিল॥ পটল তোর বড্ড বাড় হয়েছে। চিরকাল তো বথামি করে

কাটালি। ঘাড়ের ওপর একটা আইবুড়ি বোন পড়ে আছে, কোন-সময় ভেবেছিস সে কথা ?

পটল ॥ (রেগে) মামা, মুখ সামলে কথা বলো—বলে দিচ্ছি। রেগে গেলে বাবা মামা কিচ্ছু মানব না।

মৃণাল ॥ (চীৎকার করে) আপনারা চুপ করুন। বিপদের সময় যদি আপনারা নিজেদের মধ্যে এইভাবে ঝগড়া করেন এর ফল কি হবে ভাবতে পারছেন ? আপনারা কি ভুলে গেলেন ইউনাইটেড উই স্ট্যাণ্ড, ডিভাইডেড্ উই ফল্ !

বসন্ত ॥ এখন মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবুন কি করা যায়।

পশুপতি ॥ মাথা ঠাণ্ডা বললেই কি মাথা ঠাণ্ডা রাখা যায় !

বসন্ত ॥ তাহলে প্রাণপণ চিৎকার করুন, আঁর সেই সুযোগে বরের ভাই এক পা দু'পা করে পালিয়ে যাক।

[সবাই তাকিয়ে দেখে জিতেন পালাবার সুযোগ খুঁজছে]

অনিল ॥ তাই তো ! ওযে পালাবার চেষ্টা করছে—

পশুপতি ॥ (চড়াগলায়) এই এদিকে এসো। এগিয়ে এসো—

জিতেন ॥ আমাকে আটকে রেখে কি লাভ ?

পটল ॥ লাভ লোকসান আমরা বুঝব—

মৃণাল ॥ মারো শালাকে—

সবাই ॥ মারো—মারো—

জিতেন ॥ (অসহায়ভাবে) শুনুন—শুনুন—

[সবাই জিতেনকে ধরে বেদম প্রহার দিতে আরম্ভ করে। জিতেন আত্মরক্ষার জন্যে মাটিতে শুয়ে পড়ে। ভেতর থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে আসে বাড়ীর ভৃত্য রতন]

রতন ॥ বাবু, দাদাবাবু, সর্বনাশ হয়েছে !

পশুপতি ॥ কি হয়েছে রতন !

রতন ॥ দিদিমনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

পশুপতি ॥ মিনু অজ্ঞান হয়ে গেছে ! কেন ?

অনিল ॥ কেন আবার—সাডেন শক্। শিগগির চলুন ভেতরে।

[পশুপতি ও অনিল বাড়ীর ভেতরে চলে যায়। রতন কাঁদতে আরম্ভ করে]

রতন ॥ (চোখ মুছতে মুছতে) দাদাবাবু, কি সর্বনাশ হলো—

পটল ॥ রতন, তুই এখানে দাঁড়িয়ে বোকার মত কাঁদছিস কেন ?

রতন ॥ কেন কাঁদব না দাদাবাবু—তোমাদের মা মরে গিয়েই যে আমার যত জ্বালা। আমাকেই যে তোমাদের মা হয়ে চোখের জল ফেলতে হচ্ছে। আমাকে আর রতন বলে ডেকো না দাদাবাবু। তোমরা আমাকে রতন-মা বলে ডেকো—

[রতন আবার কাঁদতে কাদতে বাড়ীর মধ্যে চলে যায়]

মৃণাল ॥ (জিতেনকে) আপনারা কি অবস্থার সৃষ্টি করেছেন, বুঝতে পারছেন ?

জিতেন ॥ বুঝতে পারছি। আমি অত্যন্ত দুঃখিত। এবার আমাকে ছেড়ে দিন—আমি দাদার সঙ্গে দেখা করে সমস্ত ব্যাপারটা বলি গিয়ে।

পটল ॥ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন। বাবা আর মামা না ফেরা পর্যন্ত এক পা এখান থেকে নড়তে পারবেন না।

জিতেন ॥ আচ্ছা বিপদে পড়া গেছে।

বসন্ত ॥ এ আর কি বিপদ ? সবে ধোলাই শুরু করেছিলাম—বাধা পড়ে গেল। না হ'লে তেলী পাড়ার মার কাকে বলে বুঝিয়ে দিতাম।

[ভেতর থেকে পুরোহিত বেরিয়ে আসে]

পটল ॥ পুরুত মশাই, মিনু এখন কেমন আছে ?

পুরোহিত ॥ চেতনা ফিরছে। পুঞ্জীভূত বেদনাই মুরছা, যাওনের কারণ।

পটল ॥ কি করে জ্ঞান ফিরল ?

পুরোহিত ॥ মুদ্রিত চক্ষুযুগলে সজোরে জলের ঝাপটা মারতে মারতে খুইলা গেছে।

পটল ॥ যাক, কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

পুরোহিত ॥ নিশ্চিন্ত হওনের কিছু নাই। কারণ সেই যে চক্ষু খুলছে তো খুইলাই রইছে। আর তা বন্ধ হয় না। ঠিক যেন প্রস্তর নির্মিত দুইটা চক্ষু—নড়েও না চড়েও না।

মৃণাল ॥ সে কি, এই অবস্থায় বিয়ে কি করে হবে ?

পুরোহিত॥ মাইয়ার কিন্তু পুরা টনটনা জ্ঞান রইছে। চক্ষু মেইলাই কয়—'আমার বিয়ার কি হইল পুরুত মশাই?' আমি তারে সান্ত্বনা দিয়া কইলাম—হইব মা লক্ষ্মী, হইব। মনে মনে ভাবলাম ছাতা হইব।

মৃণাল॥ আপনি হাল ছাড়বেন না পুরুত মশাই। আমরা পাড়ার ছেলে যে করে হোক বিয়ে হওয়াব।

পুরোহিত॥ পাড়ার পোলাগো আমার জানতে বাকী নাই। মুখেই খালি বচন চচ্চরী।

বসন্ত॥ পুরুত মশাই আপনি তেলীপাড়ার ছেলেদের ক্ষমতা দেখেননি, তাই ও কথা বলছেন।

পুরোহিত॥ রাখ রাখ, তেলীপাড়া! পাড়াশুদ্ধা এক ফোঁটা তেল নাই আবার নাম দিয়েছে তেলীপাড়া!

জিতেন॥ (কাতর কণ্ঠে) দেখুন একটা কথা বলছিলাম—দয়া করে যদি—

[ভেতর থেকে পশুপতি ও অনিল বেরিয়ে আসে]

অনিল॥ আর কোন ভয় নেই—মিনু সম্পূর্ণ সুস্থ।

জিতেন॥ আমি এখন যাব?

অনিল॥ এতই সোজা? জোচ্চরকে হাতের নাগালে পেয়ে ছেড়ে দেব?

আমাকে শুধু শুধু দোষারোপ করছেন। এরকম জানলে আমি এখানে আসতাম না। বিয়ে যখন হবার আশা নেই আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিন।

অনিল॥ আলবৎ বিয়ে হবে। পুরুত মশাই আপনি কাজ আরম্ভ করুন।

পুরোহিত॥ বাজে ফ্যাচর ফ্যাচর কইরো না। বরের নামে পাত্তা নাই, বিয়া হইব কি কলা গাছের লগে?

অনিল॥ আমি যদি বর দেখিয়ে দিতে পারি?

পশুপতি॥ তার মানে?

পটল॥ কোথায় বর?

অনিল॥ আছে। তোমরা দেখতে চাও?

সবাই॥ চাই।

অনিল॥ (জিতেনকে দেখিয়ে) ঐ তো বর। ওর গলায় ঝুলিয়ে দাও।

জিতেন॥ (ভয়ে) না—না ওকথা বলবেন না।

পশুপতি॥ ঠিক বুদ্ধি দিয়েছ অনিল। ধরো ওকে।

সবাই ॥ ধরো—ধরো—

জিতেন ॥ (কাতর কণ্ঠে) শুনুন—শুনুন—দয়া করুন—

পশুপতি ॥ আর একটা কথাও না। ভাল ছেলের মত এখানে এসে দাঁড়াও।

জিতেন ॥ আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন।

মৃণাল ॥ কোন কথা শুনতে চাই না।

বসন্ত ॥ (হাত গুটিয়ে) এর নাম তেলীপাড়া। মারের চোটে বাপের নাম ভুলিয়ে দেব।

জিতেন ॥ মারুন—বাপের নামও ভুলিয়ে দিন; কিন্তু দয়া করে আমার সঙ্গে বিয়ে দেবেন না।

পশুপতি ॥ পুরুত মশাই আপনি দেরী করছেন কেন? মন্ত্র পড়তে আরম্ভ করুন।

পুরোহিত ॥ (ট্যাক থেকে ঘড়ি বার করে দেখে) শ্যাষ হইতে আর পাঁচ মিনিট বাকী আছে। মন্ত্র পইড়া কাম নাই। মাইয়ারে আইনা সাতপাক ঘুরাইয়া দাও।

পশুপতি ॥ (উচ্চস্বরে) রতন, মিনুকে নিয়ে আয়।

[নেপথ্য থেকে রতনের কণ্ঠ শোনা যায়—'আনছি বাবু']

জিতেন ॥ আপনাদের পায়ে ধরছি—এ কাজ আপনারা করবেন না।

[রতন মিনুকে সঙ্গে নিয়ে উলুধ্বনি করতে করতে বেরিয়ে আসে]

পটল ॥ এখানে নিয়ে আয়—

[রতন প্রাঙ্গনের মাঝখানে যেতে থাকে। জিতেন হাউ হাউ করে ওঠে]

জিতেন ॥ (কাঁদতে কাঁদতে) আপনাদের কি প্রাণে দয়া নেই। একলা পেয়ে আপনাদের যা খুশী তাই করছেন। আমি বিয়ে করব না।

পশুপতি ॥ একশবার করবে। তোমাদের চোদ্দগুষ্টিকে বিয়ে করিয়ে ছাড়ব।

জিতেন ॥ (মিনুর কাছে গিয়ে) আপনি আমাকে বাঁচান।

মিনু ॥ বিয়ে করতে আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন? বিয়ের পর দেখবেন, কত সুখ—কত আনন্দ—

জিতেন ॥ আপনাদের কি করে বোঝাই। আমি বিয়ে করতে পারি না। আমার অসুবিধে আছে।

পটল ॥ অসুবিধে থাকলে ছেড়ে দেওয়া ভাল। এই শালাদের বিশ্বাস নেই। কোথাও কোন গণ্ডগোল পাকিয়ে বসে আছে।

অনিল ॥ তোমার মত অপদার্থের কথা শুনলে আমাদের চলবে না। যা করছি করতে দাও।

পটল ॥ মুখ সামলে কথা বলো মামা। রেগে গেলে আমি কিন্তু মানুষ থাকি না।

পশুপতি ॥ (ধমক দিয়ে) চুপ কর পটলা। লঘু গুরু জ্ঞান নেই।

জিতেন ॥ (মিনুকে) আপনি কি আমার অনুরোধ শুনবেন না?

মিনু ॥ আপনার কি অসুবিধে আছে বলুন?

জিতেন ॥ আমি—আমি ডলিকে কথা দিয়েছি।

মিনু ॥ ডলিকে কথা দিয়েছেন! ওরকম কথা আমাকেও এর আগে সাতজন দিয়েছিল। কৈ তারা তো কেউ আমায় বিয়ে করেনি!

পশুপতি ॥ ছি ছি মা ওকথা বলতে নেই।

মিনু ॥ কেন বলব না বাবা। আমার এত বয়স হয়ে গেল তবু তোমরা একটা বিয়ে দিতে পারলে না। যাও বা অতিকষ্টে একজনের সঙ্গে ঠিক করলে সেও এলো না। আমি কি তোমার কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে?

জিতেন ॥ আমায় কথাটাও দয়া করে একবার চিন্তা করুন।

মিনু ॥ (ধমক দিয়ে) চুপ করুন! আপনার কোন কথা শুনব না। আপনাকেই আমি বিয়ে করব। আপনি রেডি?

জিতেন ॥ আনরেডি (হাত জোড় করে) দোহাই আপনার। আমি কোন দোষ করিনি।

পশুপতি ॥ (গলা চড়িয়ে) কি বললে—দোষ করোনি? এতগুলো টাকার শ্রাদ্ধ করেও বলা হচ্ছে কোন দোষ করিনি! দাঁড়াও এখানে সোজা হয়ে।

জিতেন ॥ (হঠাৎ রেগে) না দাঁড়াব না। দেখি আপনারা কি করে আমার বিয়ে দেন!

[জিতেন দু'হাতে শূন্যে ঘুষি চালাতে থাকে। সবাই কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে হক চকিয়ে যায়]

পটল ॥ কি—আমাদের পাড়ায় এসে আমাদের ওপর রোয়াবী দেখান হচ্ছে! মার শালাকে—

[পটল এগিয়ে যায়। মৃণাল ও বসন্ত মালকোচা মেরে প্রস্তুত হয়]

মৃণাল ॥ আমরা রেডি পটলা। তুই হিট কর।

[পটল সুযোগমত জিতেনের গলা চেপে ধরে। মিনু বাধা দেয়।

মিনু ॥ কি করছিস ছোড়দা। ছেড়ে দে—ছেড়ে দে—

[পটলা জিতেনকে ছেড়ে দিয়ে হাঁপাতে থাকে]

পটল ॥ একটা জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। মেরেই ফেলে দেব শালাকে—

মিনু ॥ (ধরা গলায়) ছোড়দা কেন তুই ওকথা বলছিস ? তুই কি জানিস না—ওকে মেরে ফেললে আমি বিধবা হব।

জিতেন ॥ (হাঁপাতে হাঁপাতে মিনুকে) বাজে বকবেন না—আমি কি আপনার স্বামী যে আমি মরে গেলে আপনি বিধবা হবেন ? আমি এখুনি মরব। দেখি আপনি কি করে বিধবা হন ?

মিনু ॥ (বিকট আওয়াজ করে) বাবা ওকে বাঁচাও—

[হঠাৎ মিনু চোখ উল্টে অচৈতন্য হয়ে যায়। পশুপতি ও অনিল দৌড়ে গিয়ে ধরে]

পুরোহিত ॥ মাইয়াটা পুনরায় চেতনা হারাইল।

অনিল ॥ (দু'হাতে ঝাঁকিয়ে) মিনু—মিনু—

[মিনু চোখ মেলে তাকায়]

মিনু ॥ আমার বিয়ে হবে না মামাবাবু ?

অনিল ॥ হ্যাঁ—হবে। (জিতেনকে দেখিয়ে) ঐ যে তোমার স্বামী দাঁড়িয়ে আছে।

[মিনু এগিয়ে গিয়ে অর্দ্ধ চৈতন্য অবস্থায় বলতে থাকে]

মিনু ॥ তাই তো—এই তো আমার স্বামী।

জিতেন ॥ না—না—আমি স্বামী নই।

পশুপতি ॥ চোপরাও উল্লুক ! ওকে বলতে দাও। দেখছ না ওর জ্ঞান এখনও সম্পূর্ণ ফেরেনি।

জিতেন ॥ (অসহায় ভাবে) আচ্ছা বলুন।

মিনু ॥ (অর্দ্ধ উন্মাদ অবস্থায়) আপনি আমার ইহকাল—পরকাল। অর্দ্ধাঙ্গ —পূর্ণাঙ্গ। আপনি পতি—আপনি স্বামী।

জিতেন ॥ (ঢোক গিলে) আপনার বলা শেষ হয়েছে ?

মিনু ॥ না আরো আছে। আপনার কুলোর মত বক্ষপটে আশ্রয় দিয়ে, চাপাটীর মত প্রশস্ত ললাটে চন্দন নিয়ে, গণ্ডারের মত গণ্ডদেশে মাল্য দিয়ে, কাঙ্গারুর মত পদযুগলে প্রণাম নিয়ে আমায় গ্রহণ করুন—

পুরোহিত ॥ খাইছে—এযে রীতিমত বিকার!

[বাড়ীর মধ্য থেকে বঁটী হাতে অর্দ্ধ উন্মাদ অবস্থায় বেরিয়ে আসে ক্ষ্যান্তমনি]

ক্ষ্যান্তমনি ॥ আজ তোকে খুন করব!

[সবাই ভয়ে দু'পাশে সরে যায়। ক্ষ্যান্তমনি জিতেনের সামনে এসে দাঁড়ায়] এই তো—একেই খুঁজছিলাম—

জিতেন ॥ (ভয়ে হাত জোড় করে) জয় মাকালী রক্ষা করো—আমি নই—দাদা—

ক্ষ্যান্তমনি ॥ দাদা—টাদা জানি না। মাথা নীচু কর। এখুনি তোকে বলি দেব!

জিতেন ॥ করছি। (হাঁটু গেড়ে বসে) বিদায় পৃথিবী—

ক্ষ্যান্তমনি ॥ (বঁটী তুলে) জয় মা—

অনিল ॥ (ক্ষ্যান্তমনির হাত থেকে বঁটীখানা কেড়ে নেয়) কি করছেন? খুন করবেন নাকি? চলুন ভেতরে—চলুন—

[অনিল ক্ষ্যান্তমনির হাত ধরে ভেতরে নিয়ে যায়]

পশুপতি ॥ পুরুত মশাই, আপনি মন্ত্র পড়তে দেরী করছেন কেন?

পটল ॥ ও ব্যাটা কাজের নামে অষ্টরম্ভা। কেবল কনের কাছে তখন থেকে ট্যাকর ট্যাকর করছে। দু'ঘা না দিলে ইঞ্জিন ষ্টার্ট করবে না।

পুরোহিত ॥ (রেগে) কি—ঘা মাইরা ইঞ্জিন ষ্টার্ট করাইতে চাও? আউগাও দেহি কত ক্ষমতা—

[অনিল বেরিয়ে আসে]

অনিল ॥ আহা পুরুত মশাই, আপনি পাগল হলেন নাকি?

পুরোহিত ॥ পাগল আমি হইছি না তোমাগো গুষ্টি পাগল হইছে। অসভ্য পরিবার!

পটল ॥ মুখ সামলে কথা বলো পুরুত মশাই। ভবলীলা সাঙ্গ করে দেব বলছি!

পশুপতি ॥ (চেঁচিয়ে) এই হারামজাদা পটলা, চুপ করবি কিনা বল?

পটল ॥ চুপ করে করেই তো সব কাজ পণ্ড হতে বসেছে।

পশুপতি ॥ (চিৎকার করে) চু-প্।

পুরোহিত ॥ ইঁচড়ে পক্ক পোলা কোথাকার !

অনিল ॥ থাক পুরুত মশাই, আপনি মাথা ঠাণ্ডা করুন।

পুরোহিত ॥ আইজ সক্কাল বেলা যখনই আমার ইস্ত্রীর মুখ দেইখ্যা উঠ্‌ছি তখনই ভাবছি আইজ আমার কপালে কি আছেরে মশাই—

মিনু ॥ পুরুত মশাই, আমার বিয়ে হবে না ?

পুরোহিত ॥ হইব মা লক্ষ্মী—হইব—।

মিনু ॥ কখন হবে ?

পুরোহিত ॥ অহনই হইব। (ঘড়ি দেখে) সর্বনাশ কাম সারছে! লগ্ন চইলা যাইতে মাত্র এক মিনিট সময় আছে। মা লক্ষ্মী, তুমি সত্বর বরের চতুর্দিকে সাতবার পাক খাইয়া লও।

পশুপতি ॥ সে কি, পিঁড়ি আনবে না ?

পুরোহিত ॥ সময় নাই। দৌড়াও মা লক্ষ্মী !

[মিনু ইতস্তত করতে থাকে]

জিতেন ॥ খবরদার, ভাল হবে না বলছি—

অনিল ॥ বসন্ত, মৃণাল তোমরা জিতেনকে শক্ত করে ধর।

মৃণাল ॥ ঘাবড়াবেন না মামাবাবু। আমরা বরের পায়ে বল্টু এঁটে টাইট করে দিচ্ছি। [মৃণাল ও বসন্ত জিতেনকে শক্ত করে ধরে রাখে। জিতেন ছটফট করতে থাকে]

পুরোহিত ॥ দৌড়াও মা লক্ষ্মী—দৌড়াও—

[মিনু দৌড়ে জিতেনের চারদিকে ঘুরতে থাকে। রতন উলুধ্বনি দেয়]

জিতেন ॥ (চিৎকার করে) একি মগের মুল্লুক নাকি ? আমি কেস করব। জেলে পুরব।

বসন্ত ॥ (ধমক দেয়) চুপ্, হাতুড়ী মেরে মাথা ভেঙ্গে দেব।

[জিতেন ভয়ে চুপ করে। ততক্ষণ মিনুর সাতপাক ঘোরা হয়ে গেছে]

পশুপতি ॥ (খুশী হয়ে) যাক—ভালভাবেই শুভকাজ সম্পন্ন হয়ে গেল।

[সাতবার ঘুরে মিনুর মাথা ঘুরতে থাকে]

মিনু ॥ (টলতে টলতে) আমার ভীষণ মাথা ঘুরছে পুরুত মশাই—

পুরোহিত ॥ ভয় নাই। ঘুরানী লাগছে।

অনিল ॥ উল্টোদিকে আবার সাতবার ঘোর তাহ'লে মাথা ছেড়ে যাবে।

পুরোহিত ॥ খবরদার মা লক্ষ্মী—ঐ কম্মও কইরো না, উল্টা পাক দিলেই বিবাহ বন্ধন খুইলা যাইব। অরা মুর্খ, অগো বুদ্ধি সুদ্ধি নাই। একটু সময় খাড়াইয়া থাক, আপনিই মাথা ছাইড়া যাইব।

পটল ॥ এই রতন হতভাগা—হাঁ করে কি দেখছিস ? ভেতরে গিয়ে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কর।

রতন ॥ আমায় অত করে বলতে হবে না দাদাবাবু। আমি মেয়ের মা হই। আমার সব খেয়াল আছে।

পশুপতি ॥ (চমকে) কি বললি—কি বললি তুই ?

রতন ॥ (চাপা গলায়) ছিঃ, জামাই-এর সামনে ওভাবে কথা বলতে নেই।

[রতন লজ্জার হাসি হেসে ভেতরে চলে যায়। পশুপতি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে]

পশুপতি ॥ এই পটলা। সবাইকে ভেতরে নিয়ে যা।

পটল ॥ হ্যাঁ যাই। আয় মৃণাল, বসন্ত—

পুরোহিত ॥ মুর্খ, পুরোহিতেরে আগে না খাওয়াইয়া নিজেরা গিললে নরকে যাইবা।

পশুপতি ॥ ঠিকই তো—আসুন পুরুত মশাই। আপনার খওয়ার ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি।

পুরোহিত ॥ এতক্ষণে তোমাগো চেতনা হইছে। রাক্ষসের গুষ্টি !

[রতন বেরিয়ে আসে]

রতন ॥ সবাই আসুন ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

অনিল ॥ নিমন্ত্রিত লোকজন কেউ এলো না, আমাদের আগে বসা কি ঠিক হবে ?

রতন ॥ ওমা—তাও জানো না ! তোমাদের সরকার নেমন্তন্নের দফা যে শেষ করে দিয়েছে। এসো—এসো কত কাজ পড়ে রয়েছে—

[মিনু ও জিতেন ছাড়া সবাই ভেতরে চলে যায়]

জিতেন ॥ কাজটা খুব ভালো হোল না। ডলিকে এখন আমি কি কৈফিয়ৎ দেব ?

মিনু ॥ (গম্ভীরভাবে) বিয়ের পর অন্য মেয়ে সম্বন্ধে চিন্তা করা চরিত্রহীনতার লক্ষণ।

জিতেন ॥ একজন মেয়েকে কথা দিয়ে আরেকজনকে বিয়ে করা বুঝি খুব সৎ চরিত্রের লক্ষণ ?

মিনু ॥ সামান্য ব্যাপার নিয়ে অত ভাবছ কেন ?

জিতেন ॥ সামান্য ব্যাপার ! ডলি শুনলে ঠিক আত্মহত্যা করবে।

মিনু ॥ করবে না।

জিতেন ॥ তার মানে ?

মিনু ॥ আমি বলছি ডলি আত্মহত্যা করবে না।

জিতেন ॥ ডলিকে আপনি—তুমি চেন ?

মিনু ॥ সুধীরবাবুর মেয়ে তো ?

জিতেন ॥ হ্যাঁ—

মিনু ॥ সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে ?

জিতেন ॥ (অবাক হয়ে) হাঁ—

মিনু ॥ (হেসে) আত্মহত্যা করবে না।

জিতেন ॥ কেন ?

মিনু সে আরেকজন ছেলেকে বিয়ে করার জন্যে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

জিতেন ॥ তুমি কি করে জানলে ?

মিনু ॥ আমিও যে সেই লাইনেই ছিলাম।

জিতেন ॥ (চমকে) এ্যাঁ—কি বলছ তুমি ?

মিনু ॥ ঠিকই বলছি। ব্যর্থতার জন্যে আজকাল কোন মেয়েই আত্মহত্যা করে না। ভালবাসা যদি অপরাধ না হয়, তা হলে বহুজনকে ভালভেসে অবশেষে একজনকে বিয়ে করাই সবচাইতে ভাল।

জিতেন ॥ (দু'হাতে মাথা চেপে) চুপ করো—চুপ করো—আমি পাগল হয়ে যাব।

দি এ্যালিয়েনেশান এফেক্ট

মূল রচনা : **বার্টল্ট ব্রেখ্‌ট্‌**

অনুসরণে : **সমরেশ মজুমদার**

আদি মানব তার প্রিয়ার কাছে পৃথিবীর সেই প্রথম দিনে কোন ভাষার অনাশ্রয়েই হয়তো গল্প শুনতো। প্রিয়ার চোখের ভাষায় বুঝি সে গল্প তিলে তিলে গড়ে উঠতো। তারপর মুখের ভাষা এলো। বলবার ভঙ্গী এলো সেই পথে। এই বলার ভঙ্গীর পালাবদল হলো বিভিন্ন মনের বিভিন্ন রুচিতে। এক দেশ থেকে অন্য দেশে একই গল্প পরিবেশিত হতে লাগলো বিভিন্ন রীতিতে। শেষতঃ স্বদেশীয় আবহাওয়ায় তার সংস্কৃতির একটা মানদণ্ড তৈরী হল, একটা পন্থা আবিস্কৃত হলো—আমরা যার ফলে সহজেই চিহ্নিত করতে পারি এ রীতি ভারতীয় অথবা ব্রিটিশীয় কিংবা জর্মনীয়। বিশেষত নাটকের ক্ষেত্রে এ বক্তব্য অবশ্যই স্বীকৃত।

অভিনয় সম্পর্কে বিখ্যাত জর্মন নাট্যকার পরিচালক বার্টল্ট ব্রেখট্‌-এর বক্তব্য হলো, যে নাটক মঞ্চে অভিনীত হচ্ছে তার আবেদন দর্শকদের মনের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার ব্যাপারে জর্মন থিয়েটারে অভিনয়ের একটি বিশেষ প্রকরণ রয়েছে। দর্শকদের নাট্যবস্তু সম্পর্কে কৌতুহলের শীর্ষবিন্দুতে পৌছে দেবার জন্যেই নাটকের চরিত্রের মেজাজ দর্শকদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবার উদ্দেশ্যেই এই প্রকরণের সৃষ্টি।

স্পষ্টতই, প্রথম শ্রেণীয় effect সৃষ্টিতে কোন ম্যাজিকের ঠাঁই থাকতে পারে না; কোন সম্মোহণ বিদ্যার কারিকুরি অচল। এপিক-নাটকগুলোতে দেখা যাবে মঞ্চে কোন বিশেষ জায়গার পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা হয় না, (যেমন, সন্ধ্যার ছায়ায় ঘন একটি ঘর অথবা হেমন্তের পাকা ধানের মত রোদে ভেজা একটা লাল সুরকির পথ) অথবা টুকরো টুকরো ছন্দজড়ানো সংলাপে একটা বিশেষ ভাবকে সজীব করার চেষ্টা হয় না। সেখানকার সুর চড়া গলায়

সাধা। আবেগের বন্যায় দর্শক ভেসে যান, অভিনেতাদের শরীরের পেশী সঞ্চালনে হন মুগ্ধ। অর্থাৎ দর্শকদের অন্তলোকে উত্তরণে কোন সহায়তাই সেখানে করা হয় না এবং সব সময়েই তাঁরা জানেন যে তাঁরা অভিনয়ই দেখছেন। কিন্তু দর্শকদের নাটকের মেজাজের সঙ্গে একত্রীকরণ করতে হলে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা দরকার তার পেছনে নিশ্চয়ই একটি শিল্পসম্মত পদ্ধতি থাকা দরকার।

প্রথম শ্রেণীর effect সৃষ্টির জন্য অভিনেতার কর্তব্য, তিনি যা দর্শকের সামনে সৃষ্টি করছেন তার প্রদর্শনে কোন রকম খাদ যেন না থাকে, পরিষ্কার অভিব্যক্তির প্রয়োজন তাই প্রথমেই। ধরা যাক, একটা ঘরের দৃশ্য। সেখানে চার দেওয়ালের অস্তিত্বের ধারণা যা মঞ্চকে দর্শকদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং দর্শকদের উপস্থিতি ভুলে মঞ্চে অভিনয়ের পদ্ধতি অবশ্যই পরিত্যাজ্য। তাহলেই অভিনেতারা দর্শকদের মুখোমুখি হতে পারবেন। স্বভাবতই দর্শক এবং মঞ্চের মধ্যে আত্মীয়তার গভীরতা নির্ভর করছে ভাবের সুষ্ঠু পরিবেশনে। জনসাধারণের চলাফেরা, ব্যবহার, ভাবভঙ্গী বিচিত্রিত করতে এই empathy-র বিশেষ প্রয়োজন আছে অভিনেতার কাছে। ঐতিহাসিক চরিত্র ভিন্ন অন্য কোন মানুষের ছবি মঞ্চে তুলে ধরতে হলে এই empathy-র ব্যবহার করা অবশ্যই দরকার। প্রতিদিন ঘরে বাইরে যা ঘটছে (কোন এক পথ দুর্ঘটনার দর্শক নবাগত কোন ব্যক্তিকে কিভাবে দুর্ঘটনা ঘটলো তা যখন বোঝায় অথবা কোন বন্ধুর হাঁটার অসঙ্গতি নিয়ে তার বন্ধু যখন কৌতুক করে) তা থেকে জনসাধারণের অজানা কোন ঘটনা নিয়ে দর্শকদের মধ্যে একটা চকিত বিভ্রান্তি সৃষ্টিই এর উদ্দেশ্য। চরিত্রয়ানের এই পদ্ধতিতে অভিনেতারা বুঝি দর্শকদের মধ্যে নিজের অভিনীত চরিত্রটি অনুভব করতে পারে।

ফলত, অভিনেতাদের empathy-র সৃষ্টি করতেই হয়। কিন্তু অভিনয়ের চূড়ান্ত দিনে অর্থাৎ দর্শকদের উপস্থিতি ছাড়াই empathy গড়ে উঠতে পারে না। নাটকের যে ঘটনা ও চরিত্র অভিনেতা ব্যাখ্যা করে তা দর্শকদের মনে দ্বিধাহীনভাবে অনুসঞ্চারিত করে দেবার সার্থকতার সম্মান পান তার জন্যে সাধারণের চাইতে অনেক বেশী তাঁকে অনুশীলন করতে হয়। অনুশীলনের সময়ে অভিনেতাদের কর্তব্য 'সুভস্য শীঘ্রম' এই চিন্তা ছেড়ে দিয়ে চরিত্রটির মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা এবং যতবার সম্ভব নাটকটি পড়ে ফেলা (একজন চেঁচিয়ে পড়বে এবং সবাই শুনবে সে ভাবে অবশ্যই নয়)।

সবচেয়ে মূল্যবান পন্থা হল প্রথম উপলব্ধির স্মৃতিকে মনের মধ্যে উজ্জ্বল রাখা।

অভিনয় চরিত্রটির মুখোমুখী হবার সময়ে অভিনেতার মনোভঙ্গী কৌতূহলপূর্ণ এবং প্রতিরোধমূলক হওয়া দরকার। খুব সতর্কভাবে চরিত্রটিকে বিচার করে এবং তার যাবতীয় বিশেষত্বগুলো গ্রহণ করে প্রস্তুত হওয়া উচিত। শুধু গল্পের বর্ণিত অবস্থাই নয়, যে চরিত্রটিকে তিনি রূপদান করছেন তার ভাবভঙ্গী, আচার-আচরণকেও আত্মসাৎ করতে হবে। চরিত্রটি সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব প্রাথমিক ভাবনাকে সব সময়েই স্মরণে রাখা উচিত।

কোন রকম দ্বিমত ভাবনা নয়, অভিনেতার কার্যকারণে একটিই বক্তব্য থাকবে। তাঁর অভিনয়ের সময়ে তিনি যা করতে চাইছেন তা ডিঙিয়ে তিনি যা করতে চাইছেন না, তা যেন কখনোই প্রকাশিত না হয়। ধরা যাক একটি সংলাপ আছে, 'আমি এর জন্যে তোমাকে দাম দিতে বাধ্য করবো।' এই সংলাপ বলার ধরনে কখনোই যেন আভাসিত না হয় যে 'আমি তোমাকে ক্ষমা করছি।' তিনি তাঁর সন্তানদের ঘৃণা করেন এবং নিশ্চয়ই নয় যে তিনি তাঁদের ভালবাসেন। অর্থাৎ তাঁর আচরণে তিনি যা চাইছেন না তা যেন স্পষ্ট হয়। অতএব প্রতিটি সংলাপ বলা এবং অঙ্গভঙ্গীর একটা বিশেষ বক্তব্য আছে। তাই চরিত্রটিকে অভিনেতা নিজের হাতের মুঠোয় আনবেন।

যে চরিত্রটিতে অভিনেতা রূপ দেবেন তার মধ্যে নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দিলে অভিনেতার স্বাতন্ত্র্য বলতে কিছু থাকে না। অভিনেতা নিজে লিয়ার নন, ওথেলো নন, কিংবা সৈনিক Schwik তিনি নন। তিনি দর্শকদের কাছে এদের পরিবেশন করছেন মাত্র। এদের বক্তব্যকে তিনি দর্শকদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। এদের জীবনের কথা তিনি দর্শকদের শোনাচ্ছেন। তিনি এমন ধারণা কখনোই করবেন না যে অভিনেয় চরিত্রটির সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়ে গেছেন। পরিচালক যখন কোন নির্দিষ্ট অংশ অভিনেতাকে দেখিয়ে দেন তখন স্বভাবতই তিনি নিজেকে ঐ চরিত্রটির সঙ্গে একাত্ম হন না।

অভিনেতা তাঁর অংশটিকে এলোমেলোভাবে রচনা না করে যথাযথ উদ্ধরণ করেন। এবং একথা নিশ্চিত যে সেই উদ্ধরণে তাঁকে চরিত্রটির মানসিক রূপের সমস্ত সূক্ষ্ম ভাবনায় একট কন্‌ক্রীট আদল দিতে হবে। তাঁর ভাবভঙ্গী, যদিও তা অনুকরণ মাত্র, মানবীয় হওয়া উচিত।

যে অভিনয়রীতিতে অভিনেতা চরিত্রটির সঙ্গে একাত্ম হচ্ছেন না সেখানে সংলাপ ও অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমে ভাবের প্রতিকরণ তিনটি উপায়ে হতে পারে। এক: তৃতীয় ব্যক্তির অস্তিত্ব মনে রাখা। দুই: অতীতের কথা স্মরণে রাখা। তিন: পরিচালকের নির্দেশ ও মন্তব্যগুলো অনুধাবন করা।

প্রত্যেক অভিনেতা সংলাপ বলার সময় তাঁর নিজস্ব স্টাইল অনুযায়ী সংলাপ পরিবেশন করবেন দর্শকদের মুখোমুখি হয়ে। সংলাপের গুরুত্বের হেরফেরে সেই স্টাইল পরিবর্তিত হবে। যে ভাবে কোন সাক্ষী কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কথা বলে তাকে একটা বিশেষ শিল্পসম্মত রূপ দেওয়া দরকার। যদি অভিনেতা দর্শকদের মুখোমুখি হন তাহলে তাঁকে সম্পূর্ণভাবে তা হতে হবে। তিনি নিশ্চয়ই মঞ্চের পার্শ্বমুখী হয়ে অথবা পৌরাণিক রীতিতে আত্মগত কথনে নিজেকে আবদ্ধ রাখবেন না।

অঙ্গভঙ্গীর একটি বিশিষ্ট অর্থ আছে। নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে যখন যেভাবে প্রকাশ করা প্রয়োজন বলে অনুভূত হবে ঠিক সেই ভাবেই তা পরিবেশন করা দরকার। চরিত্রটির বিশেষ আবেগের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ অভিনেতাকে সন্ধান করতে হবে। অন্তরের কথা বইয়ের সংলাপে মিলিয়ে দিতে হবে। জায়গাবিশেষের বিশেষ আবেদন এমনভাবে পরিবেশন করতে হবে যাতে তা সুষ্ঠু আদল পায়। শক্তিশালী মার্জিত এবং মনোমুগ্ধকর অঙ্গভঙ্গী প্রথম শ্রেণীর effect সৃষ্টি করতে পারে। চীনা অভিনেতা সুনিপুণ পদ্ধতিতে এই অঙ্গভঙ্গী ব্যবহার করে থাকেন। নিজের চলাফেরার ব্যাপারে সতর্ক থেকে তিনি প্রথম শ্রেণীর effect সৃষ্টি করতে পারেন।

প্রত্যেক অভিনেতার অঙ্গভঙ্গী এবং সংলাপ পরিবেশনে একটা সম্পূর্ণতার ছাপ, অনুশীলনের ছাপ থাকা দরকার। খুব সহজ ভঙ্গীতে, যার অর্থ সবরকম অসুবিধেগুলো পেরিয়ে আসা, অভিব্যক্তির প্রকাশ দরকার। অভিনেতা দর্শকদের মনে তার অভিনয়, তার সৃষ্টি, তার সুবিধে অসুবিধে সহজভাবে সঞ্চার করে দেন। কি ঘটেছিল অথবা কি ঘটতে পারে সেই সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব অভিমত নিয়ে পূর্ণ আস্থায় তিনি চরিত্রকে রূপ দেবেন। তার ভিত্তি থাকবে বাস্তবের ওপরে দাঁড়িয়ে। তাঁর অনুশীলনের রীতি তাকে এমন পথে পরিচালিত করবে না যা ঘটনাকে মূল সুর থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়।

যতক্ষণ না অভিনেতা তাঁর অভিনেয় চরিত্র থেকে নিজেকে পৃথক করতে পারছেন ততক্ষণ তিনি একটি বিশেষ স্বসৃষ্ট কোণ থেকে তাকে দেখে থাকেন,

তাঁর নিজের অভিমত চরিত্রটির ওপর আরোপ করেন এবং দর্শকরা যারা চরিত্রটি থেকে তাঁর অস্তিত্ব সনাক্ত করতে পারেন না তাঁরা তাঁর সমালোচনা করেন। দর্শকরা যখন সামাজিক চরিত্রে তাঁদের চেনা জানা চরিত্রে কোন অসম্ভাব্য ছাপ (এবং অস্বস্তিকরও) অভিনেতার অভিনয়ে দেখন তখন এই সমালোচনা তীব্র হয়ে ওঠে। সামাজিক মানুষের সহজ ভঙ্গীতে অভিনয়ের ধারা দর্শককে মুগ্ধ করে বৈকি। এবং সেখানেই প্রথম শ্রেণীর effect সৃষ্টির সার্থকতা রয়েছে।

প্রত্যেক অভিনেতার উচিত ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয়ের অভিজ্ঞতা রাখা। ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো একবারই ঘটে এবং সেখানেই তার সামাপ্তি। ঘটনাগুলো একটা বিশেষ কালের গণ্ডীতে আবদ্ধ। এই সব ঘটনায় চরিত্রগুলোর ব্যবহার সব সময়ই সাধারণ মানুষের মত এবং নির্দিষ্ট সুরে বাঁধা নয়। এর একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। ইতিহাসের ধারা অনুযায়ী যা আবার ঘটেছিল কিংবা ঘটতে পারতো এই ধরনের নাটকের বিষয়বস্তু রচিত হয়। সেই কালের দৃষ্টিকোণ থেকেই এর সমালোচনা চলে। ইতিহাসের নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগমণ সেই কালের মানুষের সঙ্গে আমাদের আচরণের ভিন্নতা সৃষ্টি করেছে। এখন অভিনেতার কর্তব্য এই দূরত্বটাকে অতিক্রম করা; ঐতিহাসিক নির্দিষ্ট সেইকালীন মানুষের ভাবভঙ্গী আচার আচরণের সঙ্গে আজকের মানুষের আত্মীয়তা সৃষ্টি করা।

সমকালীন মানুষের গল্প আমাদের কাছে বাস্তব বলে প্রতীয়মান হয় কারণ এই মানুষ আমরাই। অভিনেতা সেই সব চরিত্রের সঙ্গে দর্শকদের একাত্ম করাতে চেষ্টা করেন চরিত্রটিকে জীবন্ত করে। প্রথাসম্মত, সাধারণ, সরল ঘটনাগুলোতে তাপ সৃষ্টি করার কৌশল বিজ্ঞান সম্মত হওয়া দরকার। শিল্পের খাতিরে এই কৌশলের প্রয়োজন রয়েছে।

জর্মন থিয়েটারে প্রথম শ্রেণীর effect সৃষ্টিতে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হয়েছে তাতে এই ধরনের অভিনয়ে আবেগ সৃষ্টি হতে পারে। অবশ্য চিরপ্রচলিত থিয়েটারগুলোর আবেগ-কর্ম থেকে এ নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র। দর্শকদের মনে একটি চরম উত্তেজনা যখন বাসা বাঁধে তখন নিশ্চয়ই তাতে শৈল্পিক আকর্ষণ আছে। অতএব প্রথম শ্রেণীর effect কখনই অবাস্তবতার ওপর ভিৎ গড়তে পারে না। স্বভাবতই এই রীতির অভিনয়ে কোন রকম Stylization-এর প্রয়োজন নেই।

এপিক থিয়েটারের সঙ্গে এর পার্থক্য, এপিক থিয়েটারের লক্ষ্য মোটামুটি একটি—'পৃথিবীতে কি কি ঘটছে' এবং শেষ পর্যন্ত 'পৃথিবী পরিবর্তিত হতে পারে'। পুরোন দিনের মাটির স্পর্শ ছাড়া অবাস্তব কাহিনীতে নিগূঢ় রহস্য এবং ভাঁড়ামো মিশিয়ে লেখা নাটক চির প্রচলিত রীতির থিয়েটারগুলো অভিনয় করছে।

দিনে দিনে পথ বদলাচ্ছে মতের নির্দেশে। যে গল্প আদি মানব শুনেছিল, প্রিয়ার চোখে মুখে সে গল্প যখন ভাষায় বলা হল তখন তার রীতি বদলালো। তারপর এল সঙ্গে অনেক মানুষ যখন মঞ্চে সে গল্প দেখলো তখন তাদেরকে বলার বোঝাবার ধরনও বদল হল। এতগুলো মানুষকে অভিনেতারা মঞ্চে দাঁড়িয়ে যে গল্প বলেছেন তাকে হৃদয়গ্রাহ্য করার জন্যে উপকরণের সৃষ্টি হল দেশে দেশে। সেই আদিম মানুষের মুখের পানে যে একাগ্রতায় তাকিয়ে মানুষ গল্প শুনেছিল, অভিনেতারাও চেষ্টা করেন দর্শকরাও সেই একাত্মতার শরিক হ'ন। জর্মন থিয়েটারের স্মরণীয় নাম বার্টল্ট ব্রেখট্ বিশ্বাস করেন অভিনেতা যদি তাঁর হাঁসি কান্না ভালবাসা এবং হতাশা দর্শকের মনে পৌঁছে না দিতে পারেন তাহলে প্রথম শ্রেণীর effect সৃষ্টিতে ঘাটতি পড়েছে একথাই প্রমাণিত হয়।

রবীন্দ্রনাথে'র কাহিনী
অবলম্বনে

শাস্তি

নাট্যরূপ : বীরু মুখোপাধ্যায়

চরিত্র

বড়বৌ, চন্দরা, ছিদাম, রামলোচন,
দুখিরাম

প্রথম দৃশ্য

[দুখিরাম ও ছিদাম রুই-এর একখানি পর্ণকুটীর, মঞ্চের বাঁদিকে লম্বা একখানা দাওয়ায় পাশাপাশি দুখানা ঘরের দরজা। দাওয়ার এক প্রান্তে মঞ্চের গভীরে একটি উনুন, তার পাশে কুলো, ধামা ইত্যাদি চাষীর ঘরের টুকিটাকি। আঙিনায় একটি তুলসীমঞ্চ, তার একপাশে একটা হাল দাঁড় করানো, একটি মাছ ধরবার পোলো। আঙিনায় মঞ্চের ডানদিকে একটা আগল দেখা যায়, তার পেছনে ঘরের পাশ দিয়ে রাস্তা। দূরে দিগন্ত বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র। পর্দা উঠলে দেখা যাবে উনুনে একটা কড়া চাপিয়ে বড়বৌ ঝাঁটার কাটি দিয়ে মুড়ি ভাজছে আর বকছে]

বড়বৌ ॥ মুখে আগুন, মুখে আগুন, অমন রূপের মুখে আগুন, বড়বৌ-এর গতর দেখছে যে চোখ দিয়ে ঐ চোখে চম্মি পোকা ধরুক, এখনও চন্দর সূর্যি উঠছে। আমি যদি মায়ের গভ্যে জম্মে থাকি, তাহলে ঐ চোখ দুটো শুকনিতে ঠোকরাবে।

[ঘরের ভিতর থেকে একটি শিশুর অবিরাম কান্নার আওয়াজ ভেসে আসে। একবার কড়াটা নামিয়ে দরজার দিকে মুখ করে বলে—]

দাঁড়া দাঁড়া যম, ঘাটের মড়া, আমায় গিলতে এয়েছে। খা খা একেবারে চুষে খা, আমার হাড় কখানা জুড়ুক।

[কোমর পর্যন্ত জলে ভেজা, গায়ে একখানা ভিজে গামছা জড়ানো, হাতে গোটা কয়েক শালুক। চন্দরা প্রবেশ করে। চন্দরা ছিদামের

বৌ, চেহারা থেকে লাবণ্য ঝরে পড়ে। দরজার আগলের কাছে দাঁড়িয়েই ঘরের ভিতর কান্নার আওয়াজ শোনে, তারপর বলে—]

চন্দরা ॥ ওকি দিদি ছেলেটা যে কেঁদে কেঁদে সারা হলো গো।

[ওর কথার উত্তর না দিয়ে ভিতরের দিকে মুখ করে পূর্ববৎ বড়বৌ বলে]

বড়বৌ ॥ মর মর ঐ আছাড়ি পিছাড়ি খেয়েই মর। যেমন হাড় হাবাতে ঘরে জন্মেছিলি, মাকে পাবি কি করে? সাতগুষ্টির পিণ্ডি চটকে যদি সময় পাই, তবেতো তোকে দেখবো! মর মর ঐ চেল্লেচেল্লেই মর।

[চন্দরা ছুটে যায় উনুনের কাছে] [বাঁশী বেহালা]

চন্দরা ॥ সরো, সরো দিদি, ছেলেটারে নাওগে যাও। ভারি ত কাজ মুড়ি কটা ভাজা, তা ছেলেটারে কোলে নে একাজটুকু করা যায়নে? এমন অগোছালো মানুষ কোথাও দেখিনি বাপু। সাধে বলে অগোছালের ক্যাথায় আগুন।

[বড়বৌ উনুনের কাছ থেকে দাওয়ায় দাঁড়ায়। তার কাপড় অসম্বৃত, আঁচল মাটিতে লুটুচ্ছে]

বড়বৌ ॥ ওলো আমার সাতসোহাগের গোছলানী লো! ওলো—তেরো বছর বয়সে পা দিছি এ সংসারে; সেই এস্তোক সব ঠেলেছি একা। এই উঠোন নিকানো থেকে চাষের ক্ষেতে মাথায় করে ভাত জল বয়ে দে আসা পর্যন্ত সব্ হ'য়েছে একলা এই বড়বৌ-এর হাড়ে, বুঝলি, তুইতো কাল এয়েছিস্ লো, রূপ দেখে নেয়েছে তোর মরদ, পুজো করবে বলে।

চন্দরা ॥ হাঃ হাঃ হাঃ কই আর পুজো করলে—তা এতক্ষণ না চেল্লে ছেলেটারে ঘুম পাড়ালে হতোনি!

বড়বৌ ॥ ঘুম পাড়াবো, ওকে জন্মের শোধ ঘুম পাড়াবো।

[ভেতরে ঢুকে যায়, কান্নার আওয়াজ থামে]

চন্দরা ॥ মেজাজ বটে একখানি!

বড়বৌ ॥ (ঘরের ভিতর থেকে) আজ ঘরে এসুক, একটা হেস্তনেস্ত আমি করবুই। হয় দু'হাঁড়ি আলাদা করুক না হয় বলে দিক্ যে যার সংসার বুঝে নে যেন চলে যায় এ বাড়ী থেকে। মিনষে ত' মানুষ নয়, কানা উজবুক, নইলে অমন জোয়ান ভাইটাকে এমন বাপের মেয়ের সাথে বে দিলে যে ভিটেতে তার একেবারে মন বসলুনি!

চন্দরা ॥ (জোরে) থামোকা বাপ তুলোনি বলছি—সক্কাল বেলা—হ্যাঁ—

বড়বৌ ॥ (বেরিয়ে আসে) তুলবোনি ? একশোবার তুলবো। বলি রূপের দেমাকে ত' মাটিতে পা পড়েনে। সোয়ামীকে ঘরে আগলে রাখ্‌তে পারিস নি ? সে থাকলে তবু সংসারটার ছিরি ছাঁদ হয়। বলি দাদা কি চেরকাল ঐ জোয়ান ভাই আর ভাজকে বস্যে বস্যে খাওয়াবে ?

চন্দরা ॥ শুধুমুধু মিছে কথা বলুনি দিদি, হ্যাঁ—চেরকাল কি সে বসে বসে খায়। চাষের সময়ে লাঙলও ঠেলে আবার বাবুদের জন মজুরও খাটে সময় অসময়। জোয়ান পুরুষমানুষ একটু আধটু বাইরে যাবেনে ?

বড়বৌ ॥ আহা মরে যাইরে, সোয়ামী সোহাগ উথলে উঠলো একেবারে। তবু যদি বিষ্টুপুরের মেলায় সেই ঢপউলির কাছে পড়ে না থাকতো।

[চন্দরার কাজ প্রায় শেষ হয়েছিল, কড়াটা নামিয়ে রাখতে গিয়ে পড়ে যায়, এমন সময় বাইরে ছিদামের গলা শোনা যায়। ছিদামের বয়স ২৭/২৮. সুঠাম গড়ন সদা হাস্যময়। বাইরে থেকেই ডাকতে ডাকতে আসে]

ছিদাম ॥ নন্টু, নন্টরে, এইযে বৌঠান নন্টু কোথায় ?

বড়বৌ ॥ ঘুমুচ্ছে।

ছিদাম ॥ (গামছা বাঁধা পুঁটলি কাঁধ থেকে নামায়) তার তরে যা খেলনা নেইচি না—এ্যায় দেখ, ধরো ধরো, এবার টানো টানো (বড়বৌ খেলনার দড়ি ধরে টানতেই ছোট খেলনা ড্রামটি বেজে ওঠে) হাঃ হাঃ কেমন, আর এই দেখো তোমার তরে নেইচি কানপাশা, আর বৌ হেথা আয়, শোন, কি নেইচি দেখ (চন্দরা একবার তীব্র দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চায়, তারপর ভেতরে ঢুকে যায়) হাঃ হাঃ হাঃ, খুব রেগে আছে না বৌঠান !

বড়বৌ ॥ (বড়বৌ কানপাশা পেয়ে খুশী হয়, ওর কথার উত্তর না দিয়ে) এর দাম কত ঠাউরপো ?

ছিদাম ॥ হেঁ হেঁ বলবো কেনে ? ঠাওর কর, ঠাওর কর কত এস্তোক হতি পারে। ট্যাকার তোয়াক্কা, বুঝলে এই ছিদাম রুই ট্যাকার তোয়াক্কা কোনদিন করেনে। বিষ্টুপুরের মেজবাবু, বুঝলে, জমিদারবাবুগো, একখানা পাশা কিনলে ঠিক এই প্যাটেনের। সেই দেখেই আমি

বলনু—"দেখি আমার বৌঠানের জন্যে একজোড়া"—হে হেঁ বল একবার পছন্দটা কি রকম বল—

বড়বৌ ॥ এত দামী !

ছিদাম ॥ দামের কথা বলুনি। এই কদিন বুঝলে দুমুটোয় ট্যাকা উপায় করিচি আর দুহাতে খরচা করিচি।

বড়বৌ ॥ মেলায় কি জন খাট্তে নাকি ঠাউরপো ?

ছিদাম ॥ হাঃ হাঃ তুমি কিছু জাননি বৌঠান। কিছু জাননি। কুপোন, কুপোন জান ? (বড়বৌ না সূচক ঘাড় নাড়ে) এই এতবড় একখানা সতরঞ্চি পাতা বুঝলে; তুমি তাতে মনে কর দুটো ট্যাকা ধরলে। ধরে একখান ছক্কা আছে, এই রকম ছুঁচলো মুখ, যেই ছক্কা এইভাবে ঘুইরে দিলে, ব্যস, যদি দানে দানে মিলে গ্যালো তুমি অমনি পেয়ে গেলে চারগুনো ট্যাকা।

বড়বৌ ॥ হ্যাঁ ঠাউরপো, এমন ?

ছিদাম ॥ হেঁ—হেঁ—হেঁ—

বড়বৌ ॥ আমি তো ভেবে মরি, ঐ গয়লাদের রতন বলে গেল, ছিদেম পড়ে আছে ঢপকীর্ত্তনের তলায়।

ছিদেম ॥ কে বললে ? ও শালা দেখেছে আমায়। সব মিছে কথা, হিড়িক বুঝেছ। একরাত খালি শুনেছিনু, হ্যাঁ তা শোনবার মতন জিনিস বটে বৌঠান। সেই যেখানটায় রাধিকার মান হয়েচে, সে কুঞ্জবন থেঙে একদম বেরুবেনে; তেখুনি কেষ্ট কুঞ্জবনের ধারে গে হাতজোড় করে বলছে (চন্দরার ঘরের দরজার দিকে উদেশ্য করে সুরে গান ধবে)

ফিরে আয় ফিরে আয়
অভিমানী রাই আমার ফিরে আয় ফিরে আয়
তোর মনের গোড়ায় আমানি দে'
ফিরে আয় ফিরে আয়—
তোর মানে মানে মান বাড়ায়ে
ফিরে আয় ফিরে আয়, ও রাধে ফিরে...

[ঘরের ভেতর থেকে চন্দরা ক্রুদ্ধ পদে বেরিয়ে আসে, কাপড় বদলে। কারোদিকে লক্ষ্য না করে উঠানে রাখা পোলোটি নেয় তারপর দ্রুতপদে বেরিয়ে যায় আগল পেরিয়ে।]

বড়বৌ ॥ আবার কোথায় চল্লি ছোটবৌ। সারাদিন বাইরে আছে, তোমারে কি বলবো ঠাউরপো পুকুর, বাগান, মাঠ যেন চষ্যে বেড়াচ্ছে, আর পাড়ায় তো কান পাতা যায় না। এত রাত্তিরে জলের ঘাটে এমন হাসি কার গো? না ঐ ছিদেমের বৌয়ের আর কার হবে? বাবা, খুরে খুরে দণ্ডবৎ। গরম মুড়ি ভাজনু দুটি দোবো? খাবে ঠাউরপো?

ছিদাম ॥ না।

[ছিদাম হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে ঘরের ভেতর চলে যায়। বাইরে আগলের কাছে রামলোচন চক্রবর্তীর গলা শোনা যায়। প্রৌঢ় রামলোচন বয়স ৫০/৫৫, গ্রামের গেজেট, জমিদারের গোমস্তা এবং ব্যক্তিগত মহাজন। তাকে গ্রামের সবাই শ্রদ্ধা করে, ভয় করে ততোধিক।]

রামলোচন ॥ দুখিরাম বাড়ী আছিস্ নাকিরে? দুখিরাম—

[বড়বৌ ঘোমটা টেনে দরজার আড়ালে যায়, ছিদাম বেরিয়ে আসে]

ছিদাম ॥ দাদা তো ঘরে নেই চক্কোত্তি মশাই, (তারপর দরজার দিকে চেয়ে বড়বৌ-এর নিষেধ লক্ষ্য ক'রে) না—মানে পাটের দানা কিনতে বেইরেচে।

রামলোচন ॥ ও পাটের দানা কিনতে বেইরেচে? ভেতর থেকে আর একবার ইশারা করলে ত বলবি বিষ্টপুরের মেলা দেখতে গেছে।

ছিদাম ॥ (হেসে) এঁজ্ঞে না। মেলা দেখতে গেছনু আমি। ওঃ এবার বড় জোর মেলা চক্কোত্তি মশাই। মনে কর ম্যাজিক এয়েচে কলকাতা থেঙে তিনদল, তারপর আপনার গিয়ে কুপোন, কুপোনের দলই আপনার মনে কর—

রাম ॥ তাছাড়া কীর্তনটা আস্টা তো আছেই, কি বলিস্?

ছিদাম ॥ এঁজ্ঞে হ্যাঁ সে তো রয়েইচে, ঐ ক্ষ্যান্তমণির ঢপকীর্তন। বয়স হয়ে গেছে চক্কোত্তি মশাই, এখনও গলা কি! সেই মনে করুন ধরতাই নিচ্ছে আসরের গোড়া থেঙে—

রাম ॥ অ-তা ওধারের ধরতাই ধরতে গিয়ে এধারে খোলতাই খুলচে যে রে—

ছিদাম ॥ কেনে চক্কোত্তি মশাই?

রাম ॥ গেরামে সমাজ বলে একটা বস্তু ত আছে নাকি? তোর না হয় চোখকান বাঁধা পড়েছে অন্য দিকে, আমরা জমিদারের গোমস্তাগিরি

করে খাই, প্রজার দোরে দোরে ঘুরে বেড়াতে হয় তাই চোখটা কানটা খোলা না রাখলে তো আমাদের চলে না, বুঝলি—

ছিদাম ॥ এঁজ্ঞে কি হয়েছে না জান্‌লে—

রাম ॥ জানার ইচ্ছে থাকলে তবে ত' জানবিরে বেটা। যে করে এনেছিস্ রূপসী বৌ, অথচ কেমন করে আগলে রাখতে হয় সেটা শিখিস নি। সেই অভিমন্যুর মতন আর কি, বলে ব্যূহের মধ্যে ঢুকতেই শিখেছিলুম বেরোতে শিখিনি। (ছিদামের মুখটা কালো হয়ে যায়) হ্যাঁ যাকগে··· পরের কুচ্ছো সকালবেলা···দুখে ফিরবে কখন ?

ছিদাম ॥ (বড়বৌ-এর দিকে চায় তারপর বলে) ঠিক ত নেই।

রাম ॥ তা ঠিক না থাকলে আমার চলে কেমন করে। চোতকিস্তি শেষ হতে চললো, খাজনার টাকাটা কি এবারেও বাকী রাখবি নাকি গেল বছরের মতন ?

ছিদাম ॥ দাদা এসুক।

রাম ॥ হুঁ সে জানি, দাদা ছাড়া যে তোমার কোনো মুরোদ নেই, সে জানতে বাকী নেই। হ্যাঁ শোন, জলখাবারের বেলা ত' আসবে ঘরে, নাকি সেই সময় একবার আসবো! ফিরে এলে বলবি আমি এসেছিলুম। আজ যে বড় চুপচাপ, কি ব্যাপার রে—

ছিদাম ॥ এঁজ্ঞে—

রাম ॥ না, ক্রোশখানেক দূব থেকে ত আওয়াজ শুনে বোঝা যাবে কুরাদের বাড়ীর কাছাকাছি এসে গেছি। তোদের দুটো বৌয়ের চুলোচুলি আর চেল্লাচেল্লির জ্বালায় পাড়ার একটা গাছেও তো কাকচিল বসতে পায় না সুস্থির হয়ে। তাই ভাবছি আজ যে বড় চুপচাপ! ঐ চুপচাপ দেখলেই ভয় হয়, মনে হয় একটা বুঝি খসলো—হা—হা—হা চলি বুঝলি, বলিস দাদাকে আবার আসবো আমি ঘণ্টাখানেক পরে—।

[ছিদাম গুম হয়ে দাওয়ায় বসে থাকে। কিছুক্ষণ পরে চন্দরা কোঁচরে পেয়ারা নিয়ে প্রবেশ করে। তার গলায় কল্কে ফুলের মালা, হাতে করে একটা পেয়ারা চিবুচ্ছে, কাঁধে সেই পোলোটা, সেইটা উঠানে ছুঁড়ে দিয়ে বলে]

চন্দরা ॥ নাঃ পেমুনি, একটা মাছও পেমুনি। কাদা ঘাঁটাই সার।

ছিদাম ॥ (উঠে দাঁড়ায়) এ্যায় শোন্ ইদিকে।

চন্দরা ॥ (ওর কথায় কাণ না দিয়ে) মাছ না পেয়ে ফিরে আসছিনু বুঝলে দিদি, রাস্তার ধারে দেখি ঐ পেয়ারা গাছটার উঠে পেয়ারা পাড়ছে ঐ কাশী মজুমদারের মেজ ছেলেটা—সেই সোন্দর মতন ছেলেটা গো, আমাকে ঈশারা দিয়ে ডাকলে, বললে 'পেয়ারা নিবি?' আমি বলনু, "আচ্ছা দে হুটো।" তা এতগুলো দিলে। এমন বদমায়েশ ছোঁড়া বুঝলে হা—হা—হা যতবার হাতে করে লুফতে যাই, আর অমনি আমায় ছুঁড়ে মারে। গা, হাত পা ফুইলে দেছে বাবা!

[ছিদাম ছুটে এসে ওর চুলের মুঠি ধরে]

ছিদাম ॥ কেন গিয়েছিলি? কেন বাইরে গিয়েছিলি আমাকে না বলে?

চন্দরা ॥ (চুলটা ছাড়িয়ে) আঃ নাগে ছাড়। বিষ্টুপুরের মেলা দেখতে যারা যায় তারা কি আমায় বলে যায়?

[বড়বৌ দাওয়া থেকে একটা মাটির কলসি নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে ঘাটে যাবার উদ্যোগ করে—যাবার সময় এই কথাটি শুনে—]

বড়বৌ ॥ আহা—হা, ঢলানি! (পেছন দিকে বেরিয়ে যায়)

ছিদাম ॥ মেলা দেখতে যে যাবার সে যাবে, তাতে তোর বাপের কি?

চন্দরা ॥ আমার বাপের জামাই যদি যায়, আমি বলবুনি?

ছিদাম ॥ ফের কথা মুখের উপর! শোন, শোন এদিকে (কন্ঠের মালা দেখিয়ে) এটা পরেছিস কেন? সঙ সাজা হয়েছে, এ্যাঁ? চত্তির সংক্রান্তির সঙ!

চন্দরা ॥ হা, হা, হা, ঢপকীর্তনের দল খুলবো গো—

(সুরে) ফিরে আয় ফিরে আয়—
ব্রজের নিঠুর কানাই আমার
ফিরে আয় ফিরে আয়—

[ছিদাম একটি সজোরে চড় মারে ওর গালে, মার খেয়ে কয়েক মুহূর্ত চন্দরা অভিমানে ভেঙে পড়ে, তারপর দাওয়ায় ঝোলানো কয়েকটি কাপড় গামছা পুঁটুলির মতো জড়িয়ে দ্রুতপদে দরজার দিকে এগোয়]

ছিদাম ॥ (পথ আটকিয়ে গম্ভীর গলায়) বলি চলেছ কোথায়?

চন্দরা ॥ (ভেজা গলায়) যে দিকে দুচক্ষু যায় আমি চলে যাবো। কেনে পড়ে থাকবো তোমাদের সংসারে? দিন রাত্তির গঞ্জনা শোনবার জন্যি? কেউ চায় আমি এ বাড়ীতে থাকি? কেউ ভালোবাসে আমারে?

ছিদাম॥ হ্যাঁ, ঘরের বৌ হয়ে পাড়াময় ঢলিয়ে বেড়াবি! দেশশুদ্ধ লোক কুচ্ছো গাইবে তোর, আর সবাই তোর গায়ে গুড় দিয়ে চাটবে না?

চন্দরা॥ হ্যাঁ, নিজের কথাটা খুঁটিয়ে ত কেউ দেখবে নে! যখন পাড়ার লোক এসে বাড়ী বয়ে বলে যায় তোমাদের অমুক ঢপউলির আসরে পড়ে রয়েছে তখন ঘরের বৌ-এর মনটা কেমন হয় সে খোঁজ কেউ রাখে?

ছিদাম॥ খালি খালি এককথা। বলছি ঢপউলির আসরে তো একটি রাত মাত্তর গিয়েছিনু। দুরাত্তির তো কুপন খেলেছি, আর কাল সারাদিন মাদুলির তরে ধর্ণা দিয়েছি বুড়ো শিবতলায়।

চন্দরা॥ (চমকে উঠে) কিসের তরে?

ছিদাম॥ মাদুলি। এই দেখনা, দেখ—(ছুটে গিয়ে দাওয়ায় রাখা পুঁটলি খুলে) একেবারে স্যাক্‌রার কাছে সোনা দে গইড়ে নেইনু। সাক্ষাৎ শিবের মাদুলী বাবা, এই বছরই বুঝলি—(চন্দরার কানের কাছে মুখ নিয়ে) ছেলের নাম রাখ শিবনাথ, বুঝলি—

চন্দরা॥ (সলজ্জ হেসে) একেবারে সোনার গইড়ে আনলে! অত টাকা পেলে কোথায় গো?

ছিদাম॥ সে ছেল, আমার কাছে ছেল।

চন্দরা॥ তোমার কাছে ট্যাকা ছেল? জন্মে একটা পয়সা রাখতে পারোনি।

ছিদাম॥ না, আমার না মানে তোর বাক্সেই ছেল।

চন্দরা॥ আমার বাক্সে? ওমা সে ত খাজনাব ট্যাকা গো, বড়ঠাকুর তুলে রাখতে দেছল। সেই ট্যাকা নে গেছ, সব্বনাশ করেছ!

ছিদাম॥ খামোকা চেল্লাসনি বাপু, ভাল লাগেনে। সে দাদাকে আমি বুঝ্যে বলব'খন। দাদা যদি শোনে তোর ছেলের তরে মাদুলী গড়াতে ট্যাকা খরচা হয়েছে, কিচ্ছু বলবেনে। নে রাখ (পুঁটলিটা কেড়ে নেয়) পরদিনি, কেমন মানায় দেখি, পর (গলায় মাদুলীটা পরিয়ে দেয়)।

চন্দরা॥ (হেসে) দাঁড়াও, তোমারে একটা পেন্নাম করি···

[হেঁট হয়ে প্রণাম করে, ওকে দু হাতে তুলে ধরে ছিদাম বলে]

ছিদাম॥ আর তুই কোনদিন আমায় না বলে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরবিনি।

চন্দরা॥ তুমিও মেলায় যাবেনে আমায় না বলে—

ছিদাম॥ আচ্ছা যাবোনি। এই দিব্যি করলুম। কিন্তুন কোনদিন যদি

শুনতে পাই ঐ কাশী মজুমদারের মেজ ছেলে তোকে ইসারা দে ডাকছে—এমন শাস্তি দেব—।

চন্দরা ॥ হা—হা—হা, কি শাস্তি দেবে গা ? হ্যাগা বল'না কি শাস্তি দেবে ? বলো বলোনা—হা—হা—হা—

[পিছনের দরজার মুখে একটা শব্দ হয়, পা পিছলে পড়ে বড়বৌ মাটির কলসীশুদ্ধ। দুইজনেই ছুটে যায়]

চন্দরা ॥ আহাহা লাগলো দিদি ?

[বড় বৌ ওর কথার উত্তর না দিয়ে দ্রুত দাওয়ায় উঠে যায়, একটা খালি ঘড়া নিয়ে চিৎকার করে]

বড়বৌ ॥ সারাদিনমান খালি খেটে মর। শতেক খোয়ারীদের সংসারে—খালি সাতগুষ্টির পিণ্ডি যুগিয়ে হাড় হিম করো। আমার ত সাধ আহ্লাদ থাকতে নেই ! আমার তো আর ইচ্ছে করেনে সোয়ামীর সাথে দুটো হেসে গল্প করি।

চন্দরা ॥ (হেসে) করলেই পারো। মানা তো কেউ করেনে।

বড়বৌ ॥ চুপ করে থাকবি কালামুখী, গতরে ফুরফুরে হাওয়া নাইগে অমন সোয়ামী সোহাগে উথলে উঠতে সবাই পারে।

ছিদাম ॥ তা খামাখা ওর ওপর ঝাল ঝাড়ছো কেনে ? ও খারাপ কথাটি কি করেছে ?

বড়বৌ ॥ আ মরি মরি মরিরে, কালে কালে দেখব কি, পাখী হলো টিকটিকি, বৌয়ের হয়ে ঝগড়া করতে এয়েছেন ! যার মুরোদ থাকবে সে ঐ ঢলানি বৌ নিয়ে ঢলাঢলি করবে নিজের পয়সা উপায় করে। সোমত্ত বয়সে দাদার গতরে যে বসে খায় তার গতরে পক্ষেঘাত নাগুক।

চন্দরা ॥ খবরদার বলছি দিদি, অমন অলুক্ষণে কথা তুমি মুখে আনবে নে।

বড়বৌ ॥ (ফেটে পড়ে) কেন আনবুনি ? তোকে কি আমি ভয় করিনা ? ওলো ও আটকুড়ি, ছেলের মানতে সোনার মাদুলী কার ট্যাকায় এলো না ?

[বড় ভাই দুখিরাম আসে আগল পেরিয়ে, বয়স ৩৪।৩৫, চেহারায় সারল্য আর কাঠিন্যের অদ্ভুত সংমিশ্রণ]

দুখীরাম ॥ (হালখানা দাঁড় করিয়ে রেখে দেয় দেওয়ালে) সকাল থেকেই নেগেছে ত শাপে নেউলে। (দুখীরামকে দেখে চন্দরা ঘোমটা টেনে

ঘরে ঢুকে যায়। বড়বৌ ঘড়া নিয়ে আবার চলে যায় পুকুরের দিকে)
এই যে নবাবের জামাই এয়েচ, তা হাঁরে হতভাগা, বাড়ীতে কাকচিল বসতে পারেনে, পুরুষ মানুষ একটা ঘরে রয়েছিস, বৌড়ুটোকে সামলাতে পারিসনি—

[দাদাকে অত্যধিক ভয় করে, সে সরে পড়বার চেষ্টা করছিল। কিন্তু এই অবস্থায় উপায় না থাকায় বলে ফেলে]

ছিদাম॥ আমি তো এই মাত্তর এনু।

দুখী॥ (ভেঙিয়ে) এই মাত্তর এনু! বলতে মুখে বাধলোনি? বলি কোন শ্বশুরের বাড়ী ছেলে এই প্যাঁচরাত?

ছিদাম॥ বিষ্টুপুরে মেলা দেখনু একদিন। তারপর তোমার ঐ ছোটবৌ ছেলেপিলের তরে বড়ো কান্নাকাটি করে তাই বুড়ো শিবের দোরে একবার ধর্ণা দিয়ে একটা মাদুলী নেইনু। তারপর ভাবনু স্যাকরা যখন হাতের কাছে রয়েইছে, তখন আনা চারেক সোনা দে একেবারেই গইড়েই নে যাই।

[দুখিরাম এতক্ষণ হুঁকো নিয়ে তামাক সাজতে শুরু করেছে]

দুখী॥ আনাচারেক সোনা! তার তো অনেক দামরে। ট্যাকা পেলি কোথায়?

ছিদাম॥ (হেসে) ট্যাকা ছেল। হ্যাঁ দাদা, চক্কোত্তিমশাই এয়েছেলো এই মাত্তর। বলে গেছে আবার আসবে।

দুখী॥ হুঁ, কি বলে—

ছিদাম॥ বলছেল, চোতকিস্তির খাজনা গেল সনে ত বাকী ছেল, এসনেও যদি বাকী থাকে—

দুখী॥ বাকী থাকবে মানে? বাকী থাকবে এ কথা তাকে কে বলেছে? পাছে খরচা হয়ে যায় এইজন্যে গেল সনের বারো ট্যাকা আর এ সনের বার ট্যাকা এই চব্বিশ ট্যাকা আমি ছোটবৌয়ের বাক্সে রেখে দিইছি। রসিদ লিখে দিক্, এক্ষুণি ট্যাকা দিয়ে দিচ্ছি আমি।

ছিদাম॥ আমি বলছিনু কি দাদা, নগদ ট্যাকাটা জমানো আছে থাক না। সময় অসময় দরকার হতি পারে। এই বর্ষেকাল আসছে, ঘরামীর খরচা আছে, বাঁশ কেনার ট্যাকা দরকার, তার থেকে বরং মন দুয়েক ধান দে খাজনাটা শোধ করে দাও।

দুখী ॥ (একবার ওর মুখের দিকে চেয়ে) ধান দে শোধ করে দেব? ক'শো মন ধান আছে তোর মরাই ভর্তি? আজ দু'মোন বার করে দিলে সোমবচ্ছর গিলবি কি?

ছিদাম ॥ হাঃ হাঃ হাঃ, সোমবচ্ছর আর কবে গিলি দাদা, বলে সে ধান হলেও যা আর না হ'লে ত কথাই নেই—

দুখী ॥ ধানটান বার কর্‌রা হবেনে এখন। তুই ছোটবৌয়ের বাক্সে ট্যাকাগুনো আছে গুনে নে আয় দেখি—

[বড়বৌ চান সেরে ঘরে ঢোকে, দাওয়ায় জলের ঘড়া রাখে]

ছিদাম ॥ গাইদুটোর জাব বোধ করি সকাল থেঙে পড়েনে, দেখি পোনটাক খড় কেটে দিই (সরে পড়ার চেষ্টা করে)।

দুখী ॥ (ধমকে) তোকে যা বলা হচ্ছে তাই কর। জাব আমি সকালে দে তবে বেইরিছি।

ছিদাম ॥ (পাশে রাখা পোলোটা তুলে নেয়) এ্যাই দেখোদিনি সক্কালবেলায় নেগে পোলোটাকে ভেঙে নেইলে। সময় অসময় মাছটা আসটা ধরতে হয়। যাই দেখি দুগাছা কঞ্চি আবার কোথায় পাই এখন। (এগোয়)

দুখী ॥ এই হারামজাদা, কথা কানে যাচ্ছেনে, না! বলা হচ্ছে পঞ্চাশবার, ছোটবৌয়ের বাক্স থেঙে ট্যাকা কটা বার করে আন। আগে নে আয় ট্যাকা। [ছিদাম পোলো রেখে ভয়ে ভয়ে ঘরে চলে যায়, বড়বৌ কাপড় বদলে একখানা আয়না দাওয়ায় রেখে চুল আঁচড়াতে বসে] কি ব্যাপার, এত সাজগোজ কেনে দুপুর বেলা?

বড়বৌ ॥ তেবু ভাল, চোখে পড়লো। বৌ বলে একটা মনিষ্যি ঘরে আছে ঐ খাবারের সময়টুকুন ছাড়া সেটা তো আর মনে থাকেনে!

দুখী ॥ বাবা, সেটা মনে না রেখে উপায় আছে। তোর চেল্লানির জ্বালায় ঘরের কুকুর রাস্তায় পাইলে যায় আর আমি তো কোন ছার।

বড়বৌ ॥ হ্যাঁ আমার তো সবেতেই দোষ। কথা কইলেই হয় চেল্লানি, কি সুখে রেখেছো যে জিভ দে মধু ঝরে পড়বে? (কানপাশা দুটো পরে)

দুখী ॥ (একবার দেখে) আ মরি মরি কি রূপই খুলেছে, খোল খোল ও দুটো। বুড়ো বয়সে ভাবন দেখ না! [একবার স্বামীর দিকে তীব্র দৃষ্টি হেনে বড়বৌ দাঁড়িয়ে ওঠে, তারপর কানপাশা দুটো খুলে

আর্শির পরে আছড়ে মারে] এ্যায় এ্যায় কি হচ্ছে কি? ভেঙে যাবে যে।

বড়বৌ ॥ ভাঙব, ভেঙে গুঁরো করবো, এ ছাই পাঁশের সংসারে আগুন জ্বাইলে দেব। হাড়মাস কালি করে খেটে মরি কার জন্যে? কোন শতেক খোয়ারীদের খাওয়াবার জন্যে উনুনে নুড়ো জ্বেলে পিণ্ডি সেদ্ধ করি?

[ওর চিৎকারে ছিদাম ও চন্দরা বেরিয়ে আসে, সামনের দরজায় রামলোচন চক্কোত্তি আসে আবার]

রাম ॥ দুখে এয়েছিস্ না কিরে? দুখীরাম! হেঁ হে হেঁ, বাড়ী ভুল হবার জোটি নেই। দেড় ক্রোশ দূর থেকে চিৎকার শুনতে পাচ্ছি, আর ভাবছি কুরীদের বাড়ীর কাছাকাছি এসে গেছি।

[রামলোচনকে দেখে অসম্বৃত বড়বৌ আঁচল মাথায় দিয়ে ঘরে ঢুকে যায়। ছিদাম আবার একবার সরবার উদ্যোগ ক'রে]

দুখী ॥ আসুন গো চক্কোত্তি মশাই। ছিদাম একটা পিঁড়ে দে এখানে। (ছিদাম পিঁড়ে এনে দেয়, রামলোচন বসে) তা হলে আপনার দু'সনের খাজনা হলো গে চ'ব্বিশ ট্যাকা।

রাম ॥ (রসিদ বই উল্টোয়) চব্বিশ টাকা বার আনা তিন পাই, আর গুলোর জমির দরুণ ধান দেড়মনের হিসেবে দু'সনের তিনমন।

দুখী ॥ গুলোর জমি! সেকি আছে নাকি গো? সে ত গাঙে খেয়ে নেছে আজ দু'সন হলো।

রাম ॥ আজ খেয়েছে কাল আবার উগরে দেবে। তাবলে জমিদার ছাড়বে কেন বল?

দুখী ॥ এ্যায় দেখ, যে জমির চিহ্ন মাত্তর নেই, সব নদীর গব্ভো, সে জমির ধান আমি দেব কোত্থেকে?

রাম ॥ এখন নিজের থেকেই দিবি। জমিদার তো আর সে হিসেব রাখবে নে, কতটা নদীর গব্ভো গেল, কি কোন সনে অজন্মা হল! খাজনাটুকুন না পেলে তারই বা চলে কেমন করে বল? আজ নদীর গব্ভো গেছে কাল যখন চর উঠবে ঐ নদীর বুকে, যদি দুকাঠা জমি বেশীই ওঠে, জমিদার কি বলবে ওর দরুণ খাজনা বড়িয়ে দে দুখীরাম।

দুখী ॥ (কয়েক মুহূর্ত গুম হয়ে থাকে, তারপর বলে) হুঁ, দেখুন চক্কোত্তি

মশায়, খাজনা ছ'সনের চব্বিশ ট্যাকা নিয়ে যান, ধান দিতে আদ্দি পারবুনি।

রাম ॥ পারবিনি মানে?

দুখী ॥ (উঠে দাঁড়ায়) পারবুনি মানে পারবুনি, সামথ্যে না কুলোলে কোথা থেকে দোব। ধান নেই আমার।

রাম ॥ হেঁ হেঁ হেঁ, একি একটা কথা হলো দুখীরাম! জমিদার তার হক পাওনা ছাড়বে কেন বল? নালিস করে সে তার পাওনা ধান ক্রোক করে নেবে।

দুখী ॥ তাই নিক। ক্রোক করেই নিক। (উত্তেজিত)

রাম ॥ শোন শোন, খামোকা মাথা গরম করে কি হবে?

দুখী ॥ কি বলছেন চকোত্তি মশায়, মাথা গরম করবুনি? এখনও চোত্তির মাস শেষ হয়নে এর মধ্যে মরাই পেরায় খালি হয়ে এয়েচে। এর ওপব তিনমন ধান বের করে দে' সারা বছর কি গুষ্টিশুদ্ধ মিলে আমড়া চুষবো?

রাম ॥ আঃ শোন না, বোস বোস দেখি এখানে। আমি ত তোদেরই লোকরে বাপু। তোদের সুখ অসুখের কথা কি বুঝিনি? পেটের দায়ে গোমস্তাগিরি করি। তাবলে এই পাঁচখানা গেরামের প্রজাদের মামলা মোকদ্দমা সাক্ষী সাবুদ সব ত আমাকেই করতে হয়, নাকি? এ মাথা অনেক জল ঝড়ে পাকা মাথা। যা বলি শোন, চোত কিস্তি শেষ হল, এবার তো জমিদারবাবু আসবে মহলে, হাত জোড় করে গিয়ে দুভাই বলবি যে জমিটুকু নদীর গভ্যে গেছে, তা আপনার ধানের দরুণ সোম বছর যখনই হুজুরের দরকার হবে গায়ে গতরে দুভাই মিলে খেটে দোব।

দুখী ॥ হুঁ, বলে নিজের জমিতে খেটে কুলিয়ে উঠতে পারি নি—আমরা যাব জমিদারের বেগার খাটতে!

রাম ॥ হাঃ হাঃ হাঃ, এইবার হাসালি দুখীরাম। জমি আবার চাষীর নিজের কবে হ'লরে? সব জমিই ত জমিদারের। তোরা হলি গিয়ে রায়ত—স্থিতিবান্।

সুখ ॥ হ্যাঁ, যে রকম পেছনে নেগেছ, ঐ থিতিবান আর বেশীদিন থাকতে হবে নে। যাকগে ও নেবু কচলালেই তেঁতো হয়ে যাবে চকোত্তি মশায়! শোন—ধানের দরুণ তোমরা যা পার করগে। খাজনা ছ'সনের বুকে নে রসিদ দে যাও। ছিদেম, এ্যায় ছিদেম—

ছিদাম ॥ (ভয়ে ভয়ে বেরোয়) এ্যাঁ—

দুখী ॥ টাকাটা বের করে নে আয়।

ছিদাম ॥ ট্যাকা, মানে ট্যাকাটা—

দুখী ॥ কি হয়েছে কি ? ট্যাকাটা বের করে নে আয় ছোট বৌয়ের বাক্স পেড়ে।

ছিদাম ॥ ট্যাকাটা মানে পাচ্ছিনি, মানে খরচা হয়ে গেছে !

দুখী ॥ কি বললি, কি বললি হারামজাদা, খরচা হয়ে গেছে। খাজনার ট্যাকা, আমি গুনে গুনে চব্বিশ ট্যাকা ছোট বৌএর বাক্সে রাখতে দিয়েছিনু সে ট্যাকা খরচা করলে কোন শালা ?

[চিৎকার করে বড়বৌ বেরিয়ে আসে, ঘোমটা টেনে চেঁচিয়ে]

বড়বৌ ॥ খরচা হবেনে ! সোহাগী ভাদ্দর বৌয়ের মাদুলী গইড়ে এলো কার ট্যাকার ! আমি জানিনি ? সব যাবে, সব উচ্ছন্নয় যাবে। এই ভিটেয় ঘুঘু চরবে। ছোটনোকের মেয়ে ঘরে নেইলে তার অনেক দুগ্‌গতি।

ছোটবৌ ॥ (ঘর থেকে বেরিয়ে আসে) মুখ সামলে কথা কইবে। ছোট-লোকের মেয়ে ত বলেনে তার মাদুলীর দরকার !

বড়বৌ ॥ (ফেটে পড়ে) ওলো ও সরমখাকী, নাজনজ্জার মাথা পুইড়ে খেয়েছিস্? সোহাগের গোছলানীকে গুছিয়ে রাখতে দেছল ট্যাকা। মুখে আগুন, মুখে আগুন। যে খাজনার ট্যাকা চুরি করে গয়না গড়ায় তার মুখে আগুন। আর যে ভাসুর অমন ভাদ্দর বৌয়ের সোহাগ করে তারও মুখে আগুন।

দুখী ॥ (পাশে রাখা বঁটিটা তুলে নেয়) এদিকে আয় শালা, এদিকে নেবে আয়, আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন।

[রামলোচন এই অবস্থা দেখে কাগজপত্তর গুটিয়ে নিয়ে]

রাম ॥ আমি প'রে আসবোখ'ন। এখন যাই, এ্যাঁ !

[কেউ ওর দিকে দৃষ্টি দেয় না। রামলোচন বেরিয়ে যায়]

দুখী ॥ নেমে আয় শালা ! তোর কোন বাবার ট্যাকায় মাদুলি গইড়েছিস্— সেই বাবাকে ডেকে নে আয়। আজ আমি কুরুক্ষেত্তর বাধাবো, সব কটাকে খুন করবো। তবে আমার নাম—

[বঁটি তুলে চিৎকার করে। চন্দরা দ্রুতপদে এগিয়ে আসে—দুখীরামের কাছে। তারপর গড় হয়ে প্রণাম করে, দুখীরামের হস্তস্থিত বঁটিটা শিথিল হয়। চন্দরা গলার মাদুলিটা খুলে তুলসী মঞ্চের ওপর রাখে। তারপর

বড় বৌয়ের কাছে গিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে বলে]

চন্দরা ॥ সোনাটা ত ঘরেই আছে দিদি। বড়ঠাকুরকে বল সোনাটা ভাঙিয়ে যেন খাজনার ট্যাকাটা আজকেই দিয়ে দেয়। সময় হলে মাদুলি গইড়ে দেবে আমায়।

বড়বৌ ॥ সতীপনা দেখাচ্ছে গো,—সতীপনা। বলে মাদুলির সোনা ভাঙিয়ে খাজনার ট্যাকা দিয়ে গ্যাও।

দুখীরাম ॥ (এখন কিছুটা প্রকৃতিস্থ) দেখো দিকিন, বুড়োশিবতলার মাদুলি এইভাবে কেউ রাখে ? থাক, খাজনাটা আর কি করা যাবে, ধান দিয়েই শোধ করতে হবে। আর গুলোর জমির দরুণ তো বেগার খাটতেই হবে সোমবচ্ছর। তাই বলে মাদুলি, এ্যাঁ ! দেখো দিকিন কাণ্ড, ছিদেম এ্যাই হতভাগা কোথায় গেলি—

[ছিদাম তুলসীমঞ্চের পিছনে লুকিয়েছিল এখন ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে]

মাদুলীটা পরতে বল, পরতে বল বৌমাকে। দেখ দিকিনি, মানত করা মাদুলি—ছ্যা ছ্যা ছ্যা পরতে বল, মাদুলি খুলে রাখতে আছে ? বৌ ভাত বাড়, চানটা করে আসি।

[গামছাটা নিয়ে বেরিয়ে আসে। বড়বৌ একবার তীব্র দৃষ্টিতে ছোট বৌয়ের দিকে দেখে তারপর দুমদাম করে পা ফেলে বেরিয়ে যায় ঘড়াটা নিয়ে। দাওয়ার খুঁটিটায় ঠেস দিয়ে চন্দরা দাঁড়িয়ে থাকে। তার চোখে জল, উদাস দৃষ্টি, পেছন থেকে ছিদাম এসে ওর গলায় মাদুলিটা পরিয়ে দেয়। সুর করে বলে]

ছিদাম ॥ (সুরে) অতি অভিমানী রাধিকা রমণী
ফিরে এলো নিজ ঘরে—
দুটি চোখে জল ঝরে অবিরল
তবু সে মাদুলী পরে।

চন্দরা ॥ (কটাক্ষ করে) মরণ ! (দ্রুতপদে দাওয়ায় উঠে যায়)

ছিদাম ॥ (সুরে) ফিরে আয় ফিরে আয়
অভিমানী রাই আমার
ফিরে আয় ফিয়ে আয়
হাঃ হাঃ হাঃ—

[পর্দা]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পূর্ববর্ণিত ঘর, শুধু দাওয়ার মাথায় খড়ের চালের জায়গায় জায়গায় গর্ত হয়ে গেছে। পর্দা সরবার সঙ্গে সঙ্গেই অবিরাম ভেক ডাকার শব্দ ভেসে আসছে। থমথমে ভাব। মনে হয় এইমাত্র বৃষ্টি হয়ে গেছে। সকালবেলা। ছোটবৌ চন্দরা দাওয়ায় ন্যাকড়া ছেঁকে জল তুলে একটা বালতিতে ভর্তি করছে। ছিদাম একটা কঞ্চি হাতে নিয়ে আসে। তার মাথায় গামছা জড়ানো, গা ভিজে গেছে।]

ছিদাম ॥ গাঙ একেবারে ভেসে গেছে। চক্কোত্তদের বাড়ীর রোয়াক পর্যন্ত জল উঠেছে। এই কঞ্চি ভোর।

চন্দরা ॥ (কাজ করতে করতে) তা কি করতে হবে ?

ছিদাম ॥ এ্যাঁ।

চন্দরা ॥ না জিজ্ঞেস করছি, চক্কোত্তিদের রোয়াক থেকেও জলটা ফেলে দে আসবো ?

ছিদাম ॥ না, তোর সাথে কথা চলে নে। বললুম একটা খবর আর ও বুঝলো তার উল্টো। বলছি এমন বার্ষে যদি আর তিনদিন চলে তো গেরাম বলে আর কিচ্ছু থাকবেনে। সব ডুববে।

চন্দরা ॥ ভালই তো।

ছিদাম ॥ ভাল ?

চন্দরা ॥ ভাল না ? ডাঙার থেকে উপোষ করে, আধপেটা খেয়ে ত দিন কাটছে। জলের তলায় গেলে তবু হাবুডুবু খেয়ে বাঁচবো। হাঃ হাঃ হাঃ

ছিদাম ॥ তোর ঐ ঢঙের ঠাট্টা শুনলে হাড়পিত্তি জ্বলে যায়। ঘরে একমুঠো চাল নেই। গেরাম মাঠ জলে একাকার হয়ে গেছে, এসময় ঠাট্টা যে কোথথেকে জন্মোয় বাপু তা জানিনি।

[কিঞ্চিৎ রেগে ঘরে ঢুকে যায়। বড়বৌ অপর ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। হাই তোলে, আড়মোড়া ভাঙে। তারপর উনুনের কাছে গিয়ে খানিকটা ছাই তুলে নেয়। গামছা আর ঘড়া নিয়ে বলে]

বড়বৌ ॥ উনুনে আঁচ পড়েনে এখনও ?

চন্দরা ॥ আঁচ দে আর হবে কি, ঘরে ত ক্ষুদও নেই একমুঠো।

বড়বৌ ॥ থাকবে কোথ্‌থেঙে ? বসে বসে গিললে বলে কুবেরের ভাণ্ডারও ফুইরে যায়। আজ বলে ত' নয় সারামাস ত এই কেত্তনই চলছে। বাবুদের জন খেটে যা রোজ পায় তা থেঙেই চাল কিনে নে আসে। খোরাক ত বন্ধ থাকেনে কারুর। জল হোক ঝড় হোক আর বজ্রাঘাতই হোক, কাঁড়ি কাঁড়ি গেলন ত কারুর কমতি নেই।

চন্দরা ॥ সংসারে থাকতি গেলে খাটতেও হবে, খেতেও হবে। তা নিয়ে দিনরাত চ্যাটাং চ্যাটাং বচন সহ্যি হয় নে বাপু।

বড়বৌ ॥ সহ্যি যদি না হয় যে য্যামনে পারে চলে যাক। বলে আপনি পায়নে খেতে শঙ্করাকে ডাকে—এ হ'য়েছে সেই বেত্তান্ত। নিজেদের খোরাক জোটেনে দুবেলা, জোয়ান ভাই ভাজকে বস্যে বস্যে গেলাও।

চন্দরা ॥ বস্যে বস্যে কে কাকে গেলায় দিদি। যে যার খেটে খায়।

বড়বৌ ॥ খবরদার মুখের ওপর কথা বলবিনি। বলি কার জন্যে আমার মরাইয়ের ধান বেচে জমিদারের খাজনা শোধ হয় ?

[ছিদাম বেরিয়ে আসে ঘর থেকে]

ছিদাম ॥ আঃ, একটা দিনও কি তোমরা নিশ্চিন্দে থাকতে দেবে নে ?

বড়বৌ ॥ নিশ্চিন্দে থাকতে হলে সংসারটাকে একটু দেখতি হয়। পটের বিবিকে মাথায় তুলে দিন কাটালে সংসারে শান্তি এ্যাসেনে।

[পিছন দিয়ে ঘাটে চলে যায়]

ছিদাম ॥ তোদের একটা না মরা পর্যন্ত এ ভিটেয় কাকচিল বসতে পারবে নে।

চন্দরা ॥ ভিটেয় মানুষ জন তো দিব্যি বসে আছে দেখতে পাই।

ছিদাম ॥ ঐটুকুনই জানো, ঐ কথা, ঐ কথাটুকুনই শিখ্যেছিল বাপ আদরের ধাড়ী মেয়েকে—

চন্দরা ॥ হ্যাঁ বাপ যদি জানতো, বোবা হয়ে জন্মালে মেয়ে সুখে থাকবে, তাইলে বোধহয় এই জিভটা কেটে ফেলে দিতো ছেলেবেলায়।

[দরজার কাছে ছাতা মাথায় এসে দাঁড়ায় রামলোচন চক্রবর্তী, চন্দরা ওর ডাক শুনে ঘোমটা টেনে বালতি নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়]

রামলোচন ॥ দুখে আছিস না কিরে, দুখিরাম।

ছিদাম ॥ না চক্কোত্তিমশায়, দাদা তো নেই।

রাম ॥ এ্যাঁ নেই? সে কিরে! কোথায় গেল এই সক্কাল বেলা?

ছিদাম ॥ দাদা বেইরেচে সেই রাত থাকতি থাকতি নদীর ওপারে। আমাদের জোল ধানের জমিটায় ধানগুলো পেরায় পেকে এয়েছে। জল যে রকম বাড়ছে, আজকালের মধ্যে ধানকটা না কাটলে সবটুকুই যাবে নদীর গভ্যে—তাই দেখতে গেছে সেই ভোরবেলায়—

রাম ॥ ও তা এখুনি ফিরে আসবে কি বলিস্?

ছিদাম ॥ হ্যাঁ একবার এসবে। ধান কাটার মতুন হলে দুভাই যাব কাস্তে নে।

রাম ॥ হুঁ, কিন্তু এদিকে যে মহামুস্কিল হয়ে গেলরে ছিদেম।

ছিদাম ॥ কি হল চক্কোত্তিমশায?

রাম ॥ আর বলিস্ কেন? কাল রাত্তিরে হঠাৎ কোথাও কিছু নেই শুনি পাল্কীর আওয়াজ। ভাবছি এই বৃষ্টি, এত রাত্তিরে কে এলো আবার? হ্যারিকেনটা জ্বেলে দেখি ও বাবা তিনখানা পাল্কী। প্রথমে নামলো স্বয়ং সেজবাবু, তার পরেরটায় তাঁর সেই তিনি, বাঈজীবে, তারপর তার তানপুরা, সারেঙ্গী, চাকর মোসাহেব—সে এক এলাহি কাণ্ড! ছোট্ট ছোট্ সেই রাত্তিরে, কিচ্ছু জোগাড় নেই। যা হয় তো বন্দোবস্ত করা গেল। কিন্তু কাছারীর অবস্থা দেখে বাবু ত রেগে টং।

ছিদাম ॥ কেন?

রাম ॥ চাল ফুটো। এ বছর তো আর ছাওয়ান হয়নি রে। সারারাত জল ঝরছে। সে এখানে বিছানা পাতা হয় ত পায়ে জল পড়ে, আবার ওখানে পাতে তো মাথায় পড়ে টপ্‌টপ্। সে মাগীর খুব ফুর্তি, হেসেই অস্থির; মাগী যত হাসে বাবু তত রাগে। ডিমের খোসা, বিলেতী মদের বোতল, ঘর একেবারে নৈনেত্ত।

ছিদাম ॥ (ছোট গলায়) বোতলগুলো সব খালি!—

রাম : খালি কিরে বাপু। সে চোখকানে কি দেখছে কেউ? এই একটু করে খাচ্ছে আর ফেলছে ছুঁড়ে। উঃ সে বোটকা গন্ধে বুঝলি, ঘরের কাছে যাওয়া দায়।

[ছিদাম একবার ঠোঁটটা জিভ দিয়ে বুলিয়ে নীচু গলায় বলে]

ছিদাম ॥ এক আধটা ভাঙা বোতল—

রাম॥ (ইঙ্গিতে বুঝতে পারে) হ্যাঁ হ্যাঁ চতুর্দিকে ছড়াছড়ি, কে কার খবর রাখছে? যাবি ত এক্ষুনি, গিয়ে দেখবি এখন।

ছিদাম॥ কোথায় যাব গো?

রাম॥ সেই কথাই তো বলতে এলুমরে। কাছারীর অবস্থা দেখে…বাবু একেবারে এই মারে তো এই মারে। আমাকে ডেকে বললে, কাছারীর চাল ছাওয়া হয়নি কেন? আমি বললুম, এক বছর অন্তর চাল বদলানো হয়, তা এবছর যে এতটা বর্ষা হবে সে ত আগে বোঝা যায়নি। আর ঠিক এসময় হুজুরদের পায়ের ধুলো পড়ে না, কাছারী বন্ধই থাকে। শুনে কিছুক্ষণ গুম হয়ে বল্লে—"এই রাত্তিরেই লোক ডাক, চাল মেরামত করতে হবে।" আমি বলি, "সে কি হুজুর? এই রাত্তিরে জনমজুর কোথায় পাবো। তাছাড়া এই বর্ষাতে চাষারা যে যার ক্ষেতে আল বাঁধছে, জোলোধান কাটছে, এখন জনমজুর চাইলেই কি পাওয়া যায়?" মাটি করলে সরকার। সে বেটা ফস্ করে বল্লে "কেন কুরীদের দুভাই ত কড়ার করে গুলোর ধানের দরুণ খাজনা মকুব করিয়ে নিয়েছে। যখনই দরকার হবে, গায়ে গতরে খেটে শোধ দেবে।" এই না শুনে বাবু বললে—"ডাক এখুনি তাদের।" অনেক কষ্টে রাত্তিরটুকু থামিয়ে রেখেছি। এক্ষুনি চল বাবা, আজ আবার দারোগাবাবু আসছে বাউরাদের সেই ফৌজদারীর তদন্তে। এসেই আমায় ডেকে পাঠাবে। দুখে ফিরে এলেই সঙ্গে করে নিয়ে চলে আয়। আমি এগোই।

ছিদাম॥ সেকি বলছো গো চক্কোত্তি মশায়। আজ যে এক্ষুনি আমরা জোলো ধান কাটতে যাব।

রাম॥ জোলো ধান কাল কাটিস্ বাবা।

ছিদাম॥ কাল কি ও ধানের দিশে থাকবে আর? আজই জল কিরকম বেড়েছে দেখেছ? তাছাড়া ঘরে আজ একদানা চাল নেই। ঐ ধান যদি এবেলা কেটে নে আসতে পারি ত সন্ধ্যে নাগাদ ঝেড়ে পাছড়ে মুদীর দোকানে বদল দে কিছু চাল নে আসবো।

রাম॥ সব বুঝলুম। কিন্তু আমি কি করব বল? সকাল বেলায় নিজে এসে খবর দিলুম। বাবু তো পাইক পাঠাতে বলেছেল। (ছিদাম নীরবে ভাবে) আর ভাববার কিছু নেই, দুখীরাম ফিরে এলেই চলে আয় কাছারী বাড়ী, আমি এগোই। হ্যাঁ দা দুখানা নিস্ মনে করে।

[রামলোচন বেরিয়ে যায়, পেছনে বড়বৌ পুকুর ঘাট থেকে এসে কাপড় দাওয়ায় লম্বা করে মেলে দিতে দিতে বলে]

বড়বৌ ॥ সক্কালবেলাই চক্কোত্তি কেন এসেছেল ঠাউরপো ?

ছিদাম ॥ কাছারী বাড়ীর চাল ফুটো হয়ে গেছে, বেগার দিতে হবে।

বড়বৌ ॥ আজ ?

ছিদাম ॥ হ্যাঁ।

বড়বৌ ॥ ও, তাহলে আজও জোলো ধান কাটা হবেনে !

ছিদাম ॥ দাদা এসুক। দেখি কি করা যায়।

বড়বৌ ॥ যা করবে সে বুঝতেই পারছি। দুদিন তেবু আধপেটা জুটেছিলো, আজ গুষ্টিশুদ্ধ হরিমটর।

ছিদাম ॥ কি হবে বুঝতে পারছিনি। তখন পঞ্চাশবার মানা করনু, দাদা শুধু শুধু লিখিত্ পড়িত্ কড়ার করতে গেল। কথায় বলে বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা। ও শালার জমিদার যখন একবার শুনেছে ওকি ছাড়বে ?

বড়বৌ ॥ হ্যাঁ, দাদার তো তোমার সখের কড়ার। না খেটে খেটে গায়ে বাত ধরে গেল তাই জমিদার বাড়ীতে বেগার দিয়ে বাতটা সাইরে নেবে।

ছিদাম ॥ সে কথা হচ্ছেনে। এই কথাকে উল্টো মানে করা তোমাদের মেয়ে জাতের স্বভাব। দাদাকে বলেছিনু যে জমির তরে ধানিখাজনার বন্দোবস্ত, সে জমিই যখন গাঙের গভ্যে, তখন খাজনা শুধুমুধু আমরা দিতে যাবো কেনে ? জমিদার নালিস করে করুক। দুদিন না হয় কোর্টঘরই করবো।

বড়বৌ ॥ হ্যাঁ, কার কতো মুরোদ সে জানা আছে। যত দৌড় ঐ ঘরের বৌয়ের দোর পর্যন্ত। আজ গুলোর জমি গাঙের গভ্যে গেছে কাল ডাঙার জমি যাবে মহাজনের গভ্যে। মাটির সরা হাতে ভিক্ষেয় বেরোতে হবে দোরে দোরে।

ছিদাম ॥ তা তোমাদের মতুন নক্ষীর বাহন ঘরে থাকলে নক্ষী ভয়েই ঘেঁষবেনে ভিটের ধারে কাছে।

বড়বৌ ॥ খামোখা কথা বাড়িওনি ঠাউরপো সক্কালবেলা। নক্ষি ছাইড়েছে কে এই ভিটে থেঙে ? মরাই ভেঙে ধান দে খাজনা শোধ করা হয়েছে কোন ছোটনোকের মেয়ের মান ভাঙাতে ?

[চন্দরা পেছন দিকে দাঁড়িয়ে সব কিছুই শোনে]

চন্দরা ॥ খামোকা বাপ তুলবেনে বলে দিচ্ছি।

বড়বৌ ॥ বেশ করবো। একশোবার তুলবো, হাজারবার তুলবো। গতরের রক্ত জল করা ট্যাকায় মাদুলী গইড়েছিস এরই মধ্যে ভুলে গেছিস্ ?

চন্দরা ॥ হ্যাঁ, ঐ অলক্ষুণে মাদুলী আমি টান মেরে ফেলে দিয়েছিনু তুলসীতলায়, বট্‌ঠাকুর না বললে হাতে করে ছুঁতোম নি আমি।

বড়বৌ ॥ ঢঙ করে বট্‌ঠাকুরের পায়ের তলায় গড় করে মন ভিজুতে নজ্জা করে নে, ভাসুর সোহাগী !

চন্দরা ॥ মুখ সামলে কথা বলবে।

বড়বৌ ॥ কেন লা ? তোর কোন বাবাকে ভয় করি লা, হারামজাদী।

[দুখীরামের গলা শোনা যায়। ছিদেম যেন নিষ্কৃতি পায়, ছুটে যায় আগলের কাছে]

দুখী ॥ ছিদাম, দেখে এনু বুঝলি, কোমর ভর জল উঠেছে। পাক ধরেছে ধানের ওপর, তবু আজ কেটে না ফেললে কাল আর কিছুই পাওয়া যাবেনে। চ চ আর দেরী করিস্‌নে, কাস্তে নে আয় দুখানা, ঝপ ঝপ মেরে দিই।

ছিদাম ॥ কিন্তুক এদিকে যে মহা মুস্কিল হয়েছে।

দুখী ॥ মুস্কিল কিসের ? (কান পেতে শোনে, দুটি বৌ তখন পাশাপাশি দুটো ঘরে ঢুকে গেছে। ঘরের ভের্তর থেকে তাদের উচ্চস্বরে কলহ শোনা যায়, কথা বোঝা যায় না। তবু আওয়াজ অবিরাম আসে) ও নেগেছে বুঝি সক্কাল থেঙেই। তা নাগুক গে, ও ত নিত্যি নেগেই আছে।

ছিদাম ॥ না, ও ঝগড়ার কথা বলছি নি, চক্কোত্তি মশাই এয়েছেল। মেজবাবু এয়েছে, কাছারী বাড়ীতে কাল রাত্তিরে। কাছারী বাড়ীর চাল ছাইতে হবে আজ সারাদিন।

দুখী ॥ কেন ?

ছিদাম ॥ চাল দিয়ে জল পড়ছে হু হু করে।

দুখী ॥ ও সুখ খায় গুড় দিয়ে মুড়ি। বলে নিজের চালে দুটো খড় গুঁজে দিতে সময় পাচ্ছিনে। পাকাধান শুদ্ধ জমি ওদিকে ভেসে যাচ্ছে, এখন আমি যাব জমিদারের চাল ছাইতে! ব্যাঃ ব্যাঃ, এলে বলে দিবি পারবুনি।

ছিদাম ॥ বলেছিনু তো, বললে কড়ার আছে।

দুখী ॥ হ্যাঃ, তোর কড়ারের মুখে ঝাড়ু। খাজনার ক'মন ধান দিতে পারিনি বলে কি মাথা বিকিয়ে বসে আছি নাকি? যখন সময় হবে দোর। এবার আসলে বলে দিবি, সহমানে যা খেটেছি এ্যাতোদিন তাতে তোমাদের দেনা শোধ হয়ে গেছে। তার ওপরে যদি মেলা চোখ রাঙাতে আসো—

[নেপথ্যে রামলোচন: দুখে ফিরেছিস্ নাকিরে, দুখীরাম" বলতে বলতে প্রবেশ করে]

রাম ॥ এইযে দুখে, শুনেচিস্ তো বিত্তান্ত?

দুখী ॥ হ্যাঁ ও বেগার দেবার সময় আজ নেই আমাদের।

রাম ॥ সে কিরে, জমিদার স্বয়ং তলব করেছে।

দুখী ॥ হা তোর জমিদারের গুষ্টির তুষ্টি করি আমি। নিজের ঘরে একদানা চাল নেই, আল বাঁধতে বাকী অর্দ্ধেক জমির, ওদিকে পাকা ধানের ক্ষেত ভাসছে, এখন আমি যাই জমিদারের বেগার খাটতে। পষ্ট বলে দিচ্ছি চকোত্তি মশায় যা পারো কর। পারবুনি আমরা।

রাম ॥ এ্যাই দেখো, খামোকা আমার ওপর চটছিস্ কেন? আমি—আমি তো বুঝিরে, জমিদার নিজে মনে কর এসে হাজির।

দুখী ॥ নিজে হাজির থাকে ত নিজের চাল নিজে ছেয়ে নিক্। কথা বাড়িওনি চকোত্তি মশায়, দেরী হয়ে যাচ্ছে আমাদের। এক্ষুনি যেতে হবে।

রাম ॥ আরে যাবি কোথায়? বাবু বলে এক্ষুণি ধরে নিয়ে আয় তাদের।

দুখী ॥ কোন শালা! ধরবে কোন শালা? কারও খাই না পরি? নালিশ মোকর্দমা যা পার করগে যাও, আমরা যাবুনি।

[লাঠি হাতে একজন হিন্দুস্থানী পাইক দরজায় দাঁড়ায়]

পাইক ॥ কেয়া দিক করালা হো গোমস্তাবাবু, চলিয়ে জলদি।

রাম ॥ আরে আমি গেলে কি হবেরে বাপু, এরা যদি না যায়!

পাইক ॥ কোন যায়গা নেহি কোন? এ দুখীরাম আওয়া আওয়া, জলদি আওয়া (দুভাই পরস্পরে মুখ চাওয়া চাওয়ি করে) কা ভইল! আরে খাড়া কিঁউ, আওয়া জলদি।

ছুখী ॥ (হঠাৎ) যাবো নি আমরা।

পাইক ॥ কেয়া? নেহি যাওগে? আরে হুকুম থা কি ঘাড় পাকাড়কে লে যানা। লেকিন পাকড়ানে কা জরুরৎ নেই হ্যায়। এই সে ঢুক্কল্‌সে লে যায়গা।

[ছুখীরামকে ধাক্কা দেয়, ছুখীরাম পড়ে যায়। অপমানে ওর চোখ দুটো জলছে। উঠে দাঁড়িয়ে কিছু না বলে মুখ নীচু করে বেরিয়ে যায় বাইরের দিকে। পিছনে ছিদাম একখানা দা নিয়ে ওর পিছু পিছু যায়। পাইক ও রামলোচন ওদের অনুসরণ করে]

[দু'বৌ এসে দৌড়ে দাওয়ায় দাঁড়ায়]

চন্দরা ॥ দিদি—

বড়বৌ ॥ (হঠাৎ ডুকরে কেঁদে ওঠে) আমি কি করবো ছোটবৌ।

চন্দরা ॥ (কেঁদে ফেলে) আমি জানিনে দিদি।

বড়বৌ ॥ (কেঁদে) এ আমার কি পোড়াকপাল পুড়লো ছোটবৌ।

(চন্দরাকে জড়িয়ে ধরে)

[চন্দরা ওর মাথাটা ধীরে ধীরে নিজের কোলে নিয়ে হাত বোলাতে থাকে। বাইরে ঝড় জল শুরু হয়েছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, মাঝে মাঝে বজ্রের গর্জন। চন্দরা ও বড়বৌ ঐভাবে বসে থাকবে মঞ্চে। ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুৎ সমানে চলছে বাইরে। মাঝে মাঝে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকে দেখা যায় চন্দরা উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। তার কোলে ধীরে ধীরে বড়বৌ ঢলে পড়েছে ঘুমে। ধীরে ধীরে মঞ্চের আলো নিভে আসে। পরক্ষণেই আবার জ্বলে দেখা যায় পূর্ববৎ দুজনে বসে আছে। ইতিমধ্যে বাইরে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে।]

চন্দরা ॥ দিদি ওদিদি, সন্ধ্যে হয়ে এলো। ওঠো, তুলসীতলায় পিদিম দিতে হবে। লণ্ঠনটা জ্বালতে হবে দিদি।

বড়বৌ ॥ এ্যাঁ।

চন্দরা ॥ উঠবেনে? সন্ধ্যে হয়ে এলো।

বড়বৌ ॥ হোক্ গে।

চন্দরা ॥ ওরা বোধহয় এইবার ফিরবে। পাড়ায় দেখব একবার কারও বাড়ী যদি চারটি চাল পাওয়া যায়?

বড়বৌ ॥ (মাথা নীচু করে, একবার ওকে দেখে ঘাড় নেড়ে বলে) না।

চন্দরা ॥ (ম্লান হেসে) ওরা সারাদিন খেটেখুটে আসবে দিদি।

বড়বৌ ॥ অত দরদ থাকে তো আনগে যা ভিক্ষে মেঙে, দিগে যা সেদ্ধ করে, আমি পারবুনি। চাষীর ঘরের বৌ হয়ে রোজ রোজ চাল ভিক্ষে মাঙতে আমি পারবুনি। (চন্দরা নীরবে ওর মাথায় হাত বুলোয়) তেরো বছরের বৌ হয়ে এয়েছিনু এই ভিটেতে, মরাই ভর্তি ধান, গোয়ালে দুটো গরু। সংসারে লোক ছেলনি। নিজের ইচ্ছে মতুন ফেলেছি, ছইড়েছি। আর দিনে দিনে কি হলো ছোটবৌ? মনে হচ্ছে যেন যম গিলতে আসছে সারা সংসারটাকে।

চন্দরা ॥ একথা কেন বলছ দিদি? দুদিন অভাব হয়েছে, আবার স্বচ্ছল হবে।

বড়বৌ ॥ ওরে না—না, তুই বুঝতে পারছিস্ নি, চারদিক থেকে কালে ঘিরেছে সংসারটাকে, নইলে আজই বা অমন হবে কেন? আজকাল ওর মূর্তি দেখিস নি? যেন দৈত্যিদানোর নতুন হয়ে উঠছে দিন দিন। মুখের দিকে তাইক্যে কথা কইতে ভয় হয়।

চন্দরা ॥ একার মাথায় সংসার। অভাব, অনটন, তাই বোধহয় ওইরকম মনে হয় দিদি।

বড়বৌ ॥ শুধু আজ বলে ত নয় ছোটবৌ, কোনদিন আমার দিকে তাইক্যে হেসে দুটো বাক্যি বলেনে। শুধু কাঁড়ী কাঁড়া গেলন। বাক্যির মধ্যে বাক্যি "বৌ ভাত দে।"

[বাইরে থেকে দুখীরাম ও ছিদাম কাজ সেরে ঘরে ফেরে। স্বল্প আলোয় ও বিদ্যুতের চমকে দেখা যায় দুখীরামের চেহারা ক্রোধে ঘৃণায় পরিপূর্ণ। অত্যন্ত উত্তেজিত, তার হাতে দা, পিছনে ছিদাম]

দুখী ॥ বৌ, ভাত দে। (বড়বৌ চুপ করে থাকে) কথা কানে যাচ্ছেনে, ভাত বাড়।

বড়বৌ ॥ (ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে) ঘর ভর্তি চাল থরে থরে সাইজ্যে রেখেছো। "ভাত বাড়" নজ্জা করেনে চাইতে!

দুখী ॥ কি বললি হারামজাদী!

বড়বৌ ॥ হারামজাদী? যা সত্যি তাই বলেছি, বলে ভাত দেবার মুরদ নেই, কিল মারবার গোঁসাই।

দুখী ॥ চুপ কর, চুপ কর তুই।

বড়বৌ ॥ কেনে চুপ করবো? বুলির মধ্যে বুলি "বৌ ভাত দে"। ঐ রাক্ষসের বাকড়ের জন্তি আমি দোরে দোরে চাল ভিক্ষে মেঙে' বেড়াবো? কেন কিসের তরে?

দুখী ॥ দূর হয়ে যা সামনে থেঙে, সারাদিন পেটে একটা দানা পড়েনে, রাগ চড়ে আছে মাথায়।

বড়বৌ ॥ ঐ মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। রাগ ফলাতে এয়েছে ঘরের বৌয়ের কাছে। কেন? জমিদারের পাইক ঘ্যাথন ঘাড় ধাক্কা দে নে গেল ত্যাথন টুঁ শব্দটি বেরোয় নি মুখ থেঙে?

দুখী ॥ খবরদার, খবরদার বলছি, খুনোখুনি হয়ে যাবে বৌ। রাগ চড়াসনি আমার মাথায়। বেইরে যা এখুনি। বেঁইরে যা ভিটে থেঙে।

বড়বৌ ॥ কেন যাবো? কেন যাবো আমি আমার শ্বউরের ভিটে ছেড়ে। যদি ভাত যোগাবার মুরোদ না থাকে, তবে আমায় ভর্তি করে দে এসো বাজারের নাইনে।

[দৌড়ে ঘরে ঢুকে যায়]

দুখী ॥ কি বললি! কি বললি হারামজাদী, বাজারের নাইনে?

[দা হাতে উত্তেজিত দুখারাম ছুটে যায় বড়বৌএর ঘরে। ভিতর থেকে একবার মাত্র একটা আর্ত চিৎকার ভেসে আসে। ছিদাম ছুটে যায় ঘরে, পিছনে চন্দরা।]

[হাতে রক্তাক্ত দাখানা নিয়ে উদভ্রান্ত দুখীরাম বেরিয়ে আসে]

ছিদাম ॥ (নেপথ্যে) ওকি করলে দাদা?

চন্দরা ॥ (নেপথ্যে) দিদি। দিদি। ওগো কি হ'ল! কি হ'ল বল না!

ছিদাম ॥ (নেপথ্যে) চুপ কর চুপ কর—মরে গেছে।

দুখী ॥ এ্যাঁ ম—মরে গেছে? (হাত থেকে দাখানা পড়ে যায়, দাওয়ার খুটিটা ধরে বসে পড়ে)

[ছিদাম বেরিয়ে আসে, পিছনে চন্দরা]

চন্দরা ॥ ওগো, কি হবে এখন? কি সর্বনাশ হ'লো গো—

ছিদাম ॥ আঃ, চুপ কর। একটু নিশুতি হলে গাঙের জলে ভাসে' দে আসবো দুজনে মিলে। তুই এই দাখানা পুকুর ঘাটে চট করে ফেলে দিয়ে আয় দিনি। [চন্দরা দা'টা নেয় ও যেতে গিয়ে ফিরে আসে, নেপথ্যে

রামলোচনের গলা শোনা যায়। তাড়াতাড়ি দা-টা শাড়ীর আঁচলে লুকোয়]

রাম॥ দুখে আছিস নাকিরে, দুখীরাম? (ডাকতে ডাকতে ভেতরে চলে আসে) কি হল, এযে একেবারে নিশুতি রে। তুলসীতলায় পিদিম পর্যন্ত পড়েনে, ব্যাপার কিরে? ঝগড়া ক'রে মরেছে বুঝি দুটোতে। কে তুই ছিদেম তো? ভেবেছিলাম সারাদিন তোদের বৌ দুটো শুদ্ধ উপোস করে আছে, তাড়াতাড়ি কিছু চাল দিয়ে যাব। কিন্তু খামোকা খামোকা ঐ দারোগাবাবু এত দেরী করিয়ে দিলে—নে নে ধর এই চাল কটা—সারাদিন খেটেখুটে এলি (দুখীরাম কেঁদে ওঠে) কাঁদছে কে? দুখী না, বৌদের ঝগড়া তা দুখে কেঁদে মরছে কেন রে?

ছিদাম॥ বড়বৌকে দা দে মাথায় কোপ দেছে।

রাম॥ এঁ্যা, সর্বনাশ! কেরে ছোটবৌ?

ছিদাম॥ হঁ্যা, না মানে—

রাম॥ হুঁ বুঝতে পেরেছি, বলতে হবে না, জানি এইরকম একটা কাণ্ড একদিন ঘটবে, কি খাণ্ডারনী মেয়ে মানুষরে বাবা! যাক, মরেনি তো?

ছিদাম॥ মরেছে।

রাম॥ এঁ্যা!! (চালগুলো পড়ে যায়)

ছিদাম॥ (পা জড়িয়ে ধরে) কি হবে চক্কোত্তিমশায়?

রাম॥ (ক্ষণেক ভেবে) এক কাজ কর দেখি, ছুটে কাছারী বাড়ী চলে যা। দারোগা সাহেব এখনো বসে আছে ওখানে। গিয়ে বলবি "দাদা সারাদিন খেটে এসে ভাত চেয়ে পায়নে—তাই বচসা হতে হতে—"

দুখী॥ (চীৎকার করে) হঁ্যা, ঐ যথার্থ কথাটাই ও গিয়ে বলে এসুক চক্কোত্তিমশায়, বলে এসুক। আর আমি বাঁচতে চাইনে। (কেঁদে ওঠে)

রাম॥ তুই থাম দিকিনি—তুই এখানে বোস, চুপ করে বোস। এ ভিন্ন ছুঁড়িটাকে বাঁচাবার কি উপায় বল? ওতো মেয়েছেলে, জেরায় এক-মিনিটও টিকবেনে—

ছিদাম॥ তাতে যে আমার দাদার ফাঁসী হবে চক্কোত্তিমশায়!

রাম॥ নাও হতে পারে, কিন্তু এদিকে তোর বৌটা যে ফাঁসীতে ঝুলবে?

ছিদাম॥ বৌ গেলে বৌ পাবি চক্কোত্তিমশায়, দাদা গেলে তো দাদা পাবুনি।

[চন্দরার হাত থেকে দাখানা পড়ে যায়, ও পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে]

না মানে আমি বলছিনু সবাইকে বাঁচানোর একটা উপায় করে দাও চকোত্তিমশায়।

রাম ॥ দেখ এক কাজ কর—বৌকে শিখিয়ে দে দারোগা এলে বলবে—বড়বৌ তাকে তাড়া করেছিলো বঁটি নিয়ে—দা দিয়ে ঠেকাতে গিয়ে হঠাৎ কোপ পড়ে গেছে। আমি যাই—দুর্গা দুর্গা, দেখদিকিনি ভর সন্ধ্যেবেলায় কি কাণ্ড। জলজ্যান্ত একটা মানুষকে কুপিয়ে মেরে ফেললে গা। কি খুনী মেয়েছেলেরে বাবা। (বলতে বলতে বেরিয়ে যায়)

[বাহিরে রামলোচনের কণ্ঠস্বর শোনা যায়—"কি খুনী মেয়েছেলে গো? আরও দু একটি কৌতূহলী কণ্ঠস্বর ভেসে আসে—"কি হ'ল চকোত্তিমশায়" "আর কি খুন।"—ক্রমশ একাধিক পরে বহুকণ্ঠে ধ্বনিত হয় "খুন—খুন!" এদিকে চন্দরা পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে চকিত বিদ্যুৎ চমকে ওর বিস্ফারিত চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে। দুখীরাম অবিরাম কাঁদছে অনুচ্চ গলায়। ছিদাম ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে চন্দরার কাছে]

ছিদাম ॥ তোর কোনো ভয় নেই, বৌ, তুই খালি বলবি দা দে ঠেকাতে গিয়ে—(চন্দরা নিস্পন্দ) বৌ! বৌ! না—না, যা সত্যি তুই তাই বলিস, যা সত্যি—

[বাহিরে কোলাহল ক্রমেই বাড়তে থাকে। দু একজনের বিক্ষিপ্ত কণ্ঠ শোনা যায়—"এই দারোগাবাবু—দারোগাবাবু আসছে।" একটা সুতীব্র টর্চে আলো এসে পড়ে মঞ্চে। তারপর দুজন সেপাই সহ পুলিস ইনস্পেক্টর আসেন। পিছনে অনেক লোক আগলের কাছে ভিড় করে দাঁড়ায়]

দারোগা ॥ (ছিদামকে) এই কি বলছো, কি বলছো ওকে? কি শেখাচ্ছো (ছিদাম ভয়ে সরে যায়) কি নাম তোমার?

চন্দরা ॥ চন্দরা দাসী।

দারোগা ॥ (দাখানা তুলে পরীক্ষা করে) হুঁ। তোমার কাপড়ে এতো রক্ত কেন? (চন্দরা একমুহূর্ত নীরব থাকে) জবাব দাও—কাপড়ে এতো রক্ত লাগলো কি ক'রে? (ধমক দেয়)

ছিদাম ॥ হুজুর!

দুখীরাম ॥ (চিৎকার করে) হুজুর ও সতীলক্ষ্মী হুজুর, ও কিচ্ছু জানে নে—
আমি—আমি—

দারোগা ॥ চোপ ! চোপ ! বলো (চন্দরাকে) কে খুন করেছে ?

চন্দরা ॥ আমি।

ছিদাম ॥ বৌ !

দুখীরাম ॥ না হুজুর। মিথ্যে কথা ! আমাকে বাঁচাবার জন্য—

দারোগা ॥ চোপরাও— ! যাকে খুন করেছো ও তোমার কে হয়—?

চন্দরা ॥ বড় জা— ।

দারোগা ॥ কেন ওকে তুমি খুন করলে ?

চন্দরা ॥ ওকে আমি দেখতে পারতুম নি, তাই।

ছিদাম ॥ না হুজুর, ও মিছে কথা বলছে। আমি—আমি মেরেছি— !
ওখানা আমাব দা—

দুখীরাম ॥ না—হুজুর, ওরা নিদ্দুষী। আমি—আমি—

দারোগা ॥ চোপ ! চোপ চেঁচাবে না— । লাস কোথায়—

[ছিদাম ইঙ্গীতে ঘরটা দেখায়]

ছটুলাল এইখানে দাঁড়াও (একজন সেপাই বাইরের আগলের মুখে দাঁড়ায়)

তুমি এসো আমার সঙ্গে (অপর সেপাইসহ ঘরে ঢোকেন)

দুখীরাম ॥ (দারোগার পা চেপে) হুজুর, হুজুর, আমি মেরেছি, হুজুর আমি
ভাত চেয়ে পাই নি—

দারোগা ॥ হ্যাঁ—এখন তো অনেক গল্প বানাবে—পা ছাড়ো, লাস দেখতে
দাও— (জোর করে পা ছাড়িয়ে ভেতরে যান)

দুখীরাম ॥ হুজুর ! দারোগাবাবু ! (চিৎকার করতে করতে দারোগার পিছনে
ঘরে ঢোকে)

ছিদাম ॥ (চন্দরার কাছে এসে) এ তুই কি করলি বৌ !

চন্দরা ॥ (ম্লান হেসে) ঠিকই তো করিছি।

ছিদাম ॥ তোর যে ফাঁসী হয়ে যাবে বৌ !

চন্দরা ॥ বৌ গেলে তো বৌ পাবে ফের।

ছিদাম ॥ ঐ একটা কথা—ঐ একটা কথার জন্যে তুই আমার এমনি শাস্তি
দিলি বৌ ! মুখ ফসকে একটা কথা বেইরেছেল—

চন্দরা ॥ মুখ ফসকে তো মনের কথাটাই বেরোয় গো—।

ছিদাম। (আর্তনাদ করে) বৌ তুই বিশ্বেস কর—

চন্দরা ॥ দুঃখু করো নি। আবার যে কোর। আর নোতুন বৌয়ের গলায় এই মাদুলীটা পইয়ে দিও—(মাদুলীটা খুলে ছিদামের হাতে দেয়)

ছিদাম ॥ বৌ তুই আমায় মেরে ফেল। ঐ হাত দুটো দে এই গলাটা—

[ভিতর থেকে দারোগা ও সেপাই বেরিয়ে আসে, পিছনে আর্তনাদ করতে করতে দুখীরাম আসে]

দারোগা ॥ (সেপাইকে) লাস মর্গে না পাঠানো পর্যন্ত তুমি এখানে থাকবে। ছোট্টুলাল লে চলো ইয়ে জানানাকো—

[সেপাই ছোট বৌয়ের পিছনে এসে দাঁড়ায়]

দারোগা ॥ থাক্ হয়েছে, ঐদিকে যাও। (দুখীরামকে) তুমি কে?

দুখী ॥ দুখীরাম রুই।

দারোগা ॥ চেহারা ত দেখছি কাৎলার মত। মরেছে কে?

দুখী ॥ আমার পরিবার।

দারোগা ॥ কি করে মরলো?

দুখী ॥ আমি দা দে মেরে ফেলেছি হুজুর।

দারোগা ॥ তাই নাকি? কেন মারলে?

দুখী ॥ ভাত চেয়েছিনু দেয়নি তাই ঝগড়া করতে করতে রাগের মাথায়—

দারোগা ॥ দা ছিল কোথায়?

দুখী ॥ জন খাটতে নে গেছনু, ছেল আমার কাছে।

ছিদাম ॥ হ্যাঁ, দাদার হাতে দা ছেল, সেইখানা—

দারোগা ॥ দা তো ছিল একখানা, তা দু-ভাই কি এক সঙ্গে মেরেছ?

ছিদাম } না হুজুর, আমি মেরেছি।
দুখারাম }

দারোগা ॥ ও চুপ! ওসব ঢাকাঢাকি চলবে না যাদু, (চন্দরাকে) তোমার নাম কি?

চন্দরা ॥ চন্দরা দাসী।

দারোগা ॥ যে মরে পড়ে আছে ও তোমার কে হয়।

চন্দরা ॥ বড় জা।

ছিদাম ॥ দারোগাবাবু, ওকে ছেড়ে দিন, ও কিছু জানে নে—

দুখীরাম ॥ (চিৎকার করে) সতীলক্ষ্মী মা আমায়—আমায় এ কি শাস্তি দিয়ে গেলি ? দারোগাবাবু, ও জানে নে—কিচ্ছু জানে নে—

সেপাই ॥ এই চোপ—চোপরও—

[একজন সেপাই দুভাইকে আটকায়। ওরা চিৎকার করতে থাকে। অপর সেপাই চন্দরাকে নিয়ে আগলের বাইরে চলে যায়। দারোগা এগিয়ে যান। দূরে গিয়ে চন্দরা শুধু একবার পিছন ফিরে তাকায়। তারপর স্থির পদে সেপাইয়ের অনুসরণ করে। ধীরে যবনিকা নেমে আসে।]

স্তানিস্লাভস্কি

মায়ারহোল্ড
(ক্যারিকেচার)

গর্ডন ক্রেগ

একাঙ্ক নাটক

অমোঘ

কিরণ মৈত্র

চরিত্র

হানিফ : উত্তর প্রদেশের মুসলমান। বয়স ৫০-এর কাছাকাছি। নিষ্ঠুর প্রকৃতির চেহারা। মুখে একটা দাগ তার চেহারাকে আরও বীভৎস করে তুলেছে।

রতন : বাঙ্গালী বেপরোয়া যুবক, বয়স ৩০।৩২। পরনে প্রায় ছেঁড়া প্যাণ্ট, জামা।

পাণ্ডে : মারাঠী যুবক। বয়স ২৪।২৫। সুন্দর, সুমিষ্ট চেহারা। এক রাজনৈতিক দলের কর্মী।

নন্দলাল : বেহারী প্রৌঢ়।

বাহাদুর : নেপালী যুবক। পরনে খাকী প্যাণ্ট। হাতকাটা গেঞ্জি ও। কোমরে ভোজালী।

পরিবেশ

বিভিন্ন প্রদেশের পাঁচটি মানুষ এক অমাবস্যার রাতে এক ভাঙ্গাচোরা ভুতুড়ে বাড়ীতে সমবেত হয়েছে। পট উঠলে দেখা গেল চারদিকে ইঁট বার করা এক ঘরের একটি টেবিলের ওপর একটি হ্যারিকেন জ্বলছে। দুটো ভাঙ্গা চেয়ার ও প্যাকিং বক্স রয়েছে কয়েকটা। হানিফ একটা চেয়ারের ওপর পা তুলে ঘুমোচ্ছে যেন। মেঝের আর এক কোণে বসে পাণ্ডে একটা চিঠির ওপর চোখ বোলাতে চেষ্টা করছে, পারছে না। হানিফের পাশে বসে নন্দলাল টেবিলের ওপর মাথা রেখে আছে। বাহাদুর তার ভোজালীটা বার করে মেঝের ওপর পড়ে থাকা একটা কাঠের টুকরোর ওপর ভোজালীর ধার পরীক্ষা করচে যেন। রতন অস্থিরভাবে পায়চারী করছে। মাঝে মাঝে শেয়ালের ডাক, কুকুরের ঘেউ ঘেউ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। আবছা আলোয় পাঁচটি মানুষকে দেওয়ালের ওপর পড়া ছাওয়ার মাঝে কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগছে। দূরে একটা পেটা ঘড়িতে একটা বাজল—নন্দলাল সোজা হয়ে বসল।

নন্দ ॥ একটা বাজলো না ?

রতন ॥ একটা নয়, বোধ হয় দেড়টা !

পাণ্ডে ॥ আমি যেন দুটো বাজতে শুনলাম—

বাহাদুর ॥ দুটো বেজেছে ? আমার যেন মনে হচ্ছে এখন একটাই বেজেছে !

নন্দ ॥ দাঁড়াও, হানিফকে জিগ্যেস করি কটা বাজল ! ওর কাছে ঘড়ি আছে ! (হানিফের গায়ে ঠেলা দিয়ে) হানিফ ! হানিফ !

[হানিফ তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে বসে]

হানিফ ॥ কি ব্যাপার !

নন্দ ॥ জিজ্ঞেস করছি—কটা বাজে ?

হানিফ ॥ ওঃ, আমি ভাবলাম কি না কি ! কত রাত আর হবে, সাড়ে বারোটা···

নন্দ ॥ দূরে একটা পেটা ঘণ্টায় যেন মনে হলো একটা বাজল···

হানিফ ॥ সাড়ে বারোটা বাজলেও ঐ একটা ঘণ্টাই বাজবে !

নন্দ ॥ আমরা মাত্র আধ ঘণ্টা আগে এখানে এসেছি ! না না, তা হতে পারে না···একটাই বেজেছে—

হানিফ ॥ বেশ তো, একটাই বাজুক না ! এখনও তো তিন ঘণ্টা দেরী।

রতন ॥ নন্দবাবু যখন বলছে তখন দেখই না ঘড়িটা !

হানিফ ॥ আঃ জ্বালালে !···(হানিফ প্যান্টের পকেট থেকে ঘড়িটা বার করে সকলের সামনে তুলে ধরে।) নাও দেখো !

[নন্দ আর রতন তা দেখে।]

রতন ॥ একটাই বেজেছে !···

হানিফ ॥ নাও হলো ত ! এখন চুপচাপ আমাকে দুটো ঘণ্টা ঘুমোতে দাও। একটা সামান্য কাজের জন্যে তো আমি একটা রাত ঘুম কামাই করতে পারি না !

[হানিফ টেবিলের ওপর দু-পা তুলে আবার ঘুমোতে চেষ্টা করল।]

নন্দ ॥ হানিফটা এসে অবধি কেমন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোচ্ছে !

বাহাদুর ॥ আমি তো বসে থাকতেই পারছি না। ঘুমোনো তো দূরের কথা !

রতন ॥ আমার শরীরের সমস্ত রক্ত টগবগ করে ফুটছে—

বাহাদুর ॥ শয়তান ঐ সন্দীপ সেন—

নন্দ ॥ এখন একটা বাজল—

রতন ॥ একটা বেজে পাঁচ দশ হয়ে গেছে—

নন্দ ॥ ঠিক এই সময়েই আমার ছোট ছেলেটার মানে আমার সাত নম্বর ছেলেটার রোজ ঘুম ভেঙে যায়। উঠেই কাঁদতে থাকে। ছ' সাত বছরের ছেলে তবু কাঁদে। ক্ষিদে পায় বলেই কাঁদে। ওর মা বেধড়ক দু-চার ঘা দেয়। আবার ঘুমিয়ে পড়ে—আজও ছেলেটা নিশ্চয়ই উঠেছে—কি বলো রতন ?

রতন ॥ উঠুক। এখন ওদের কথা ভাবার কোন দরকার নেই।

নন্দ ॥ ঠিক বলেছ। এখন ওদের কথা ভাবাটা ঠিক নয়। মন দুর্বল হয়ে পড়বে, অবশ্য ওদের কথা ভেবেই আজ আমি এখানে। বেহারের সেই গণ্ডগ্রাম থেকে আমি এখানে···কার চিঠি পড়ছো, পাণ্ডে ?

পাণ্ডে ॥ (তাড়াতাড়ি চিঠিটা নামিয়ে রেখে) এই একজনের—

বাহাদুর ॥ একজনটি কে ?

পাণ্ডে ॥ আছে একজন !

নন্দ ॥ বলো না শুনি ?

পাণ্ডে ॥ শুনলে হাসবে না তো !

রতন ॥ না না, হাসবো না, বলোই না !

নন্দ ॥ আর যদি হাসি পায় তাহলে হাসবো—এমন সময় কটা মানুষ হাসতে পারে বলো শুনি ?

পাণ্ডে ॥ বোয়ের।

রতন ॥ ধ্যেৎ।

পাণ্ডে ॥ সত্যি !

বাহাদুর ॥ তুমি বিয়ে করেছ ?

পাণ্ডে ॥ কেন, তুমি করো নি !

বাহাদুর ॥ না, বিয়ে করতে চাইলুম না বলেই তো আমার মা—কতদিন বিয়ে করেছ—

পাণ্ডে ॥ এই তো সবে—বাবা জোর করে বিয়ে দিয়ে দিল ! আমার পার্টি অবশ্য জানে না। জানলে এ' কাজের ভার আমায় দিত না।

রতন ॥ কচি বৌকে ফেলে—

পাণ্ডে ॥ বোয়ের চাইতে পার্টি অনেক বড়, রতন।

রতন ॥ তা হবে! রাজনীতি-টিতি বুঝি না···কারখানায় চাকরী করতুম, একটা হেজিবেজি মেয়েকে ভালোও বাসতুম।···বিয়ে করব মনে করছি এমন সময় চাকরীটা গেল···মিথ্যে চুরির দায়ে আমাদের কারখানার ম্যানেজিং ডাইরেক্টার ঐ সন্দীপ সেন—তালে ছিলুম যদি ওকে কখনও হাতের কাছে পাই, পেটে ছুরি বসিয়ে আমার চাকরী খাবার মজাটা টের পাইয়ে দি! থাকগে, পাণ্ডে, এখন ঐ সব বোয়ের-টোয়ের কথা ভাবাটা ঠিক না। যে কাজে এসেছি সেই কাজটা হাসিল করতে পারলেই—বাহাদুর কিছু বলবে না?

বাহাদুর ॥ কার কথাই বা বলবো? আমার মা ছাড়া তো—

রতন ॥ থাক থাক, আর মায়ের কথা তুলতে হবে না। তোমার মায়ের কথা শুনতে গেলে আবার নিজের মায়ের কথা মনে পড়বে, থাক···আমার মা আছে, তবে অন্ধ—

পাণ্ডে ॥ দেড়টা বাজলো বোধ হয়! সন্দীপ সেন-এর প্লেনটা ঠিক কটায় ল্যাণ্ড করবে দমদমে?

নন্দ ॥ তিনটে বেজে চুয়াল্লয়।

পাণ্ডে ॥ আর মাত্র তিন ঘণ্টা—আড়াই ঘণ্টা দেরী।

রতন ॥ তিন ঘণ্টা নয়, বলো সাড়ে তিন ঘণ্টা।

পাণ্ডে ॥ কেন? আমরা এখান থেকে তো বেরোব চারটেয়—

রতন। কিন্তু সন্দীপ সেন মরবে আমাদের হাতে রাত সাড়ে চারটেয়।

পাণ্ডে ॥ হাঁ, তা বটে! তাহলে এখনও সাড়ে তিন ঘণ্টাই দেরী!

নন্দ ॥ তিন ঘণ্টার কিছু বেশী। এখনও দেড়টা বাজে নি।

বাহাদুর ॥ দেড়টা বাজল বলে—

পাণ্ডে ॥ হানিফকে জিগ্যেস করো না কটা বাজে।

নন্দ ॥ থাক, রেগে যাবে। বড় রগচটা। ঘণ্টা তো বাজবে!

[দেড়টা বাজার একটা ঘণ্টা পড়ল—ঢং।]

ঐ দেড়টা বাজল।

রতন ॥ তারপর দুটো বাজবে...আড়াইটে...তিনটে...সাড়ে তিনটে, চারটে···

নন্দ ॥ আমরা রওনা হবো রাতের অন্ধকারে।

পাণ্ডে ॥ রাস্তার ধারে ঘাপটি মেরে আমরা পাঁচজন অশরীরী প্রেতাত্মার মত দাঁড়িয়ে থাকব।

নন্দ ॥ একটা গাছ ফেলা থাকবে রাস্তার ওপরে।

পাণ্ডে ॥ গাড়ীটা নিশ্চয়ই থামবে। অমনি আমরা পাঁচজন লাফিয়ে পড়বো গাড়ীটার ওপরে···

রতন ॥ হানিফ মিঞা প্রথমে গুলিটা চালাবে।

নন্দ। তারপর আমি, আমি ওর বুকে···

পাণ্ডে ॥ তারপর আমি পেটে···

বাহাদুর ॥ তারপর আমি ভোজালীটা চালিয়ে তার পেটটা দু-আধখানা···

রতন ॥ তার পরদিন কাগজে বেরোবে বিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীসন্দীপ সেনের আততায়ীর হাতে শোচনীয় মৃত্যু। তারপর কত কি লিখবে। আর এই দিনটার জন্যে আমি এক বছর হন্যে কুকুরের মত ঘুরে বেড়িয়েছি।

পাণ্ডে ॥ আর আমার পার্টি আমার ওপর এই কাজের ভার দিয়েছে তিনমাস হলো। তিনমাস আমিও ঘুমোতে পারি নি।

নন্দ ॥ আর আমার হয়েছে একমাস···

বাহার ॥ আর আমার মা মারা গিয়েছে পাঁচ মাস হলো। এই পাঁচমাস আমি ছায়ার মত সন্দীপ সেনের পেছনে ঘুরেছি···তারপর তোমার মত এ সুযোগটা আমি পেয়ে গেলাম···

রতন ॥ কি মজা দেখ ত! তুমি নেপালের, আমি এ দেশের, নন্দজী বেহারের, পাণ্ডে মহারাষ্ট্রের, হানিফ ইউ, পির। কতদূরের মানুষ আমরা, অথচ কেমন করে সবাই এক জায়গায় জড় হলাম। সত্যি ভাবলে আশ্চর্য লাগে আজ পর্যন্ত বোধহয় এ রকম খুন পৃথিবীতে একটাও হয় নি।

বাহাদুর ॥ কারণ পৃথিবীতে সন্দীপ সেনের মত বদমাইস লোক একটাও নেই···

রতন ॥ হাঃ হাঃ, বেশ বলেছ, হাঃ হাঃ—

নন্দ ॥ অমন করে হেসো না রতন, কেউ শুনতে পাবে—

রতন ॥ কেউ শুনতে পাবে না। মাঠের মাঝে পোড়ো বাড়ী। এক মাইলের মধ্যে কোথাও বসতি নেই। ভয় নেই, কেউ—

[দূরে একটা গাড়ী চলার আওয়াজ শোনা যায়। আওয়াজটা ক্রমশঃ বাড়ীর দিকে আগাতে থাকে।]

নন্দ ॥ (নীচু গলায়) হানিফ মিঞা—

হানিফ ॥ আঃ, বললাম না যে—

নন্দ ॥ একটা গাড়ীর আওয়াজ···

হানিফ ॥ এ্যাঃ—চুপ, সবাই বসে পড়ো।

[আলোটা নিবিয়ে সবাই নিঃস্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। একটা আলো ঘরের মধ্যে পড়ে ধীরে ধীরে সরে যায়।]

রতন ॥ এত রাতে এধার দিয়ে কিসের গাড়ী গেল ?

হানিফ ॥ লরিটরি হবে বোধ হয় !

রতন ॥ লরি যাবার রাস্তা তো নেই।

হানিফ ॥ তাহলে কোন জীপ হবে।

রতন ॥ তা হতে পারে।

নন্দ ॥ হানিফ, তুমি কখনো খুন করেছ ?

হানিফ ॥ আমি ! (মৃদু হাসল) কত যে খুন করেছি তার কি ইয়ত্তা আছে। শুনবে নাকি তোমরা ? শুনলে ভয়ে তোমাদের কলজে শুকিয়ে যাবে। সন্দীপ সেনকে মারতে তোমাদের পিস্তল উঠবে না।

পাণ্ডে ॥ আর কারুর না উঠুক, আমার উঠবে...

রতন ॥ আমারও।

নন্দ ॥ আমারও।

বাহাদুর ॥ আমার আর দেরী সইছে না।

হানিফ ॥ (আপন মনে) প্রথম প্রথম জানো, দুটো টাকার জন্যে খুন করতাম, এখন দু-বোতল মদের জন্যেও খুন করতে পারি। মানুষ খুন করতে পারি। মানুষ খুন করার মধ্যে বেশ একটা আনন্দ আছে। আমাদের বংশটাই খুনে কিনা ! আর মানুষ খুন করে অনেক সময় তার হৃৎপিণ্ডটা টেনে বার করে আমি চিবিয়ে চিবিয়ে খাই...বেশ লাগে...নন্দর বাড়ীতে কে আছে !

নন্দ ॥ আমার বাড়ী ! বাড়ীতে বাঘিনীর মত একটা বৌ আছে। আর তার বিয়োনো সাতটা ছেলে আছে। সবচেয়ে ছোটটার বয়েস পাঁচ বছর ! ক' বিঘে জমির চাষের আয়। বৌটা রোজ গাল দেয়। বলে ছেলের জন্ম দিতে পারো আর খাওয়াতে পারো না ! বলে, তুই ভীরু কাপুরুষ, লোকে কত কি রোজগার করে, তুই করতে পারিস না ? তাই এবারে আমি দেখিয়ে দেব যে আমি ভীরুও নই, কাপুরুষও নই...

হানিফ ॥ (ঘড়ি বার করে দেখে) দুটো—

নন্দ ॥ কটা ?

হানিফ ॥ দুটো।

রতন ॥ কৈ, এখনও তো ঘণ্টা বাজল না।

হানিফ ॥ যে বেটা বাজাবে, ঘুমিয়ে পড়েছে বোধ হয়। আমাদের মত মানুষ খুন করার জন্যে তার তো জেগে থাকবার দরকার নেই।

পাণ্ডে ॥ দুটো বাজল। আর মাত্র দু' ঘণ্টা।

রতন ॥ দু' ঘণ্টা নয়, আড়াই ঘণ্টা।

পাণ্ডে ॥ জানো, একদিন রাত দুটোতেই আমি এই কাজের ভার পেয়েছিলাম। পার্টি মিটিং-এ নাকি তুমুল তর্ক হয়েছিল আমাকে এ' কাজের ভার দেওয়া নিয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত—

[বাইরে দুটো বাজার শব্দ শোনা গেল।]

রতন ॥ ঐ তো বাজছে। লোকটা তাহলে ঘুমোয় নি।

পাণ্ডে ॥ লোকটা একবার করে ঘণ্টা বাজাচ্ছে আর সন্দীপ সেনের জীবনের পরমায়ু থেকে আধ ঘণ্টা করে খসে পড়ছে—!

নন্দ ॥ পাণ্ডে বেশ কবিতা করে কথা বলতে পারে।

হানিফ ॥ পাটনার লোক তো, খুব লেখা পড়া করেছে।

পাণ্ডে ॥ আমি এম, এ-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট! আমার বৌ এবার বি-টি দেবে—

রতন ॥ আঃ, বাড়ীর কথা তুলো না তো! আমার অন্ধ মা, আর চিঠিতে ভোগা ভাইটার কথা মনে পড়ে যায়।

নন্দ ॥ জানো, কাজ হাসিল করতে পারলে যে টাকাটা পাব তাই নিয়ে সবাইকে নিয়ে চলে যাব…পাটনায়…টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করব… তারপর একদিন ঐ সন্দীপ সেনের মত আমি একজন গণ্যমান্য লোক হয়ে ঘুরে বেড়াব ; কেউ তখন একবার সন্দেহও করবে না যে—

হানিফ ॥ তোমাদের সবায়ের কেউ না কেউ আছে। আমার কেউ নেই… না না, আছে…আমার অনেকগুলো দোস্ত আছে…ঐ শালা টিকটিকি আর লাল পাগড়ীর দল আমাকে ধরবার জন্যে দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে নন্দজী ; সন্দীপ সেনকে খুন না করে যদি আমাকে ধরিয়ে দিতে পারতে তাহলে পাঁচ হাজারের বদলে দশ হাজার পেতে। দ্বিগুন লাভ…

নন্দ॥ ছিঃ, কি যে বলো…তুমি হলে আমাদের লীডার…

হানিফ॥ তাই নাকি হা হা…

[একটা প্যাকিং বাক্সের তলা থেকে সে একটা মদের বোতল বার করে।]

হানিফ॥ রতনবাবু, মদ খাবে নাকি একটু!

রতন॥ মদ আমি খাই না।

হানিফ॥ নন্দ!

নন্দ॥ আমি বেহারী ব্রাহ্মণের ছেলে। মদ আমাদের খেতে নেই।

হানিফ॥ বাহাদুর?

বাহাদুর॥ মদ মানুষে খায়!

হানিফ॥ যারা মানুষ খুন করতে আসে, তারা তখনও মানুষ থাকে। তাহলে—পাণ্ডে ভাইয়া—

পাণ্ডে॥ মদ যারা খায় তাদের আমি ঘৃণা করি।

হানিফ॥ তাই নাকি? কিন্তু পাণ্ডে ভাইয়া, পার্টি করা আর মদ খাওয়া এক জিনিস, দুটোই নেশা…

পাণ্ডে॥ না, একটা দেশের কাজ—

হানিফ॥ মদ খাওয়াটাই দেশের কাজ। মদ বিক্রী করে সরকার কত টাকা পায় জানো? সেই টাকাগুলোই তো দেশের কাজে লাগে…পার্টি করার চাইতে মদ খাওয়া অনেক বড় দেশের কাজ!

পাণ্ডে॥ তোমার মত লোক এ ছাড়া আর কি ভাবতে পারে!

হানিফ॥ মানুষ হিসেবে আমরা খুব ছোট, না?

পাণ্ডে॥ সে কথা বলছি না, তবে এ পৃথিবীতে যারা ছোট…যারা মানুষ হয়েও মানুষের মত বাঁচতে পারছে না…তাদের যারা বঞ্চিত করেছে—ঐ সন্দীপ সেনের মত ক্যাপিট্যালিষ্ট…

বাহাদুর॥ না না, সন্দীপ সেন ক্যাপিট্যালিষ্ট বলে আমি তাকে মারতে চাই না, তার অনেক টাকা থাকুক সে কোটি কোটি টাকার মালিক হোক তাতে আমার কোন আপত্তি নেই, আমি তাকে মারতে চাই—সে বিশ্বাসঘাতক বলে, সে চরিত্রহীন বলে। সে আমার মাকে—মাকে খুন করেছে বলে—

পাণ্ডে॥ তোমার মাকে খুন করেছে?

বাহাদুর ॥ হাঁ, আমার মা, আমার মা—গলায় দড়ি দিল কেন? সে ত ঐ সন্দীপ সেনের জন্যে—আমি তাই যতক্ষণ না এই ভোজালীটা তার পেটের মধ্যে—

রতন ॥ আঃ, তোমাকে আমি বারণ করছি না তুমি মা'র কথা বলবে না!—তোমার মার কথা শুনলেই আমার অন্ধ মায়ের কথা মনে পড়ে যায়…

বাহাদুর ॥ কিন্তু মার কথা ভুলতে পারি না বলেই তো আমি আজ এখানে—

[বাইরে ঢং করে একবার বাজল।]

নন্দ ॥ কটা বাজল?

হানিফ ॥ আড়াইটে…

পাণ্ডে ॥ আর মাত্র দেড় ঘণ্টা!

রতন ॥ দু-ঘণ্টা বলো…

নন্দ ॥ আমার ছোট ছেলেটার ওপরের মেয়েটা রোজ এই সময় একবার ওঠে …কাঁদে…খাবে বলে…ওর মা—গলাটা টিপে ধরে…মেয়েটা কাঁদতে পারে না। কাঁদতে না পেরে মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়ে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত শুয়োরের মত ছেলেমেয়েগুলোর কান্না আর সইতে পারা যায় না। টাকা পেলে ছেলেপুলেকে প্রাণ ভরে আমি খাওয়াব—সন্দীপ সেন এখন প্লেনে বোধ হয় ঘুমোচ্ছে…

হানিফ ॥ না—সন্দীপ সেনও আমাদের মত আজকে রাতে ঘুমোতে পারবে না। মার অসুখের তার পেয়েছে কিনা—মিছে তার অবশ্য—টেলিগ্রাম পেয়েই তো ছুটে আসছে—এখান থেকে ক' মাইল দূরে তার মা থাকে …তোমরা জানো না?

নন্দ ॥ জানি।

হানিফ ॥ শালা সন্দীপ সেন নাকি তার মাকে খুব ভালবাসে।

বাহাদুর ॥ (চমকে) মা, কার মা!

হানিফ ॥ কি শুনলে তাহলে? সন্দীপ সেনের মা—

বাহাদুর ॥ সন্দীপ সেনের মা! আমাকে আমাকে…খুব ভালবাসত!

হানিফ ॥ ভালবাসত কিরে! এখন বাসে না?

বাহাদুর ॥ বলেছি তো, আমার মা নেই। আমার মা গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে—ঐ বদমাইস সন্দীপ সেন তার জন্তে দায়ী!

পাণ্ডে ॥ আমার স্ত্রী ক'দিনের মধ্যে আমাকে ভয়ঙ্কর ভালোবেসে ফেলেছিল।...

নন্দ ॥ আমার বড়ো মেয়েটা আমাকে ছাড়া একদণ্ড থাকতে পারে না। বিয়ে হয়েছিল। বিধবা হয়ে আমার কাছে ফিরে এসেছে—

হানিফ ॥ আর আমাকে কে সব চে' ভালবাসে জানো?

নন্দ ॥ —কে?

হানিফ ॥ গভর্নমেণ্ট। পেলেই আমাকে ফাঁসীতে লটকাবে...আমার বাবাকে লটকেছে...তার বাবাকে লটকেছে...আমাকেও লটকাবে (মদ খেলো) কেউ খাবে নাকি?...খেলে পারতে। মদ খেলে মনের জোর বাড়ে...

[বাইরে আবার সেই গাড়ীর আওয়াজ পাওয়া গেল।]

রতন ॥ আবার গাড়ী আসছে।

নন্দ ॥ এদিকে অত ঘন ঘন গাড়ী আসছে কেন?

হানিফ ॥ সবাই চুপ করো...

[আলোটা কমিয়ে সবাই নিঃস্তব্ধ হলো। গাড়ীর আওয়াজ কাছে আসতে লাগল, আলোটা এসে পড়ল ঘরে। ধীরে ধীরে তা সরে গেল। হানিফ জানলার কাছে মুখ বাড়িয়ে দেখল। তার মুখে চোখে উৎকণ্ঠা]

হানিফ ॥ পুলিশের গাড়ী!

সকলে ॥ (কিছুটা ভয়ে যেন) কার!

হানিফ ॥ পুলিশের গাড়ী!

পাণ্ডে ॥ এখানে এখন পুলিশের গাড়ী কেন?

বাহাদুর ॥ টের পেয়েছে তাহলে?

হানিফ ॥ না, না, টের পায় নি। সব ভয় পেলে নাকি?

রতন ও অন্যান্য ॥ না, না, আমরা কেউ ভয় পাই নি। একটু মদ খেলে হয়!

নিফ ॥ বেশতো খাও, তবে সামান্য। নয়তো বেহেড হয়ে পড়বে।

[রতন একটু মদ খেলো]

॥ আমিও একটু খাই—

নিফ ॥ বেশ তো খাও!

[নন্দ খেল।]

বাহাদুর ॥ আমাকেও একটু—

[বাহাদুর অল্প খেল।]

হানিফ ॥ পাণ্ডে, খাবে না ?

পাণ্ডে ॥ না। পার্টির বারণ।—

হানিফ ॥ এখানে খেলে তোমার পার্টির কেউ জানতে পারবে না...

পাণ্ডে ॥ তাহলেও না—

হানিফ ॥ ভালো ! কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখো, তোমার পার্টির যারা মাথা তারা অনেকেই মদ খায়।

রতন ॥ আমরা সবাই যখন খেয়েছি তখন তুমিও একটু খাও।

পাণ্ডে ॥ খাব !

নন্দ ॥ হাঁ খাও। শরীরটা বেশ গরম লাগবে। আমার লাগছে !

বাহাদুর ॥ মদ বেশ ভালো জিনিস, সন্দীপ সেনকে খুন করার পর একদিন খুব মদ খাব···বেশ লাগছে।

পাণ্ডে ॥ তাহলে দাও...

হানিফ ॥ নাও।

[হানিফ মদ দিল। পাণ্ডে খেয়ে মুখ বিকৃত করল।]

পাণ্ডে ॥ আঃ, বুকটা জ্বালা করছে—

হানিফ ॥ ঐ জ্বালাটার জন্যেই মদ খাওয়া। মদ না খেলে আমি মানুষ খুন করতে পারি না।...এক বোতল মদে একজন...ধরো যদি চার বোতল মদ পাই তাহলে তোমাদের চারজনকে আমি খুন করতে পারি...

বাহাদুর ॥ মদের নেশায় দেখছি তুমিই ভুল বকছো !

হানিফ ॥ কেন ?

বাহাদুর ॥ নইলে সন্দীপ সেনকে খুন করতে এসে তুমি আমাদের খুন করবে। বলো...

পাণ্ডে ॥ আমার আর একটু মদ খেতে ইচ্ছে করছে—

হানিফ ॥ তাই নাকি ?

পাণ্ডে ॥ পার্টির অবশ্য মদ খাওয়া বারণ। আমার বৌ দামিনী, যারা মদ খায় তাদের ঘৃণা করে, তবু আমার মদ খেতে ইচ্ছে করছে—দেবে ?

হানিফ ॥ নিশ্চয়ই। আমি মদ খেতে ভালবাসি, মদ খাওয়াতেও ভালবাসি ...মদ খেয়ে মদ খাইয়ে অনেক কাজ হাসিল করা যায়...

[হানিফ কেমন যেন অস্বাভাবিকভাবে হেসে ওঠে। সকলকেই অল্প বিস্তর নেশাগ্রস্থ বলে মনে হতে লাগল। বাইরে ঢং ঢং ঢং করে তিনটে বাজল।]

রতন ॥ তিনটে বাজল!...

বাহাদুর ॥ তিনটে! রাত তিনটের সময়ই আমার মা গলায় দড়ি দিয়েছিল ...অনেক দিন সহ্য করতে করতে মা বোধহয় আর পারলো না...একটা চিঠিতে সব লিখে রেখে গেল...

রতন ॥ কি লিখে রেখেছিল!

বাহাদুর ॥ লিখে রেখে গিয়েছিল, স্ত্রীর মর্যাদা না দিলেও সন্দীপ সেনই আমার বাবা—

নন্দ ॥ সন্দীপ সেন তোর বাপ!...

বাহাদুর ॥ হাঁ, মা তাই লিখে গেছে। বাবার খোঁজে তারপর থেকে পাগলের মত ঘুরে বেড়িয়েছি...ছেলে বলে পরিচয় দেবার জন্যে নয়। তাকে চিরজীবনের মত সরিয়ে দেব বলে...

রতন ॥ তিনটে বাজল!

পাণ্ডে ॥ আজকের রাতটা বড্ড অন্ধকার মনে হচ্ছে।

নন্দ ॥ আকাশে মেঘ রয়েছে বৃষ্টি হতে পারে।...

পাণ্ডে ॥ তার ওপর আজ অমাবস্যা...

[বাইরে থেকে কয়েকটা শেয়ালের ডাক শোনা গেল।]

রতন ॥ বৃষ্টি হলে এখানে আমাদের নিয়ে যেতে গাড়ীটা তো নাও আসতে পারে—

হানিফ ॥ তা না পারে। তবে বৃষ্টি হবে না।...

নন্দ ॥ ধরো বৃষ্টি নামল। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি।...তাহলে...

হানিফ ॥ তাহলে সন্দীপ সেনকে খুন করা হবে না...

নন্দ ॥ না না, তা হতে পারে না...সন্দীপ সেনকে আজ খুন করা চাই-ই...

রতন ॥ হাঁ চাই। খুন করতে পারলেই মোটা মাইনের চাকরী...হাজার টাকা মাইনের চাকরী পাব—স্যুট পরে, মুখে পাইপ লাগিয়ে গাড়ী চড়ে আমি ঘুরে বেড়াব—না না...সন্দীপ সেনকে আজ মারতেই হবে...

নন্দ ॥ আমাকে বলেছে সন্দীপ সেনের মরবার ছ ঘণ্টার মধ্যেই আমার বোয়ের হাতে পৌঁছে রেখে চার হাজার টাকা—

রতন ॥ তখন যে বললে পাঁচ হাজার—

নন্দ ॥ এক হাজার টাকা তো আগাম পেয়েই গেছি। একশ টাকার দশখানা নোট···আর চার হাজার······

পাণ্ডে ॥ ঠিক সন্দীপ সেনকে আজই আমাদের মারতে হবে···যদি না পারি তাহলে পার্টি হয়তো আমার বদলে অন্য কাউকে—না না···হানিফ মিঞা যেমন করে হোক গাড়ীটা আমাদের আনতেই হবে···

হানিফ ॥ আঃ, কেন আজেবাজে কথা ভাবছো বল ত? গাড়ী আসবে না কে বলেছে?

রতন ॥ আমাদের রিভলভারগুলো দেবে না?

হানিফ ॥ নিশ্চয়ই দেব, তার আগে আর একটু মদ খাওয়া যাক কেমন?

[হানিক আর একটা বোতল বার করে—সকলে মিলে খায়।]

সব ঠিক ঠিক মনে আছে তো?

রতন ॥ আর একবার বলো শুনে নি। হানিফ, সন্দীপ সেনের গাড়ীটা যেই পড়ে থাকা গাছের জন্যে স্পীড কমিয়ে দেবে আমরা দুদিক থেকে গাড়ীর পা'দানিতে উঠে দাঁড়াব। আমি মাথা লক্ষ্য করে প্রথম গুলি চালাব···

নন্দ ॥ তারপর আমি চালাব ওর বুকে।

পাণ্ডে ॥ আমি ওর পেটে!

বাহাদুর ॥ আর আমি এই ভোজালীটা দিয়ে তার পেটটা—

হানিফ ॥ কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গাড়ীটায় করে আমরা···

রতন ॥ ড্রাইভার তো আছে, যদি সে বাধা দিতে আসে?

হানিফ ॥ আসবে না। বরং পালাবে।

রতন ॥ তবু যদি আসে—

হানিফ ॥ তুমি গুলি চালাবে—

রতন ॥ (জড়ানো কণ্ঠে) ড্রাইভারটা ত তাহলে মরবে...একে একে দুই···

নন্দ ॥ সন্দীপ সেনের পাশে যদি কোন লোক বসে থাকে। সে যদি—

হানিফ ॥ বাধা দিতে আসে···তাহলে তাকেও গুলি চালাবে···

নন্দ ॥ আমি। না না···আমি পারব না।

হানিফ ॥ আমি না বললেও পারবে···তখন দেখবে আপনা থেকে গুলি বেরিয়ে আসবে···

রতন ॥ তাহলে একে একে দুই···দু'এ একে তিন।

পাণ্ডে ॥ সেই সময় হঠাৎ কেউ যদি সেই রাস্তা দিয়ে যেতে থাকে তাহলে—

হানিফ ॥ তাহলে সে প্রাণে বাঁচবে পালিয়ে—

পাণ্ডে ॥ ধরো যদি বাধা দিতে আসে—

হানিফ ॥ তাহলে আর কি ! তোমার গুলিতেই তাকে সেখানে লুটিয়ে পড়তে হবে—

পাণ্ডে ॥ আমি মারব কেন ? আমার পার্টি শুধু সন্দীপ সেনকেই গুলি করতে বলেছে—

হানিফ ॥ তাহলে ধরা পড়তে চাও ?

পাণ্ডে ॥ না, না, ধরা পড়তে চাই না। অন্তত: একবার দামিনীকে—

রতন ॥ তাহলে একে একে দুই …দুই-এ একে তিন…তিন-এ একে চার—

নন্দ ॥ গোলমাল শুনে চারপাশের লোক যদি ছুটে আসে…

হানিফ ॥ তারা আসবার আগেই আমাদের নিয়ে গাড়ী উধাও হবে—

বাহাদুর ॥ যদি রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাড়ী থামাতে চেষ্টা করে—

হানিফ ॥ তাহলে আমাদের সবাইকে গুলি চালাতে হবে…

নন্দ ॥ উঃ, একটা খুন থেকে এতগুলো খুন…

হানিফ ॥ হাঁ তাই হয়, এক খুন থেকে আর এক খুন, খুনের এই নিয়ম…

রতন ॥ আচ্ছা হানিফ মিঞা…ধরো সন্দীপ সেনকে খুন করলাম তারপর যদি আমাকে চাকরী না দেয়। ধরো যদি আমার চাকরীটা ওরা cancel করে দেয়—তাহলে আমি কি করব ?

হানিফ ॥ কি আবার করবে ? রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করবে—

রতন ॥ না না, হতে পারে না—এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা কখনো—

নন্দ ॥ আমার বেলাতেও তো তাই হতে পারে…

হানিফ ॥ কি !

নন্দ ॥ আমি খুন করলাম, ওদিকে বৌ ত টাকা পেল না।

হানিফ ॥ তাতো পারেই।…যারা মানুষ খুন করাতে পারে, তারা আর কথার খেলাপ করতে পারে না ! খুব পারে। এই যে পাণ্ডে, ঘরে কচি বৌ ফেলে মানুষ খুন করতে এসেছে—পার্টি হয়তো কোনদিন তাকেই বিশ্বাসঘাতক বলে তাড়িয়ে দিতে পারে।

পাণ্ডে ॥ না, না, আমার পার্টি তা কক্ষণো করবে না। বরং আমাকে আরও বড় কাজের ভার দেবে—

হানিফ ॥ দিলেই ভালো। তবে কি জানো—থাক, ওসব কথা ভাবার এখন কোন মানে হয় না—

রতন ॥ ঠিক বলেছ, এ সব বাজে কথা ভাবার কোন মানে হয় না। তার চাইতে বরঞ্চ আর একটু মদ—

রতন ॥ (আপন মনে সুরে) মদের চেয়ে মিঠে মাতাল হাওয়া লো, মনকে রাখা বড় দায় লো···

নন্দ ॥ (নেশাসক্তভাবে) রতন গাইছে, কি যেন গানটা···

রতন ॥ (আবার গায়) মদের চেয়ে মিঠে মাতাল হওয়া লো···মনকে রাখা বড় দায় লো···

নন্দ ॥ হি···হি···রতন বেশ গায়···মদের চেয়ে মিঠে মাতাল হাওয়া লো··· হি, হি···রতন গাইয়ে হতে পারলে নাম করতো—হি, হি···

বাহাদুর ॥ [নেপালী ভাষায় বাহাদুরও একটা গান ধরে]

নন্দ ॥ হি···হি···বাহাদুরটাও দেখছি একটা গাইয়ে হি···হি···

পাণ্ডে ॥ আমরা সবাই কিন্তু মাতাল হয়ে পড়ছি। আমাদের মাতাল করা হচ্ছে কেন? না না—আর কারুর মদ খাওয়া চলবে না···কৈ দাও, মদের বোতলগুলো দাও, আমি বাইরে ফেলে আসি।

হানিফ ॥ শালা পাণ্ডেটারই দেখছি নেশা ধরেছে—

[বাইরে ঢং করে সাড়ে তিনটে বাজল।]

পাণ্ডে ॥ সাড়ে তিনটে বাজল।···

[রতন লাফিয়ে ওঠে যেন।]

রতন ॥ সাড়ে তিনটে বাজল...

বাহাদুর ॥ আর মাত্র আধ ঘণ্টা দেরী...

রতন ॥ হাঁ, আধ ঘণ্টা পরেই গাড়ী আসবে আমাদের নিয়ে যেতে...তার আধ ঘণ্টা পরেই এক দুই তিন...চার...পাঁচ···কৈ আমাদের রিভলভার—

হানিফ ॥ পাবে, ঠিক সময়েই পাবে...এখনও দেরী আছে!

নন্দ ॥ হাঁ দেরী আছে। আমাদের এখান থেকে যেতে এখনও ত্রিশ মিনিট...

রতন ॥ (আপন মনে) এক···দুই···তিন···

[বিড়বিড় করে একের পর এক সংখ্যা গুনে যায়।]

নন্দ ॥ গাড়ীটা যদি না আসে তাহলে বেশ হয়।

বাহাদুর ॥ (গর্জে উঠে) কি বললে ?

নন্দ ॥ এঁ্যাঃ—না, বলছি গড়ীটা এসে পড়লে ভালো হয় !

বাহাদুর ॥ তাই বলো !

রতন ॥ বাহাদুর, তুমি ঠিক জানো যে এই সন্দীপ সেনই তোমার বাবা...

বাহাদুর ॥ হাঁ জানি। এই সন্দীপ সেনই আমার বাবা !

রতন ॥ না, বলছি—দেশে তো আরও সন্দীপ সেন আছে—

বাহাদুর ॥ থাকুক, আজে বাজে কথা বলো না।

রতন ॥ না, আজে বাজে কথা বলা ঠিক হচ্ছে না। মন দুর্বল হয়ে পড়ে। মন দুর্বল হয়ে পড়লে মানুষ খুন করা যায় না। কি বলো হানিফ ! রিভলভারটা পেলে একটু নাড়াচাড়া করা যেত...

নন্দ ॥ তা যেত। দাও না হানিফ রিভলভারটা, একটু নেড়েচেড়ে দেখি...

হানিফ ॥ পাগল নাকি ? রিভলভারটা এখন দি, ঝোঁকের বশে আমাকেই গুলি করে বসো আর কি ? হা হা...

[আবার সেই গাড়ীর আওয়াজ পাওয়া যায়। সবাই তটস্থ হয়ে ওঠে।]

রতন ॥ আবার সেই গাড়ীটা আসছে ?

নন্দ ॥ পুলিশের গাড়ী !

পাণ্ডে ॥ গড়ীটা ঘুরে ফিরে আসছে কেন ?

বাহাদুর ॥ পুলিশেরই তো গাড়ী !

[সবাই যেন ভয় পায়]

হানিফ ॥ যার গাড়ীই হোক, ভয় পাবার কিছু নেই...সবাই চুপ করে থাকো।

[গাড়ীটা কাছে আসতে থাকে। আলোটা ঘরে পড়ে আবার সরে যায়। গাড়ীর শব্দ মিলিয়ে যায়। সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্লে।]

হানিফ ॥ ভয় নেই, গাড়ী চলে গেছে।

রতন ॥ কেমন যেন ভয় করছিল। বুকের মধ্যে কাঁপছিল।

হানিফ ॥ দূর, অত ভয় পেলে মানুষ খুন করা চলে না। আর একটু খাবে ?

রতন ॥ দাও ! (রতন মদ খায়।)

নন্দ ॥ কটা বাজে !

হানিফ ॥ (ঘড়ি দেখে।) চারটে বাজতে পনের...

[সবাই কথাটার যেন প্রতিধ্বনি করে।]

বাহাদুর ॥ পনের মিনিট বাদেই আমাদের গাড়ী আসবে—

রতন ॥ ওঃ, বাপকে খুন করার জন্যে ছেলের কি আগ্রহ। বাপকো বেটা...

হানিফ ॥ হাঁ, ঠিক বলেছ, তার চাইতে বরঞ্চ আর একটু মদ খাওয়া যাক।

[হানিফ সবাইকে মদ দিল। পাণ্ডে মদ খেতে গিয়েও খেল না]

পাণ্ডে ॥ আমাদের তুমি এত মদ খাওয়াচ্ছ কেন?

হানিফ ॥ এ্যাঃ, মানে তোমরা খেতে চাচ্ছ তাই...বেশ, আর মদ তোমাদের দেব না...

রতন ॥ না না দাও, আমাকে আর একটু দাও, আমার খুব ভালো লাগছে—

নন্দ ॥ আমারও খুব ভালো লাগছে। বারবার ছেলেপুলেদের মুখগুলো ভাসছিল...এখন আর একদম আসছে না—সব ঝাপসা হয়ে গেছে।

পাণ্ডে ॥ কিন্তু আমাদের এত মদ খাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না। আমাদের এত খাওয়ানো হচ্ছে! এর মানে কি?...না...আমি আর খাব না...

বাহাদুর ॥ মুখ সামলে কথা বলো, রতন। নয়তো এই ভোজালী দিয়ে...

রতন ॥ ওঃ, বাঙালী বাপের নেপালী ছেলে? মেজাজ দেখাচ্ছে, ও সব মেজাজ আমাকে দেখিও না।

বাহাদুর ॥ তবে রে? আজ তোকে— (ভোজালী তোলে।)

রতন ॥ এ্যাঃ, ভোজালী দেখাতে এসেছে? ভেবেছে বুঝি আমার কাছে কিছু নেই... (প্যাণ্টের পকেট থেকে একটা ছুরি বার করে তা খুলে) এস মারবে এস!

নন্দ ॥ আঃ বাহাদুর, কি হচ্ছে কি? নেশার ঝোঁকে এ' সব কি হচ্ছে?

বাহাদুর ॥ তুমি চুপ করে থাকো! পাঁচ হাজার টাকার লোভে যে মানুষ খুন করতে আসে তার আবার—

নন্দ ॥ তবে কি জানো, আমার ছেলেগুলো বাপের পরিচয় দিতে পাবে, তোমার মত—

বাহাদুর ॥ খবরদার নন্দ, এ ভাবে কথা বলবে না, তাহলে তোমাকেও এই...

পাণ্ডে ॥ রতন, তুমি তোমার ছুরিটা রাখো, এ ভাবে নিজেদের মধ্যে মারামারি করাটা...

রতন ॥ তুমি থামো ত। একটা পার্টি বললো আর অমনি তুমি মানুষ খুন করতে চলে এলে? নিজের মত বলতে কিছু নেই। তার ওপর আবার বিয়ে করা হয়েছে—

পাণ্ডে ॥ দেখ রতন, আমি দেশের কাজে এসেছি, তোমার ম'ত একটা চাকরী পাবার লোভে একটা মানুষকে খুন করতে আমি ছুটে আসি নি...

রতন ॥ বেশ করেছি এসেছি, তোর কিরে শালা...

পাণ্ডে ॥ দেখ, ঐ সব গালাগাল দেবে না...গালাগাল দেওয়া আমি পছন্দ করি না।

রতন ॥ বেশ করবো গালাগাল দেব, একশবার দেব···শালা···শালা···শালা··· কি করবি কর !

বাহাদুর ॥ এই তুই পাণ্ডেকে শালা বলে গাল দিলি কেন ?

রতন ॥ বেশ করেছি দিয়েছি···তোকেও দিচ্ছি, শালা···শালা·· শালা···কি করবি কর ?

বাহাদুর ॥ বদমাইস শুয়োরের বাচ্ছা—

রতন ॥ কি বললি ?

বাহাদুর ॥ কি আবার বলবো। বদমাইস শুয়োরের বাচ্ছা বলেছি তোকে···

হানিফ ॥ আঃ, কি শুরু করেছিস তোরা ? এদিকে চারটে বাজতে চললো !

রতন ॥ বাজুক, আজ আমি ঐ শালাকে—

[রতন ছুটে এসে বাহাদুরের পেটে ছুরি চালিয়ে দেয়। বাহাদুরও সঙ্গে সঙ্গে ভোজালীটা রতনের পেটে চালিয়ে দেয়। দুজনেই আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ও মারা যায়। নন্দ ও পাণ্ডে দুজনে ভয়ে আতঙ্কে কাঁপতে থাকে।]

নন্দ ॥ এভাবে ওরা দুজন মলো—তুমি বাধা দিলে না—

হানিফ ॥ বাধা দিয়ে কি হবে, এবার তোমরা দুজনে মারামারি করে মরো··· আমি শালা একাই—

[হঠাৎ সেই গাড়ীর শব্দ শোনা যায়। তিনজনে উৎকর্ণ হয়ে শোনে।]

নন্দ ॥ গাড়ী আসছে না ?

পাণ্ডে ॥ গাড়ীটা আমাদের নিতে আসছে···

[গাড়ীর শব্দটা ক্রমশঃ আগাতে থাকে। বাইরের ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং ঢং করে চারটে বাজে।]

হানিফ ॥ গাড়ীটা ঠিক সময়েই আসছে।

নন্দ ॥ আসুক, আমি যাব না—আমি পালাব···

পাণ্ডে ॥ সন্দীপ সেনকে খুন করার দরকার নেই, চলো আমরা পালাই...

[দুজনে পালাতে যায়।]

হানিফ ॥ সেই আগের গাড়ীটাই মনে হচ্ছে।

[দুজনে থমকে দাঁড়ায়।]

নন্দ ॥ তার মানে? পুলিশের গাড়ীটা···।

পাণ্ডে ॥ পুলিশের গাড়ীটা আবার এদিকে আসছে।

হানিফ ॥ এ সময় পালাতে গেলে পুলিশের হাতে পড়তে হবে। এদের দুজনের খুনের দায়ে জড়িয়ে পড়তে হবে···

নন্দ ॥ তাহলে—

পাণ্ডে ॥ আমাদের রিভলভার দাও।

হানিফ ॥ রিভলভার! ও···আচ্ছা এই নাও—

[হানিফ পাণ্ডে আর নন্দর হাতে দুটো রিভলভার দিয়ে নিজে একটা নিল।]

হানিফ ॥ আমি যতক্ষণ না বলি ততক্ষণ গুলি চালাবে না—

নন্দ ॥ একটু মদ দাও খাই।

পাণ্ডে ॥ আমাকেও।

[হানিফ মদ দিল। ওরা খেলে। গাড়ীর আওয়াজ আরও কাছে এসে থেমে গেল। আলোটা ঘরে স্থির হয়ে দাঁড়াল।]

নন্দ ॥ গাড়ীটা এইখানে দাঁড়াল।

পাণ্ডে ॥ পুলিশ তাহলে বাড়ীটা ঘেরাও করেছে।

হানিফ ॥ ঘেরাও করার আগেই আমাদের পালাতে হবে—তোমরা ঐ জানলার কাছে যাও, আমি দরজার কাছে দাঁড়াচ্ছি।

[দুজন জানলার কাছে দাঁড়াল।]

পাণ্ডে ॥ গাড়ী থেকে···কজন গাড়ী থেকে নামল?

হানিফ ॥ তাই নাকি? তাহলে আর দেরী নয়, গুলি চালাও!

নন্দ ॥ চালাব!

হানিফ ॥ হাঁ চালাও, আর দেরী নয়।

[দুজনে গুলি চালাতে গিয়ে দেখল পিস্তলে টোটা নেই।]

নন্দ ॥ একি? আমাদের পিস্তলে দেখছি টোটা...

হানিফ ॥ নেই, তাতো আমি জানি—

[হানিফ উচ্চস্বরে হেসে ওঠে]

আর যারা গাড়ী থেকে নামল ওরা পুলিশের লোক নয়··· ওরা হলো—
সন্দীপ সেনের লোক—

নন্দ ॥ পাণ্ডে—বুঝতে পারছো আমরা এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে পড়েছি—

হানিফ ॥ হাঁ, যার বিরুদ্ধে তোমরা ষড়যন্ত্র করছিলে সেই এই জালটা বিছিয়েছে।

নন্দ ও পাণ্ডে ॥ তোমাকে আমরা—

হানিফ ॥ আগাবার চেষ্টা করো না—আমার রিভলভারটায় কিন্তু টোটা ভরা আছে।

[ওরা দুজনে থমকে দাঁড়ায়। তার পরেই ব্যাকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। বলে।]

নন্দ ॥ হানিফ, আমাকে বাঁচাও। আমার ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে—

পাণ্ডে ॥ হানিফ, অন্ততঃ আমার কচি বৌ-এর মুখের দিকে তাকিয়ে—

হানিফ ॥ উপায় নেই। যে সন্দীপ সেনকে মারতে এসেছিল, তারই গুণ্ডাদের হাতে তোমাদের মরতে হবে—আমি না মারি ওরা মারবে—

নন্দ ॥ উঃ, কি ভয়ানক !

হানিফ ॥ সন্দীপ সেন তার একমাত্র ভায়ের ষড়যন্ত্রের কথা টের পেয়ে আরও নিখুঁত চক্রান্তের জাল ফেলে তোমাদের নিয়ে এসেছে এখানে। চিরদিনের মত সরিয়ে দেবে বলে—

পাণ্ডে ॥ তোমাদের পায়ে পড়ি হানিফ, আমাদের বাঁচাও।

হানিফ ॥ আমিও বাঁচতে চাই। তোমাদের মত আমিও বঁাচতে চাই। তোমাদের মারতে পারলে সন্দীপ সেন বলেছে আমাকে আর ফাঁসী কাঠে ঝুলতে হবে না।

নন্দ ॥ কিন্তু আমরাও এ ভাবে মরতে চাই না।

পাণ্ডে ॥ আমি বঁাচতে চাই—

হানিফ ॥ বঁাচতে আমিও চাই—

নন্দ ॥ তাহলে চলো, যেমন করে হোক এখান থেকে আমরা পালিয়ে—

হানিফ ॥ পালিয়ে যাব কোথায় ? সন্দীপ সেনের মত মানুষ দেশ জুড়ে। ওদের মারা যায় না, ওরাই আমাদের মারে—

নন্দ ॥ তাহলে—

হানিফ ॥ একটা পথ আছে।

পাণ্ডে ॥ আমরা তিনজনে একসঙ্গে মরতে পারি।

[দুজনে একটু ভাবে যেন।]

নন্দ ॥ না—না—আমার জন্যে তোমার মরার দরকার নেই—আমাদের মেরে —তুমি বাঁচো।

হানিফ ॥ বাঁচা আমার হবে না, ঐ সন্দীপ সেনের মত মানুষ কাজ হাসিল করে আমাকে ফাঁসি কাঠে লটকাবেই। তার চাইতে তোমাদের সঙ্গেই মরা ভালো। চারজন ভদ্রলোকের সঙ্গে মরার সুযোগ আমি আর পাব না। নাও, ঐ রতন আর বাহাদুরের ছুরি আর ভোজালীটা তুলে নাও। [ওরা তাই করে। নন্দ তার নিজের পেটের দিকে ভোজালীটা, রতন ছুরিটা তার নিজের বুকের দিকে তুলে ধরল। বাইরের ঘড়িতে ঢং করে সাড়ে চারটে বাজল।]

হানিফ ॥ সাড়ে চারটে—ঠিক এই সময়েই সন্দীপ সেনের মরার কথা ছিল!

[হানিফ রিভলবারটা নিজের গলার দিকে তুলে ধরল।]
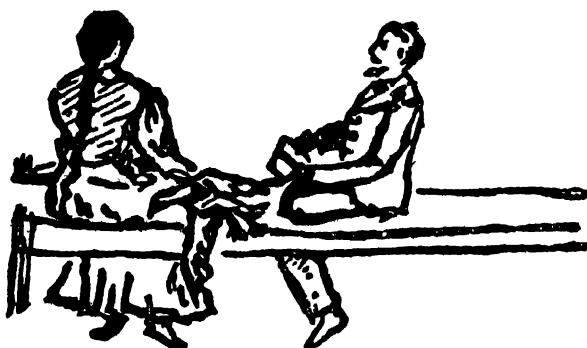
স্তানিস্লাভস্কি প্রযোজিত ও পরিচালিত চেখভের 'দি সী'গাল' নাটকের একটি স্কেচ্। স্তানিস্লাভস্কি অঙ্কিত

একাঙ্ক নাটক

কেয়াকুঞ্জ

বিভূতি মুখোপাধ্যায়

চরিত্র

রাথহরি, সুবল, ষষ্টিচরণ, শ্রীধব,

[illegible]

[গ্রামের নাম কেয়াকুঞ্জ। সুন্দর বনের বাদা অঞ্চলের একটি নগণ্য গ্রাম। গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাথহরি সাঁপুই-এর পর্ণকুটির।

রাথহরির বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। দেখলে তাকে বৃদ্ধই মনে হয়। ছেলে ষষ্টিচরণের বছর কুড়ি বয়স। খঞ্জ। একটা পা টেনে টেনে হাঁটে। অতিরিক্ত মেজাজ।

রাইমণির বয়স বছির পঁয়ত্রিশ। চেহারায় যুবতীই বলা যায় যদিও হতশ্রী।

সময় সন্ধ্যা। রাইমণি দাওয়ায় দাঁড়িয়ে শাঁখে ফুঁ দেয়। অল্প অল্প বিরতির পর এধার ওধার থেকেও শঙ্খধ্বনি শোনা যায়। তিনবার শাঁখে ফুঁ দিয়ে দাওয়া থেকে আঙিনায় নেমে আসে রাইমণি। তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বালায়, গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে দেবতার উদ্দেশ্যে। দাওয়ার কোণে একটি ছায়ামূর্তি দেখা যায়। প্রমত্ত মূর্তি। বাঁশের খুঁটি ধরে কোনরকমে নিজেকে সামলে সামলে সে এগিয়ে আসে স্বল্পালোকিত সন্ধ্যায় দেখা যায় মূর্তিটি ষষ্টিচরণের। রোগা, বীভৎস চেহারা। একমাথা রুক্ষ ঝাঁকড়া চুল। ভাঙা গাল, কোটরাগত চক্ষু। সারামুখে লাম্পট্যের অভিজ্ঞান। দাওয়ার ধারে এসে ষষ্টিচরণ জড়িত কণ্ঠে ডাকে।]

ষষ্টি॥ মা—মা—

[প্রণামরত রাইমণি সাড়া দেয় না]

মরেছে নাকি—এই মা। হারামজাদী গেল কোথায়?…মা…দেখদিনি …সুবলা ওদিকি পচাইয়ের হাঁড়ী নে বসে আছে, আর ইদিকি চিল্লে চিল্লে আবার গলা ফেঁড়ে গেল তবু দেখা নেই! এই মা…

রাইমণি॥ কি বলছিস!

ষষ্টি ॥ তুই ওইখেনে! চিল্লে চিল্লে আমার গলা ফেঁড়ে গেল শুনতে পাসনি?

রাইমণি ॥ ঠাকুরির থানে পিদ্দিম ধরেছিনু—দেখতে পাসনি?

ষষ্টি ॥ পিদ্দিম ধরেছিলি! না ওইখেনে খিচ্‌কি মেরে পড়েছিলি পাছে আমারে পয়সা দিতি হয় বলে?

রাইমণি ॥ পয়সা! কারে পয়সা দেবো!

ষষ্টি ॥ আমারে দিবি আবার কারে! আমি তোর ছেলে ষষ্টিচরণ!

রাইমণি ॥ তুই আবার নেশা করেছিস!

ষষ্টি ॥ আখোন সম্পুন্ন করিনি। করবো! সুবোল ওই বাবার থানে পচায়ের হাঁড়ী নে বসে আছে! পয়সা দে!

রাইমণি ॥ পচাইয়ের হাঁড়ী তো এনেছে সুবোল, আবার পয়সা কি হবে!

ষষ্টি ॥ মাইরী আর কি? পয়সা কি হবে! পয়সা না দিলি রাধিকে ঘরে ঢুকতি দেবে না, বলে পয়সা কি হবে! দে বলছি!

রাইমণি ॥ আমার ঠেঙে পয়সা নে তুই রাধিকার ঘরে যাবি একথা বলতে তোর মুখে আটকালো না?

ষষ্টি ॥ আমি ওসব কিছু বলিনি। তুই পয়সা দিবি কি না বল!

রাইমণি ॥ না! পয়সা নেই!

ষষ্টি ॥ দিবিনি?

রাইমণি ॥ না! বলনু তো পয়সা নেই!

ষষ্টি ॥ তোর বাবা দেবে!

রাইমণি ॥ ভর সন্ধ্যেবেলা গালমন্দ করিসনে বলছি ষষ্টি!

ষষ্টি ॥ ভালচাসতো পয়সা দে! নৈলে সিদিনের মত চুলের ঝুঁটি ধরে মুখটা আবার ছাইগাদায় রগড়ে দেবো! দে বলছি···

রাইমণি ॥ তোর যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! দাঁড়া আজ তোর ঝেঁটিয়ে আমি বিষ ঝাড়ছি।

[একটা ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে যায়। ষষ্টিচরণ কিছু বোঝবার আগেই সপাসপ ঝাঁটার বাড়ী মারতে থাকে]

যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আমার চুলের ঝুঁটি ধরে তুই ছাইগাদায় আমার মুখ রগড়াবি! হারামজাদা ড্যাকরা ছেলে আমি পেটে ধরেছিনু...বল...বল...আর গাল পাড়বি...

ষষ্টি ॥ (মার সামলায়) ভাল হচ্ছে না বলছি...

রাইমণি ॥ (ঝাঁটা চালিয়েই যায়) বাপ সেই সকাল থেকে তাড়িখানায় পড়ে আছে…সারাদিন পেটে এক দানা কাঁচা চালও পড়েনি! আর ছেলে সন্ধ্যেবেলা পচাই খেয়ে এলো পয়সা চাইতে, রাধিকে ঘরে ঢুকতে দেবে না।…হারামজাদা তোর নেশা আজ ছোটাচ্ছি আমি…বল…বল… বল আর গাল দিবি…দিবি আর গাল… [হাঁফায়]

ষষ্টি ॥ (সরে যায়) তুই আমারে মারলি! (মুখ মোছে। কষবেয়ে গড়ান রক্ত হাতে লাগে) মুখ দে আমার রক্ত বার করলি…

রাইমণি ॥ বেশ করেছি!

ষষ্টি ॥ তুই আমার মুখ দে রক্ত বার করলি! (স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রাইমণির দিকে)

রাইমণি ॥ অক্তপাতের আখোন হয়েছে কি? তোরে আমি খুন করব আজ!

[আবার ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে যায়]

ষষ্টি ॥ ভাল হবেনি বলছি…থুয়ে দে ঝাঁটা…তবেরে! (দাওয়া থেকে একটা বাঁশ তুলে নেয়) আয় আজ তোর একদিন কি আমার একদিন। [বাঁশ তুলে হিংস্র শ্বাপদের মতো এগোয় রাইমণির দিকে। ছেলের হিংস্র রূপ দেখে ভয় পায় রাইমণি। ঝাঁটা হাতে করেই একপা একপা করে পেছোয় সে।]

রাইমণি ॥ ফেল বলছি! বাঁশ ফেলে দে ষষ্টি।…

ষষ্টি ॥ তুই আমার মুখ দে রক্ত বাব করেছিস! রক্ত! (বাঁশের বাড়ি মারে রাইমণির হাতে। ঝাঁটা ছিটকে পড়ে যায়। রাইমণি আর্তনাদ করে ওঠে) চাবী দে!…(আরো এগিয়ে আসে)

রাইমণি ॥ চাবী নেই!

ষষ্টি ॥ দে বলছি!

রাইমণি ॥ চাবী নেই আমার কাছে!

ষষ্টি ॥ দিবিনে!

রাইমণি ॥ না!

ষষ্টি ॥ দিবিনে? (অকস্মাৎ এলোপাথড়ি লাঠি চালাতে শুরু করে। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠে রাইমণি) দিবিনে…দিবিনে…দিবিনে…

[মারের চোটে হতবুদ্ধি হয়ে যায় রাইমণি। কান্না থেমে যায়। ষষ্টিচরণ দাঁড়িয়ে দেখে কিছুক্ষণ। তারপর হাতের লাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে

ফিরে, ওর আঁচল থেকে চাবী খুলে নেয়। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘরে যায়। রাইমনি তখনও পড়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ঘরের ভেতর থেকে জামা, বাসন, গুড়ের নাগরী, তোবড়ানি টিনের সুটকেশ সব বাইরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে ষষ্টিচরণ। তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে আসে। দাওয়ার পড়ে থাকা রাইমণির উদ্দেশ্যে বলে।]

রেতের বেলা ফিরবো। ত্যাখন যদি পিণ্ডি রেঁধে না রাখিস তো আবার মজা টের পাবি।

[খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে যায়। রাইমণি পড়ে থাকে একভাবে! ফোঁপায়! সময় কাটে। নেপথ্যে শ্রীধরের ডাক শোনা যায়।]

শ্রীধর॥ রাখহরি আছো নাকি গো...অ রাখহরি···ব্যাপার কি চারিদিকে যে সুনসান করতিছে! রাইমণি···অ রাই...

[রাইমণি কোন সাড়া দেয় না। শ্রীধর আরো এগিয়ে আসে। নাদুস নুদুস চেহারা প্রায় ষাটের কাছাকাছি। পরণে খাটো ধুতি আর ফতুয়া। গলায় কণ্ঠি। মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটা। এগুতে গিয়ে আঙিনায় পড়ে থাকা টিনের সুটকেশে হোঁচট খায়।] এই গ্যাখো···(ভালো করে এ্যাই গ্যাখো... (ভালো করে দেখে) ওরে বাবা, দেখি কুরুক্ষেত্তর হয়েছে। ষষ্টিচরণ ঘরে এসেছেল বুঝি!... (দাওয়ায় রাইমণিকে ঠাওর করে) কে ওটা।

[রাইমণি নিজেকে সামলে উঠে বসে]

রাইমণি! ওভাবে পড়েছিলে কেন?

রাইমণি॥ ঘুমুচ্ছিলুম! আপনি কখন এলেন শ্রীধর জ্যাঠা!

শ্রীধর॥ হেঁ হেঁ হেঁ...রাইয়ের আমার এক কথা...এই একুণি আসছি...শ্রীধর জ্যাঠা! জ্যাঠা বলাটা আর তুমি ছাড়তে পারলে না রাই...

রাইমণি॥ গেরাম সুবাদে তো সকলেই জ্যাঠা বলে আপনারে···

শ্রীধর॥ তাই বল...গেরাম সুবাদে...হেঁ হেঁ···তা এই গ্যাও, ধর দিকিনি! (পুঁটলি এগিয়ে ধরে)

রাইমণি॥ কি ওটা!

শ্রীধর॥ এই চাট্টি চাল! রাখহরি যে কি করে সে তো জানি। সেই সকাল থেকে গিয়ে আমার দোকানে পড়ে আছে। অত করে বললুম আর নেশা করিসনে রাখহরি এবার ঘর যা। রাই হয়তো ওদিকি তোর

পথ চেয়ে বসে আছে। তা কে কার কথা শোনে। নেশায় একেবারে টইটম্বুর। নেশার ঘোরে কেঁদে কেঁদে বললে, জ্যাঠা আজ দুদিন বাড়িতি চাল নেই? কচুর ডগা সেদ্ধ করে তাই খেয়ে আছি! তুমি আমারে উদ্ধার কর। একেবারে পা জড়িয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদতি লাগল! পেরথমটায় খুব রাগ হলো! বললুম খেতে দিতে পারিস না তো আবার দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করতে গেলি কোন সাহসে!…তারপর ভাবলুম যে না, যাই একবার…রাই ওদিকি না খেয়ে আছে…তা ন্যাও ধর!…

[রাইমণি এগিয়ে আসে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে]

ওকি চোখ মুখগুলো ফুলো ফুলো লাগছে কেন?

রাইমণি॥ অবেলা করে ঘুমুচ্ছিলাম…

শ্রীধর॥ আরে এ-যে কালসিটের—দাগ!…ইস্…কে করেছে এমন ধারা! কে?

রাইমণি॥ কে আবার করবে?

শ্রীধর॥ আমার কাছে আর গুপ্ত করোনি রাইমণি! আমি সব বুঝেছি! তোমার ছেলে যষ্টেটা বাড়িতি এসেছিল বুঝি? না-না মুখ নীচু করে থাকলে চলবেনি!…এ ত ভাল কথা নয়! অনেক দিন ধরেই এসব চলছে—এবারে দক্ষিণ রায়ের পুজোর সময় এর একটা বিহিত করা দরকার!

রাইমণি॥ বিহিত করবেন!…

শ্রীধর॥ ওর মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গাঁ থেকে আমি বার করে দেবো!

রাইমণি॥ না-না জ্যাঠা! বাবার থানে এসব কথা তুলবেন না।

শ্রীধর॥ না-না—মায়ের মন ছেলের অকল্যাণ চায় না আমি বুঝি! কিন্তুক বাড়াবাড়ি করলে পঞ্চায়েতি বিধান তো মানতেই হবে! মোড়ল মাতব্বর হয়ে তো আর নিজি চক্ষে এসব অনাচার দেখতি পারি না!

হাত দিয়ে ওর চিবুক তুলে ধরেন, রাইমণি তীর বেগে সরে যায়। তীব্র কণ্ঠে বলে]

রাইমণি॥ জ্যাঠা!

শ্রীধর॥ কপালটা একেবারে ফুলিয়ে, কালশিটে পড়িয়ে দিয়েছে গা!

রাইমণি॥ আপনি এখন আসুন জ্যাঠা!

শ্রীধর॥ হেঁ হেঁ…হেঁ—। থাকতে কি আর এসেছি রাই! যেতে তো হবেই!—তবে এর একটা বিহিত না করলে নয়!—ছেলেটা তোমার বিগড়েই গেছে রাইমণি! নেশা ভাঙের কথা বাদই দিলুম। কাণাঘুষোয় আরো অন্ত কথাও শুনতে পাই।

রাইমণি॥ কী! কী শুনতে পান!

শ্রীধর॥ শুনতে পাই বড় সর্বনেশে কথা। চোরাই মালের লেনদেনের কারবারে নাকি ফেঁসেছে তোমার ছেলে!

রাইমণি॥ জ্যাঠা!

শ্রীধর॥ তোমার ছেলেটা থাকলে কি আর দুঃখ্যু দিতো! কক্ষুণো না। বড় ভালো ছেলে ছিল। মুখের দিকি তাকিয়ে—কোন কথা বলতো না! ভগবান সইলেন না তাই কুমীর ডুবির জলে গে' ডুবলো!—

রাইমণি॥ জ্যাঠা—

শ্রীধর॥ কি?

রাইমণি॥ ষষ্টিচরণের ওই যে কথাটা বললেন—

শ্রীধর॥ কি, চোরাই মালের কারবার? হ্যাঁ, কাণাঘুষোয় তো শুনতে পাই—বিহিত একটা করতেই হবে—তবে—

রাইমণি॥ কী তবে!

শ্রীধর॥ তুমি একটু মুখ তুলে চাইলে—

রাইমণি॥ জ্যাঠা!—

শ্রীধর॥ এই খ্যাখো তুমি আবার চেঁচাতে শুরু করলে—

রাইমণি॥ তা কি করবো, আপনার এই মধুর বাক্যি শুনে মুখে ফুল চন্নদে পুজো করবো। আপনি চলে যান এখান থেকে! আমার ছেলে চোর হোক, ধাউড় হোক, বদমাইস হোক তাতে আপনার কি?

শ্রীধর॥ আঃ, তোমার মেজাজটা সত্যিই বড্ড গরম হয়ে গেছে। তোমার জন্যে ভাবি তাই বলতে যাই। তোমার ছেলে! সতীনের ছেলে আবার নিজের ছেলে হয় কবে!

রাইমণি॥ আপনি কে আমার সাতপুরুষের নাউখোলা, যে ভর সন্ধ্যেয় একমুঠো চাল দিয়ে ভাব জমাতি এসেছেন! কি ভেবেছেন কি আপনি! ভিখিরি পেয়েছেন আমাদের!

শ্রীধর॥ তুমি কি বলছো গো রাই, রাগের মাথায়!

রাইমণি ॥ চলে যান আপনি। আমরা খেতি না পাই উপোস দিয়ে থাকবো! তবু আপনার দ্বারস্থ হবো না! (পুঁটলিটা সজোরে ওর সামনে বসিয়ে দেয়) এই নিন আপনার চাল! চলে যান এখান থেকে!

শ্রীধর ॥ হেঁ হেঁ হেঁ, কথায় বলে বিষ নেই তার কুলোপানা চক্কর। ভালো গো ভালো! চলেই যাচ্ছি। নাঃ, মানুষের ভালো করতি নেই!— তবে এও বলি রাইমণি, এ্যাতো গুমাক ভালো নয়। কথায় বলে যৌবন সময়ের মতো। অনবরত ভেসেই চলেছে, কিন্তুক ফিবতি আর আসে না। উজান নেই, শুধু ভাঁটি আছে।

রাইমণি ॥ আপনি যাবেন কি না!

শ্রীধর ॥ হ্যাঁ, এই যাই। তবে দক্ষিণ বায়েব পার্বণে ষষ্টিচরণের কথাটা আমাবে তুলতেই হবে! মোড়ল মাতব্বব হয়ে অনাচার হতে দিতি পারি না!

[পুঁটলি নিযে চলে যায়। বাইমণি কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ছুটে ঘরে যায়। ঘর থেকে একটা নতুন ট্রানজিস্টাব এবং আঁরো কয়েকটি টুকিটাকি চোরাই মাল বার করে নিয়ে আসে। সেগুলো লুকোবার জন্য নিবাপদ জায়গা খোঁজে। ছোট ছোট জিনিসগুলো লুকিয়ে বাখে চালের বাতায়।—এই সময় পা টিপে টিপে একজন আঙিনায় প্রবেশ করে। আগন্তুক অল্প বয়সী। বছব আটাশ বয়স। সপ্রতিভ। চেহারায় গ্রামের লোকের মত নয়। জামায় কাপডে শহুরে সভ্যতাব ছাপ। বাইমণি আগন্তুককে দেখতে পায়নি। সে তখন ট্রানজিস্টাব নিয়ে ব্যস্ত ছিল। যুবকটি কৌতুক মিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ওর দিকে। ট্রানজিস্টার রাখার জায়গা না পেয়ে বাইমণি ঘরে যেতে যায়, এমন সময় তার নজর পড়ে আঙিনার দিকে। চমকে ওঠে। হাতেব ট্রানজিস্টার পেছন দিকে লুকিয়ে ভীত স্বরে প্রশ্ন করে]

রাইমণি ॥ কে?

আগন্তুক ॥ ভেতরে আসতে পারি!

রাইমণি ॥ কে আপনি!

[আগন্তুক তার কথার উত্তর না দিয়ে এগিয়ে আসে]

আগন্তুক ॥ আপনাদের বাগানটা কিন্তু বেশ সুন্দর!

রাইমণি ॥ বাড়ীতে কেউ নেই, আপনি কোথায় আসছেন!

আগন্তুক ॥ (হঠাৎ হেসে ওঠে)

রাইমণি ॥ হাসতিছেন কেন?

আগন্তুক ॥ আমাকে আপনি বলছেন শুনে—

রাইমণি ॥ ওমা, নতুন মানুষ, চিনিনি, জানিনি—

আগন্তুক ॥ সত্যি আপনি খুব ভয় পেয়েছেন। নৈলে দেখতেন আমি আসলে আপনার ছেলের মতন, হ্যাঁ, আমাকে আপনার ছেলে বলেও ভাবতে পারেন।

রাইমণি ॥ ছেলে!

আগন্তুক ॥ হ্যাঁ! জানেন আমার মাও ঠিক আপনার মতো। হুবহু।

রাইমণি ॥ তুমি কে?

আগন্তুক ॥ সে অনেক কথা! চট্ করে বললে চিনতে পারবেন না! আমি শহরে থাকি! মানে থাকতাম!—যাচ্ছিলাম অন্য একটা জায়গায়—অনেক দূরে—পথ হারিয়ে ফেলেছি। ভাগ্যিস এই বাড়ীটা দেখতে পেলাম—

রাইমণি ॥ বাড়ীতে কেউ নেই অখোন—

আগন্তুক ॥ নেই! সেকি! এত রাত্তিরে সব কোথায় গেছে?

রাইমণি ॥ রাত করেই ফেরে তারা!

আগন্তুক ॥ অন্যায়! অত্যন্ত অন্যায়! একা একা আপনার ভয় করে না?

রাইমণি ॥ না!

আগন্তুক ॥ চোর ডাকাত আসতে পারে!

রাইমণি ॥ (দাওয়া থেকে যান্ত্রিকভাবে কাঠকাটা কুড়ুলটা তুলে নেয় হাতে) আমাদের ঘরে কি আছে যে চোর ডাকাত আসবে?

আগন্তুক ॥ ওকি, ওটা হাতে নিলেন কেন?—ভয় নেই, আমি সত্যিই চোর ডাকাত নই!

[রাইমণি আগন্তুকের কথায় নিজের হাতের কুড়ুলটার দিকে তাকায়। একটু ইতস্তত করে, কিন্তু রাখে না সেটা]

আগন্তুক ॥ সত্যিই বড় দরিদ্র আপনার সংসার! (হঠাৎ) আচ্ছা এখানে আর কে কে থাকে!

রাইমণি ॥ ষষ্টিচরণ আর তার বাবা!

আগন্তুক ॥ ষষ্টিচরণ ! আপনার ছেলে বুঝি ?

রাইমণি ॥ না, আমার সতীনের ছেলে।

আগন্তুক ॥ সতীন—সতীন—ও !—তা—আপনার নিজের ছেলে নেই !

রাইমণি ॥ না !—একটা শত্তুর ছিল—হারিয়ে গেছে !

আগন্তুক ॥ হারিয়ে গেছে ?

রাইমণি ॥ তার পাঁচ বছর বয়সের সময় কুমীর ডুবি নদীতে চান করতে গিয়ে—আর—ফেরে নি।

আগন্তুক ॥ ডুবে গেছে ?

রাইমণি ॥ কি জানি ! অনেক খোঁজা হয়েছে কিন্তুক লাস পাওয়া যায়নি ওর বাপ টানা জাল ফেলেছেল নদীতে।—কিন্তুক এসব কথা শুনে তোমার কি হবে !

আগন্তুক ॥ না এমনি ! মনে হলো তাই জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা এমন তো হতে পারে যে আপনার সেই ছেলে আসলে নদীতে ডোবেনি।

রাইমণি ॥ ডোবেনি !

আগন্তুক ॥ না ! হারিয়েও তো যেতে পারে।

রাইমণি ॥ হারিয়ে ! (আপন মনে) একদল বেদে এসেছিল তখন আমাদের গেরামে ! বেদে—

[পাথর প্রতিমার মত স্থির হয়ে থাকে। গুম্ গুন্ গুম্ গুম্ করে দূরাগত ড্রামের ধ্বনি শোনা যায়। সঙ্গে সঙ্গে দূরাগত কণ্ঠধ্বনি—
"হুই বেদের খেল্যা দেখাবো গো ! বাঁশ-চড়া, হাপু খেলা, ভোজবাজী দেখাবো গো—ডুম্ ডুম্ ডুম্—।
গুরুগম্ভীর মৃদঙ্গের শব্দ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। বেতালা বেসুরে। স্পট লাইটের আলো রাইমণির বিভ্রান্ত মুখের ওপর খেলা করে। উত্তেজনায় চাপা কণ্ঠে রাইমণি আগন্তুককে প্রশ্ন করে]

তুমি কে ?

আগন্তুক ॥ আমি ! বললুম তো পথ হারিয়ে এখানে আসছি। (রাইমণির বিশ্বাস হয় না কথাটা। এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে আগন্তুকের মুখের দিকে। আগন্তুক সেটা গ্রাহ্য না করেই বলে যায়) আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, আপনার হারিয়ে যাওয়া ছেলে আবার ফিরে এলো ! এখন সে নিশ্চয় অনেক বড় হয়েছে। রোজগার পাতিও হয়তো

করছে! হয়তো অনেক টাকা কড়ি নিয়ে সে ফিরে এলো হঠাৎ!
তাহলে খুব মজা হয়, না!—

[রাইমণি একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। ডুম্ ডুম্ ডুম্ ডুম্ মৃদঙ্গের ধ্বনিটা আবার শুরু হয়। আগন্তুক যখন কথা বলে তখন ধ্বনিটা থামে, কিন্তু রাইমণির মুখে স্পটের আলো পড়লেই ধ্বনিটা শোনা যায়।]

ওকি চুপ করে আছেন কেন? ছেলেটি ফিরে এলে ভাল হয় না? আপনাদের এই দুঃখের সংসারে সাহায্য হয়। বুড়ো বয়সের একজন ভরসা হয়!—

[স্পট লাইট গিয়ে পড়ে রাইমণিব মুখের ওপর। ডুম্ ডুম্ ডুম্ ডুম্ মৃদঙ্গ ধ্বনি আরো বাড়ে বেতালাভাবে]

তারপর ধরুন বিয়ে হবে ছেলের! আপনার বউ আসবে ঘরে। ছোট্ট একটা বউ ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। রান্না করবে, ঘর নিকোবে, গোবরছড়া দেবে দাওয়ায়। সন্ধ্যে হলে তুলসী তলায় পিদ্দিম জ্বালাবে—

[আলোটা আগন্তুকের মুখ থেকে সরে গিয়ে রাইমণির মুখে পড়ে। ডুম্ ডুম্ মৃদঙ্গ বাদ্য বেতালা হয়ে ওঠে। বাজতে থাকে দ্রুতলয়ে। অন্ধকারেব মধ্য থেকে আগন্তুকের কণ্ঠ শোনা যায়]

তারপর নাতি পুতি আসবে এক এক করে। নাতি পুতি ঘর সংসাব ভরে উঠবে!—খুব মজা হয়, না?

[রাইমণি হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ে। আগন্তুক অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে]

ওকি—কি হলো!—আপনি কাঁদছেন কেন—

রাইমণি॥ (কান্নাভরা কণ্ঠে) তুমি অমন করে আমাকে লুভি করোনা গো! আমার ছেলে নেই! যে ছিল সে আমার শত্তুর। ছেলে নয় গো— ছেলে নয়— (কান্নায় ভেঙে পড়ে)

আগন্তুক॥ ছি! ছি! আমি এমনি বলছিলুম কথাগুলো। আপনার মনে দুঃখ্যু হবে জানলে—শুনছেন—মা—মা—

[তীব্রবেগে ঘুরে দাঁড়ায় রাইমণি]

রাইমণি॥ কে মা! আমি কারুর মা নই! আমারে ডেকোনি এই বলে—

[ঘটনার আকস্মিকতায় আগন্তুক হকচকিয়ে যায়! রাইমণিও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। নেপথ্যে মত্ত কণ্ঠে গান শোনা যায়।]

"ও বলরাম ফিরে যা তুই গৃহেতে।

নীলমণি ধন দিবে না যায় গোষ্ঠেতে ॥—”

ওই আসছে ষষ্টিচরণের বাপ!

[আগন্তুক উৎসুক দৃষ্টিতে অন্তিমার দিকে তাকায়। একটি প্রায় নিষ্প্রভ হ্যারিকেন হাতে ঝুলিয়ে মত্ত রাথহরি বেতালা পায়ে প্রবেশ করে। আগন্তুক তাড়াতাড়ি উঠে যায়। প্রমত্ত রাথহরিকে হাত ধরে দাওয়ায় উঠতে সাহায্য করে।]

রাথহরি ॥ ঠিক আছে! ঠিক আছে!

আগন্তুক ॥ আপনি নিশ্চয়ই এই বাড়ীর কর্তা—

রাথহরি ॥ কে বাবা তুমি! রাজপুত্তুর! বেড়ে জামাকাপড় পরেছো তো! পায়ে এত কাদা কেন! মুছে দেবো?—(বসে পড়ে) রাজপুত্তুরের পা মুছে দি—

আগন্তুক ॥ আরে ছি ছি—পায়ে হাত দিচ্ছেন কেন?

রাথহরি ॥ রাজপুত্তুরের পা পুঁছিয়ে দিচ্ছি!—বাবার থানে পুন্নি করছি!—

[নাছোড়বান্দা রাথহরি আগন্তুকের পা ধরে টানতে যায়]

রাইমণি ॥ মরে এসেছে একেবারে। (ধাক্কা দেয়) শুনতিছ—

রাথহরি ॥ এঁ্যা!——কি হয়েছে?

রাইমণি ॥ শুনে যাও! ঘরে এসো একবার।

[রাইমণি রাথহরিকে ঘরে নিয়ে যায়। আগন্তুক বসে থাকে চুপ করে। ষষ্টিচরণ প্রবেশ করে! আগন্তুককে দেখে তার দৃষ্টি হিংস্র হয়ে ওঠে। প্রশ্ন করে]

ষষ্টি ॥ কে?

আগন্তুক ॥ তুমি বুঝি এবাড়ীর ছেলে!

ষষ্টি ॥ সে খোঁজে তোর কি দরকার?

আগন্তুক ॥ তোমার নাম ষষ্টিচরণ।

ষষ্টি ॥ কে তুই?

[চেঁচামেচিতে রাইমণি বেরিয়ে আসে]

রাইমণি ॥ ষষ্টি!

ষষ্টি ॥ কে এটা?

রাইমণি ॥ বলতিছি! (আগন্তুককে) তুমি বাবা একটুক ঘরের মধ্যি যাও তো! ওর বাবা তোমারে ডাকতিছে!

ষষ্টি ॥ ও কে ?

রাইমণি ॥ বলতিছি ! যাও বাবা ! যাও—

[আগন্তুকের ঘরের মধ্যে প্রস্থান ।]

শ্রীধর জ্যাঠা এয়েছেল !

ষষ্টি ॥ মরুকগে শ্রীধর জ্যাঠা ! ও কে ?

রাইমণি ॥ ও একটা ভবঘুরে ।...কিন্তুক শ্রীধর জ্যাঠার মতলবটা ভাল নয় ।

ষষ্টি ॥ কেন ?

রাইমণি ॥ তোর কথা বলছিল ।

ষষ্টি ॥ আমার কথা ! কি কথা ?

রাইমণি ॥ ঐযে সব জিনিসপত্তর তুই আনিস সেই কথা । আমাকে শুধাচ্ছিল ।

ষষ্টি ॥ তুই বলেছিস !

রাইমণি ॥ না ! শুধু ঘর থেকে তোর সেই জিনিসগুলো নে হেথায় এই বাতার ফাঁকে লুকোয়ে রেখেছি ।

ষষ্টি ॥ (রেগে) ওই জিনিসে তুই কেন হাত দিয়েছিস ! কে তোরে হাত দিতি বলেছে ?

রাইমণি ॥ শ্রীধর জ্যাঠা ভয় দেখালো, তোর কথা পঞ্চায়েৎ সভাকে কয়ে দেবে !

ষষ্টি ॥ বলেছে ?

রাইমণি ॥ হ্যাঁ !

ষষ্টি ॥ শালাকে আমি...দেতো কুড়ুলটা...আজ রাতেই আমি শালাকে খতম করে আসি ।

[কুড়ুলটা নিজেই তুলে নেয় দাওয়া থেকে]

রাইমণি ॥ ষষ্টি শোন বাবা, আগ করতে নেই, শোন...

[রাইমণি ষষ্টিকে শান্ত করার চেষ্টা করে । রাখহরি আর আগন্তুক ঘর থেকে দাওয়ায় আসে কথা বলতে বলতে ।]

রাখহরি ॥ জঙ্গলে পথ হারিয়ে এখানে চলে এসেছো !

আগন্তুক ॥ হ্যাঁ !

রাখহরি ॥ তা কোন গেরামে যাচ্ছিলে ?

আগন্তুক ॥ গ্রাম···গ্রাম···হ্যাঁ—হ্যাঁ, মনে পড়েছে, পাথর প্রতিমা !

রাখহরি ॥ পাথর প্রতিমা ! সে তো অনেক দূর ! এই গেরামের উল্টোদিকে ।

আগন্তুক ॥ উল্টোদিকে ? ও...হ্যাঁ...তা হবে ।

রাখহরি॥ যাই হোক আজকের আস্তিরটার মতো থেকে যাও!...কিন্তু খাবার কিচ্ছু নেই...

রাইমণি॥ যা আছে তাই খেলেই হবে! তোমরা বসো আমি ব্যবস্থা করতিছি।

[ওরা বসে দাওয়ায়। ষষ্টিচরণ আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে থাকে। কোন কথা বলে না। আগন্তুক ওদের দিকে তাকিয়ে বলে।]

আগন্তুক॥ আমার কাছে কিন্তু অনেকগুলো টাকা আছে।

রাখহরি॥ টাকা!

ষষ্টিচরণ॥ টাকা!!

রাইমণি॥ (যেতে যেতে ফিরে এসে) টাকা!!!

ষষ্টিচরণ॥ কোথায়?

আগন্তুক॥ এই যে! [পকেট থেকে নোট এবং খুচরোয় মিলিয়ে প্রায় হাজার খানেক টাকা সামনের ভাঙা টেবিলের ওপর রাখে। রাখহরি, ষষ্টিচরণ, রাইমণি সকলে হুমড়ী খেয়ে পড়ে টেবিলের ওপর! রাখহরি বিস্ফারিত বিস্ময়ে টাকার দিকে তাকিয়ে থাকে।]

রাখহরি॥ এতো টাকা!

আগন্তুক॥ হাজার টাকা আছে।

রাইমণি॥ হাজার!

[অসীম মমতাভরে টাকাগুলো স্পর্শ করে ও। রাখহরিও সাহস পেয়ে টাকাগুলো ছোঁয়। সাজায়! খেলা করে। আগন্তুক স্মিত হাস্যে ওদের রঙ্গ দেখে। ষষ্টিচরণ একভাবে দাঁড়িয়ে একবার ওদের দিকে, আর একবার আগন্তুকের মুখের দিকে তাকায়। হাতের কুড়ুলটা শক্ত করে ধরে বজ্রমুষ্ঠিতে।]

আগন্তুক॥ এই সব টাকা যদি তোমরা পেতে তাহলে বেশ হতো, না?

রাখহরি॥ আমরা! আমরা কোথা থেকে এত টাকা পাবো! কে দেবে আমাদের?

রাইমণি॥ এত ট্যাকা নিয়ে তুমি একা একা ঘুরেছ, যদি কেউ কেড়ে নিত?

আগন্তুক॥ কে আর নেবে!

ষষ্টিচরণ॥ (বজ্রগর্জনে বলে) যা খেতে দে!

রাইমণি ॥ এ্যাঁ, এই যে বাবা যাচ্ছি! (আগন্তুককে) টাকাগুলো রেখে দাও বাবা। উ বড় বিষ—বড় নেমকহারাম—

ষষ্টিচরণ ॥ (একইভাবে) তুই পিণ্ডি দিবি কি না?

রাইমণি ॥ এই যাই। (রাখহরিকে) এসো— [প্রস্থান]

[টাকা ছেড়ে ওদের উঠতে কারুর মন চায় না। তবু উঠে পড়ে। রাখহরি ইতস্ততঃ করে তারপর আগন্তুককে বলে]

রাখহরি ॥ ইয়ার থেকে একটা টাকা আমাকে দেবে!

আগন্তুক ॥ একটা টাকা! মাত্র একটাকা?

রাখহরি ॥ হ্যাঁ! দু বোতল পচাই হতো!

আগন্তুক ॥ এ সব সরকারী টাকা—

রাখহরি ॥ সরকারী টাকা! (টাকাগুলোর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকায়। তারপর বাধো বাধো স্বরে বলে) থাক তাহলে—থাক—থাক!

[বিড় বিড় করতে করতে ঘরে চলে যায়। কুড়ুলটা দু হাতে চেপে ধরে ষষ্টিচরণ একইভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। ওরা চলে যেতে ও আগন্তুকের দিকে এগিয়ে আসে।]

ষষ্টিচরণ ॥ এত টাকা তুই কোথায় পেলি!

আগন্তুক ॥ সরকারী টাকা। (টাকা তুলতে তুলতে) সরকারী কাজ করি আমি। পাথর প্রতিমায় জমিদারদের খেসারৎ দিতে হবে বলে এ টাকা কাছারীতে পাঠাচ্ছে সরকার।

ষষ্টিচরণ ॥ তুই চোর!

আগন্তুক ॥ চোর! আমি!

ষষ্টিচরণ ॥ হ্যাঁ, সবটাকা চুরি করেছিস তুই। চুরি করে পালিয়ে এসেছিস।

আগন্তুক ॥ (হেসে ওঠে) চুরি করে পালিয়ে এসেছি আমি?

ষষ্টিচরণ ॥ চুপ!

[ষষ্টিচরণের হঠাৎ ধমকে আগন্তুক হকচকিয়ে যায়। বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ওর মুখের দিকে। কুড়ুল নিয়ে ষষ্টিচরণ এগিয়ে আসে ওর দিকে কয়েক পা। হিংস্র শ্বাপদের মত তাকিয়ে থাকে চোখে চোখ রেখে। কয়েক মুহূর্ত কাটে। তারপর বলে]

থাবি চল।

[বলে আর তার কথার অপেক্ষা না করেই ঘরে চলে যায়। বিস্মিত আগন্তুক চুপ করে বসে থাকে। বাইরে মৃদু হাততালির ইশারা শোনা যায়। আগন্তুক তাকায় সেদিকে। আবার হাততালির শব্দ। সন্তর্পণে চারদিক তাকিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়। মৃদু চন্দ্রালোকিত আঙিনায় দেখা যায় আর একটি ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে। আগন্তুক সেটা লক্ষ্য করে নেমে আসে আঙিনায়। উভয়ে এক কোণে গিয়ে দাঁড়ায়।]

আগন্তুক ॥ কে সুবল ?

সুবল ॥ কেমন চলছে !

আগন্তুক ॥ ভালো ! আমাকে ওরা চিনতে পারেনি !

সুবল ॥ চেনা দিবি না !

আগন্তুক ॥ এখন না।

সুবল ॥ ইটা কিন্তুক ভালো হচ্ছে না ! শেষে—

[ঘরের ভেতর থেকে ষষ্টিচরণ বেরিয়ে আসে। আগন্তুককে দেখতে না পেয়ে তাকায় এদিক ওদিক তারপর তার দৃষ্টি পরে আঙিনার দিকে। তাড়াতাড়ি বাঁশখুটির আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। সন্তর্পণে লক্ষ্য করে ওদের। আগন্তুক আর সুবল কি কথা বলে শোনা যায় না। শুধু দেখা যায় আগন্তুক কি যেন একটা সুবলের হাতে দিল। সুবল চলে গেল সেটা নিয়ে। আগন্তুক কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে চুপ করে, তারপর ঘুরে দাওয়ায় আসে। ষষ্টিচরণ ত্বরিতগতিতে আত্মগোপন করে। দাওয়ায় উঠে কাউকে দেখতে না পেয়ে আগন্তুক ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে চলে যায়। সেই অবসরে শিকারী শ্বাপদের মত ত্রস্ত পায়ে ষষ্টিচরণ বাইরে আসে। কুড়ুল হাতে নিয়ে নেমে আসে আঙিনায়। আধো আলো আঁধারীতে দ্বিতীয়জনকে খোঁজে। পায় না। ফিরে আসে। দাওয়ায় উঠে ভাবে কিছুক্ষণ তারপর বসে ভাঙা চেয়ারে। সার্টের পকেট থেকে পচাই-এর বোতল বার করে পান করে তরল পানীয়। কুড়ুলটা তুলে নেয়। তারপর সেটার দিকে তাকিয়ে বসে থাকে।— সময় কাটে। খাওয়া সেরে রাখহরি বাইরে আসে। মুখে তার পরিতৃপ্তির হাসি।)

রাখহরি ॥ হে—হে—একেবারে বাচ্চা ! পাগোল একটা। (নেপথ্যের

উদ্দেশ্যে) আমার বিছানায় উর শুবার ব্যবস্থা করে যাও।—হে—হে—
বলে কিনা আমি ওর বাপের মত।

ষষ্টিচরণ॥ ও চোর আছে।

রাখহরি॥ চোর!—আরে না না। উ কখনো চোর নয়। না কক্ষুণো
নয়।

ষষ্টিচরণ॥ অত টাকা পয়সা.! ও কোথায় পেলো?

রাখহরি॥ চেহারা দেখে বুঝিস না উ ভদ্দরলোকের ছেলে।

ষষ্টিচরণ॥ ভদ্দরলোক! চুরি করে বনের মধ্য দিয়ে পালাচ্ছিল। ও চোর
আছে।

[আগন্তুক প্রবেশ করে]

আগন্তুক॥ কে চোর? কোথায় চোর!

রাখহরি॥ এ্যা…না এই গেরামের কথা হচ্ছে। কত চোর জুয়াচোর আছে
তার আর ঠিক কি!—তুমি ঘুমাও নাই?

আগন্তুক॥ হ্যাঁ! যাবো। (বসে। ষষ্টিচরণ ওর দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে
সরে বসে) আচ্ছা এই গ্রামের নাম কি?

রাখহরি॥ বাবুরা বলে কেয়াকুঞ্জ আমরা বলি কেজুরি।

আগন্তুক॥ বেশ সুন্দর গ্রাম।

রাখহরি॥ প্রথম তো, তাই সোন্দর লাগছে। এ গেরামের মাটিতে বিষ আছে।

আগন্তুক॥ বিষ!

রাখহরি॥ হ্যাঁ, গরীবদের জন্যে বিষ আর বাবুদের জন্যে সোনা। ক্ষেতের
ফসল ফলাবো আমরা, বাবুদের ঘরে সোনা উঠবে! পুকুরে, নদিতে
খ্যাপলা আর টানা জালে শরীল পাত করবো, মাছ লে যাবে পাইকার
মহাজন নৌকো ভর্তি করে সেই ক্যানিংই। আমাদের আছে কি?
গবমিট এসে মধু চাষ করে, সেইখানে যাও দুটি পেটভাতা ওজগার হয়।
আর আছে কি?

আগন্তুক॥ তোমাদের পাইকার মহাজন, জোতদার যারা আছে তারা কিছু দেয়
না?

রাখহরি॥ হ্যাঁ দেয় বৈকি। পচাই দেয়। খোরপোষের কবুল করে জন
খাটাতি নে যায়, তারপর পচাই আর তাড়ি খাওয়ায়। পরথমটা মিনি-
মাঙনায়, তারপর ঘটি বাটি, কুঁড়ে বন্ধকী নে! এই যে আমার কুঁড়ে

দেখছো তা সব ওই শ্রীধর বন্ধকী নে রেখেছে। আর আমারে পচাই খাইয়েছে পেটপুরে।

আগন্তুক ॥ আচ্ছা এখানে তো অনেকে সরকারের মৌ চুরি করে বাজারে বিক্রী করে। করে না?

[ষষ্টিচরণ তাকায় ওর দিকে]

রাখহরি ॥ কে ঝানে!

আগন্তুক ॥ সীমানার ওপার থেকে চোরা চালানও তো হয়—

রাখহরি ॥ কে ঝানে অতশত জানি না বাপু। তুমি যাও শোওগে যাও। কইগো ষষ্টির মা, নতুন বাবুর শোবার জায়গাটা পেতে দাও না।

আগন্তুক ॥ থাঁই! (হাই তোলে) সারাদিন ঘুরে ঘুরে বড্ড ক্লান্তি এসেছে। আর সেকী একটু হাঁটা! জলে কাদায়, খানা খন্দ ডিঙিয়ে হাঁটতিছি তো হাঁটতিছি। বিভ্রান্তি হলে যা হয়। ঘুম আসতিছে—

[উঠে দাঁড়ায় আগন্তুক। যেতে যায় এমন সময় ষষ্টিচরণ ওর পথ আগলে দাঁড়ায়।]

ষষ্টিচরণ ॥ দাঁড়াও! কে তুমি?

আগন্তুক ॥ কেন বল দিকিনি! তুমি আমাকে তখন থেকে "কে তুমি," কে তুমি" করতে লেগেছ?

ষষ্টিচরণ ॥ তুমি তো এ গাঁয়ের নতুন আমদানী!

আগন্তুক ॥ হ্যাঁ!

ষষ্টিচরণ ॥ মৌচুরি, আর সীমানায় চুরির কথা জানলে কি করে?

আগন্তুক ॥ জানলুম—শুনেছি—লোকমুখে শুনেছি!

ষষ্টিচরণ ॥ এই যে বললে বনে জঙ্গলে ঘুরেছ সারাদিন! লোকজন তুমি পালে কোথায়?

আগন্তুক ॥ লোক—ওই দু'একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছল।

ষষ্টিচরণ ॥ দু'এক জনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছিল।—

রাখহরি ॥ আহা ওরে ছেড়ে দে রে ষষ্টি! ঝাও—ঝাও—তুমি ঘুমোয় গে। ঝাও।

ষষ্টিচরণ ॥ না! (অকস্মাৎ ওর গলা চেপে ধরে।) কে তুই! বল তুই কে? না হলে তোরে আমি এই হেথায় নিকেশ করে দেবো! বল—বল।

[গলায় চাপ দেয়। দুজনে ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়। রাখহরি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে।]

রাখহরি ॥ হেই স্যাথ! হেই স্যাথ—আরে এই ষষ্ঠি, হারামজাদা, খুনেটা। ছাড়—ওরে—ছাড়—

[দ্রুত রাইমণির প্রবেশ]

রাইমণি ॥ কি হয়েছে! ওমা, বাছাটারে মারি ফ্যালল যে! এই ষষ্টি, হারামজাদা, শয়তান! (রাখহরিকে) দাঁড়ায়ে দেখছো কি ছাড়িয়ে দাওনা।

[রাখহরি দাওয়ায় গড়ান দুজনকে ছাড়াতে চেষ্টা করে। ব্যর্থ হয়। রাইমণি বাঁশের টুকরোটা নিয়ে ষষ্টিকে মারতে থাকে।]

রাইমণি ॥ ছাড়! ছাড়! হতভাগা, খুনে রাক্কস! (ওদের টানা হ্যাঁচড়া আর মারের চোটে দুজনে দুজনকে ছেড়ে দেয়। হাঁপাতে হাঁফাতে উঠে দাঁড়ায় দুজনে।) দেখেছো, দেখেছো, কি করেছে দেখেছো কপালটা!···ও খুনে ডাকাত বাবা, তুমি ওর কাছে যেওনা। যাও ঘরে যাও। তোমার শয্যা আমি বিছিয়ে দিছি।—

[হাঁফাতে হাঁফাতে আগন্তুক ভেতরে চলে যায়। ষষ্টিচরণ সেদিক দেখে, হিংস্র কণ্ঠে বলে ওঠে]

ষষ্টিচরণ ॥ শালা! (ফিরে এসে বসে! জামা দিয়ে মুখ মোছে।) আমি চিনতি পেরেছি শালারে এতক্ষণে!

রাইমণি ॥ চিনতি পেরেছিস? কে ও!

ষষ্টিচরণ ॥ থাম তুই।—(রাখহরিকে) ও শালা পুলিশের লোক।

রাইচরণ ॥ পুলিশ!!

ষষ্টিচরণ ॥ চোরা চালানের তদন্ত করতি এসেছে!

রাখহরি ॥ আমারও তাই মনে হয়।

রাইমণি ॥ কিন্তুক অমন সোন্দর ছেলেটা! আমারে মা বলে ডাকলে!

ষষ্টিচরণ ॥ তবে আর কি, অমনি গলে জল হয়ে গেলি। আর কাল ভোর বেলায়—ম্যাথন আমার হাতে দড়ি দেবে, আমারে ফাঁসিতি লটকাবে—ত্যাখন কি হবে? ত্যাখন আমারে বাঁচাবি তুই? ওর দুব দলবল আছে এই গেরামে। একটাকে আমি নিজির চোখে দেখেছি।

রাখহরি ॥ তুই দেখেছিস!

ষষ্টিচরণ ॥ হ্যাঁ! এই উঠোনেই এসেছিল। তোমরা ত্যাখন ঘরে ছিলে সেই অবসরে ও তার সঙ্গে গুজুর গুজুর করতিছেল। লোকটাকে অন্ধকারে ঠিক ঠাওর করতি পারিনি।

রাখহরি ॥ তোর জিনিসপত্তরগুলো কোথায় থুয়েছিস!

রাইমণি ॥ সে আমি রেখেছি লুকিয়ে।

রাখহরি ॥ মৌ-এর হাঁড়ীগুলো!

রাইমণি ॥ সে গোয়ালের দিকি আছে।—কিন্তক ও যদি পুলিশ হয়, তাহলে কি হবে! পাওোঃকালেই তো দলবল নে এসে বাড়ী একেবারে চষে ফেলে দেবে! ত্যাখন কি উপায় হবে!

রাখহরি ॥ এক কাজ করি। চল আমরা পালিয়ে যাই।

রাইমণি ॥ তাড়ি খেয়ে মগজে একেবারে ঘাঁটা পড়ে গেছে। পালিয়ে যাবি! কোথায় যাবি এই রেতের বেলা অত জিনিস সঙ্গে নিয়ে?

রাখহরি। তাহলে উপায়!

ষষ্টিচরণ ॥ উপায় আছে!

রাখহরি ॥ কি? [ষষ্টিচরণ আর কোন কথা না বলে কুড়ুলটা তুলে নেয়।]

ষষ্টি ॥ আছে উপায়!

রাইমণি ॥ (চীৎকার করে ওঠে) না—না—

ষষ্টিচরণ ॥ চুপ্।

রাইমণি ॥ না! ওগো তুমি সামলাও খুনেটারে!

রাখহরি ॥ কিন্তক লাস কি হবে!

ষষ্টিচরণ ॥ বস্তা বেঁধে কুমীর ডুবি নদীতে ভাসিয়ে দেবো!

রাইমণি ॥ না—না—ওগো তোমরা কি পাগোল হলে!—ও আমারে মা বলে না—না—

ষষ্টিচরণ ॥ চুপ কর! নৈলে তোরেও চুপিয়ে রেখে দেবো আজ।—সরে যা!

[ঠেলে সরিয়ে দেয়। ছিটকে পড়ে রাইমণি]

রাখহরি ॥ কিন্তক ও যদি জেগে থাকে! যদি পিস্তল থাকে ওর কাছে! পুলিশির কাছে গাদা বন্দুক থাকে আমি দেখেছি।

[ষষ্টিচরণ, রাইমণিকে টেনে তোলে]

ষষ্টিচরণ॥ তুই যা! ও ঘুমিয়েছে কি না দেখে আয়! যা! (চোখের জল মুছতে মুছতে রাইমণির প্রস্থান) খবরদার ঘুমিয়ে পড়ে থাকলি যেন জেগে না ওঠে।—

রাখহরি॥ অনেক টাকা আছে ওর কাছে! অনেক টাকা!

ষষ্টিচরণ ॥ আবার জোতজমি হবে।

রাখহরি॥ খেতি পাবো পেটপুরে!

ষষ্টিচরণ॥ রেতের অন্ধকারে এই কাজের কথা কেউ জানতি পারবে না।

রাখহরি॥ কুমীর ডুবির কুমীররা রাতারাতি পেটে পুরে ফেলবে ওর লাস

ষষ্টিচরণ॥ চাঁদ ডুববে এক্ষুণি!

রাখহরি॥ পচাই আছে?

ষষ্টিচরণ॥ এই নাও! [পকেট থেকে বোতল বার করে দেয়। হিংস্রভাবে বোতলটা আঁকড়ে ধরে রাখহরি। খানিকটা তরল আগুন ঢেলে দেয় গলায়। পাশব তৃষ্ণা মেটে। রাইমণির প্রবেশ]

ষষ্টিচরণ॥ কি হলো!

রাইমণি॥ ঘুমোয়!

[লাফিয়ে ওঠে রাখহরি]

রাখহরি॥ দে আমারে দে কুড়ুলটা।

ষষ্টিচরণ॥ তুমি যাবে!

রাখহরি॥ হ্যাঁ! এসব কাজে হাতের জোর লাগে! তুই ছেলে মানুষ, তোর হাতের জোর নাই। দে।

[কুড়ুল নিয়ে রাখহরি সন্তর্পণে দরজার কাছে যায়। ফিরে এসে বলে।]

চীৎকার দিলে ভয় পাসনি!

ষষ্টিচরণ॥ তুমি যাও! আর এক পহরের মধ্যি চাঁদ ডুবে যাবে! নিশুত হবে আন্ধা।

[রাখহরি আবার এগোয়! ফেরে দরজার কাছ থেকে]

রাখহরি॥ মুখটা বেঁধে দিলে হয়।

[ষষ্টিচরণ আড়া থেকে একটা বস্তা টেনে ছুঁড়ে দেয়]

ষষ্টিচরণ॥ এই নাও।

[বস্তাটা নিয়ে রাখহরি ঘরে চলে যায়। রাইমণি আর ষষ্টিচরণ বসে থাকে।]

রাইমণি ॥ ইটা ভাল হলনি। আমার বুকের মধ্যি যেন কেমন করতিছে।

ষষ্টিচরণ ॥ চিল্লাস না!

রাইমণি ॥ ও আমাকে মা বলে ডেকেছিল— [ফোঁপায়]

ষষ্টিচরণ ॥ কাঁদিস না বলছি।

[রাইমণি চুপ করে যায়। দুজনে বসে থাকে। সন্তর্পণে রাখহরির প্রবেশ। থরথর করে কাঁপছে লোকটা। দাওয়ায় এসে কুড়ুলটা ফেলে দেয়।]

রাইমণি ॥ কি হলো?

রাখহরি ॥ পারলুম না। ওর ঘুমন্ত মুখটা বড় সোন্দর লাগল। পারলুম না!

ষষ্টিচরণ ॥ তোমাকে পারতেই হবে!

রাখহরি ॥ না, না!

ষষ্টিচরণ ॥ কাল সকালে সব চোরাই মাল ধরে ফেলবে।

রাখহরি ॥ হ্যাঁ—

ষষ্টিচরণ ॥ ফাঁসীতে লটকাবে আমাদের—

রাখহরি ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ।

ষষ্টিচরণ ॥ ই ছাড়া আর কোন উপায় নেই। যদি জেগে ওঠে সর্বনাশ হবে! যাও!

রাখহরি ॥ পচাই! পচাই দে!

ষষ্টিচরণ ॥ পচাই নাই!

রাখহরি ॥ আমি পচাই খেয়ে আসি। এক বোতল, দু বোতল, পাঁচ বোতল। শরীলের রক্ত মাথায় তুলে আসবো! এক্ষুণি আসবো! এক্ষুণি—

[প্রায় ছুটে বেরিয়ে যায় রাখহরি। ওরা দুজনে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।]

রাইমণি ॥ আবার মাতাল হতে গেল!

ষষ্টিচরণ ॥ ভীতু!

রাইমণি ॥ ভালই হয়েছে। ওসব কাজের দরকার নাই।

ষষ্টিচরণ ॥ এক হাজার টাকা!

রাইমণি ॥ কি হবে টাকায়। কচু সেদ্ধ অনেক ভালো।

ষষ্টিচরণ ॥ কাল ওর দলবল আসবে !

রাইমণি ॥ সব মিথ্যে কথা, ওর সঙ্গে কেউ নেই !

ষষ্টিচরণ ॥ আমি নিজে চোখে দেখেছি।

রাইমণি ॥ চাঁদের আলোয় ভুল দেখেছিস !

ষষ্টিচরণ ॥ না ! ও তার সঙ্গে কথা বলেছে, তাকে একটা কি দিয়েছে।

রাইমণি ॥ দিক !

ষষ্টিচরণ ॥ না ! [উঠে পড়ে]

রাইমণি ॥ কোথায় যাচ্ছিস !

ষষ্টিচরণ ॥ আমি করবো !

রাইমণি ॥ ষষ্টি ! শোন ! ষষ্টি !

ষষ্টিচরণ ॥ চিল্লাস নি ! আজ মাথায় আমার খুন চেপেছে।

রাইমণি ॥ না—না—শোন—কথা শোন ! টাকা দেখে এদের সব মাথায় আগুন জলেছে ··আমি কি করি......

ষষ্টিচরণ ॥ সরে যা।

[কুড়ুল নিয়ে ষষ্টি এগিয়ে যায় ঘরের দিকে]

রাইমণি ॥ ষষ্টি !

ষষ্টিচরণ ॥ গোলমাল করিসনি বলছি !

রাইমণি ॥ শোন···আমাদের এখানে আসতে ওকে যদি কেউ দেখে থাকে ?

ষষ্টিচরণ ॥ কেউ দেখেনি ! ও বনের মধ্যে দিয়ে এসেছে !

রাইমণি ॥ কিন্তু ও যে বলছিল একজনের সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

ষষ্টিচরণ ॥ মিথ্যে কথা।

[এগিয়ে যায়। এমন সময় দরজা খুলে আগন্তুক বেরিয়ে আসে। ষষ্টিচরণ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। হাতের কুড়ুলটা লুকিয়ে নেয় পেছন দিকে।]

রাইমণি ॥ কে ?

ষষ্টিচরণ ॥ তুমি ঘুমোও নি !

আগন্তুক ॥ হ্যাঁ ! ঘুমুচ্ছিলুম, কিন্তু···তোমার বাবা কোথায় ?

রাইমণি ॥ ওর বাবা বাড়ী নেই !

আগন্তুক ॥ বাড়ী নেই ! এত রাত্তিরে [পকেট থেকে ঘড়ি বার করে দেখে]

ষষ্টিচরণ ॥ সোনার ঘড়ি !

রাইমণি॥ সে গেছে পচাই খেতে! রোজ যায়!

ষষ্টিচরণ॥ তাকে কি দরকার?

আগন্তুক। না—একটা কথা বলবার ছিল। (রাইমণিকে) তোমাকে বললেও চলে...কিন্তু......

রাইমণি॥ কি কথা! বল!

আগন্তুক॥ না থাক···কাল সকালেই বলবো।...

ষষ্টি চরণ॥ কাল সকাল......

আগন্তুক॥ হ্যাঁ! সকালে তোমাদের সকলের সামনে।···খুব মজার কথা...

ষষ্টিচরণ॥ হ্যাঁ, তাই বলো, কাল সকালেই কথা বলো তুমি!

রাইমণি॥ যাও বাবা, ঘুমোও গে!

আগন্তুক॥ হ্যাঁ···যাই......[দরজার দিকে এগিয়ে যায়। তারপর হঠাৎ ফিরে বলে] তোমরা ঘুমোও নি!

রাইমণি॥ আমরা গল্প করছি······

আগন্তুক॥ আচ্ছা!...কথাটা বলতে বড় সাধ হচ্ছে...না...আচ্ছা শোন...

রাইমণি॥ কি?

আগন্তুক॥ তোমরা জানতে চেয়েছিলে না, আমি কে...আচ্ছা থাক...

রাইমণি॥ বলো না...বলো না তুমি কে···

আগন্তুক॥ না থাক, কাল বলবো!

রাইমণি॥ না—না—আজ বলো···তোমার ভালো হবে—বলো—

আগন্তুক॥ বলবো বৈকি! বলবার জন্যেই তো আমি এসেছি—তবে আজ নয়—কাল—কাল সকালে—(আপন মনে) উঃ, কতদিন—কতদিন পর— [প্রস্থান]

ষষ্টিচরণ॥ ও জেগেছিল!

রাইমণি॥ আমাদের কথা শুনেছে!

ষষ্টিচরণ॥ কি জানি!···কি কথা বলতে চায় ও?

রাইমণি॥ বললে না তো!

ষষ্টিচরণ॥ কাল সকালে বলবে—কাল সকাল—

[কুড়ুলটা মুখের কাছে তুলে ধার পরীক্ষা করে।]

ওর নিশ্চয়ই কোন বদ মতলব আছে—কিন্তক—না—আর দেরী না—

রাইমণি॥ (চাপাস্বরে) ষষ্টি!

ষষ্টিচরণ॥ (চাপাস্বরে) চুপ্!

[সন্তর্পণে এগোয় দরজার কাছে। ফাঁক দিয়ে উঁকি মারে। রাইমণি অধীর উৎকণ্ঠায় তাকিয়ে থাকে ষষ্টিচরণের দিকে। ষষ্টিচরণ ফেরে রাইমণির দিকে]

রাইমনি॥ কি?

ষষ্টিচরণ॥ শুয়েছে মুড়ি দিয়ে—

[হিংস্র শার্দুলের মতো পা টিপে টিপে ঘরে ঢোকে। অধীর উৎকণ্ঠা নিয়ে স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে থাকে রাইমণি। সময় কাটে। অনেকক্ষণ কোন শব্দ পাওয়া যায় না।—তারপর একটা ধড়মড় করে আওয়াজ হয়। রাইমণি চমকে ওঠে]

রাইমণি॥ (চীৎকার করে) না—না—ও আমাকে মা বলে ডেকেছে—না ষষ্টি—ষষ্টি—ও আমাকে মা বলে ডেকেছিল—(এই সময় একটা তীব্র আর্তনাদ শোনা যায়। থেমে যায় রাইমণি। ভূতগ্রস্থ দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। কাছে এগিয়ে যেতে ভরসা পায় না। একটু পরে কুড়ুল হাতে করে ষষ্টিচরণ বেরিয়ে আসে। আরো হিংস্র দেখায় তাকে। নিজের জামা খুলে তাই দিয়ে কুড়ুলটা মোছে।)

ষষ্টিচরণ॥ ব্যস! খতম!

[রাইমণি কোন কথা বলে না। স্থাণুব মত দাঁড়িয়ে থাকে।]

শালা টিকটিকি। (কুড়ুলটা, নিজের জামাটা থলের মধ্যে ভরে বাণ্ডিল বাঁধে।) হাজার টাকা···এক হাজার...শহরে যাবো···পান বিড়ির —ব্যবসা করবো!···শালা আর এই গেরামে না! রাধিকেকে সঙ্গে নে যাবো! ওরে আমি বিয়ে করবো...দিবি নে ওর বে আমার সঙ্গে···

[ষষ্টিচরণের কোন কথার জবাব দেয় না রাইমণি।]

শালা বড় বেগ দিয়েছে! মরার সময় তোরে মা বলে ডেকেছিল···

[রাইমণি সামান্য ফুঁপিয়ে ওঠে! কিন্তু কোন কথা বলে না।]

যা! শালা! কাল কুমীরডুবি নদীতে মেছো কুমীরদের মোচ্ছব লেগে যাবে। ···উদ্ধার হয়ে যাবি তুই···

[বাইরে পদশব্দ ও কথাবার্তা শোনা যায়।

কে?

[শ্রীধর ও সুবল মাতাল রাধহরিকে নিয়ে প্রবেশ করে।]

শ্রীধর জ্যাঠা! সুবলা, তুই!

শ্রীধর॥ তোমার বাবার জ্বালায় কি আর দুদণ্ড থির হবার জো আছে, বাবা ষষ্টিচরণ! রাতবিরেতে ঘরে যেয়ে হামলা শুরু করেছে, পচাই দিতে হবে! দেখ দিকিন কাণ্ডখানা! ঝ্যাতো বোঝাই কিছুতে বোঝে না! শেষে দু'বোতল ঘরের ইষ্টক থেকে বার করে দে তবে রেহাই পাই!…ন্যাও গো রাই…তোমার গুণধর মরদকে ধর। মাথায় জল টল ঢালো…তারপর ষষ্টিচরণ তোমার খবর কি?

[অচৈতন্য রাখহরিকে দাওয়ায় শুইয়ে দেয়]

ষষ্টিচরণ॥ ভালো।

শ্রীধর॥ কাল একবার বেড়াতে বেড়াতে যেও দিকি আমার উদিকে। দুটো কথা আছে বলবার।

ষষ্টিচরণ॥ আচ্ছা!

সুবল॥ অর একজনাবে দেখছি না!

ষষ্টিচরণ॥ আর একজন…আর একজন কে?

সুবল॥ হি হি সেইটেই তো মজা।…ঘুমাচ্ছে বুঝি…কিন্তু কথাটা যে আর চেপে রাখতি পাঁরিনে…পেট যে আমার দমসম হয়ে গেল! ও কাকা, বলো না গো…আমার যে কথা ভাঙতি মানা…

শ্রীধর॥ কি গো রাইমণি, ঘরে যে ঘুমুচ্ছে তারে চিনতে পারলে!

ষষ্টিচরণ॥ কে ঘুমুচ্ছে ঘরে!

শ্রীধর॥ আজ সন্ধ্যেবেলা যে এসেছে তোমাদের ঘরে। এক হাজার টাকা আর একটা সোণার ঘড়ি সঙ্গে করে নে! বলেছে বনের মধ্যে পথ হারিয়ে তোমার ঘরে আশ্রয় চায়।

[রাইমণি পাষাণ প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে থাকে]

কথাই যে বলছো, না রাইমণি!

ষষ্টিচরণ॥ কে সে!

সুবল॥ গেরামে ঢুকতিই আমার সঙ্গে দেখা! আমি ঠিক চিনেছি। তা সন্দ করতে ত্যাখন সব খোলাখুলি বলল…

ষষ্টিচরণ॥ কি বলল…

সুবল॥ না বাবা সে আমারে দিয়ে—বাবার থানে দিব্যি গলিয়ে নিয়েছে। আমি বলবো নি! আতে একবার তাও এসেছিনু এখানে…

ষষ্টিচরণ ॥ তুই এসেছিলি সন্ধ্যের সময় !

সুবল ॥ হ্যাঁ ! এই যে এটা আমারে দিয়ে বলল, এটা নে তুই কাল সক আসিস···সবই তো বলে ফেললুম, তুমি বলনা কাকা—

শ্রীধর ॥ আমি আর কি বলবো। এতক্ষণে কি আর ওরা না জেনেছে ! তোমার ছেলে গো রাইমণি···তোমার ছেলে···

ষষ্টিচরণ ॥ কে ?

শ্রীধর ॥ তোমার ছোট ভাই ! সেই যে হারিয়ে গিয়েছিল। আসলে তা বেদের ধরে নে গেসল ! তাদের কাছ থেকে পালিয়ে শহরে গিয়ে না না জায়গায় ঘুরে ঘুরে পরে এট্টা দোকান দিয়েছে শহ ইলেকটিরিকের দোকান। সে অনেক কথা। সন্ধ্যেবেলা আম ওখানে বসে সব বলল। বললে এবাব বাবা-মাকে সঙ্গে নে যা ও অনেক টাকা আয় করে···আর, তাদের দুঃখু থাকবে না ! বল এক্ষুণি গিয়ে বল তোর মাকে। তা বললে, না। আগে বাড়ী দেখি আমারে মা চিনতে পাবে কিনা। যদি চেনে তো ভালই···অ যদি না চেনে তো কাল সকালে সব বলবো ! আমারে আর সুবোলে আসতে বলেছিল সকালে। কি গো, সব কথা বলছো না কেন ?

রাইমণি ॥ সে আমাবে মা বলে ডেকেছিল—

শ্রীধর ॥ ডাকবেই তো। তোমাব ছেলে তোমারে মা বলে ডাকবে না আর কারে ডাকবে।—তা যাই—ও বোধহয় ঘুমাচ্ছে—ঘুমাক এখন, ক সকালে সবাই আসবো। এক হাজার টাকা এনেছে সঙ্গে করে তোম ছেলে—ভোজ দেবে বলেছে আমাদেব। আয় সুবল।...বাথহরি একটু দেখো রাই— [প্রস্থান

[বাইমণি স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকে চুপ কবে। ষষ্টিচবণ মাথা নী করে দাঁড়িয়ে থাকে।]

ষষ্টিচরণ ॥ মা—

[রাইমণি নিস্পন্দ, নিথব। কাক ডাকে।]

ভোর হয়ে গেল—

[আবার হিংস্র হয়ে ওঠে ষষ্টিচরণ ! কুড়ুল আর বাণ্ডিলটা নিয়ে, হিং শ্বাপদের মত সে ছুটে বেরিয়ে যায় অঙ্গনের দিকে। মিশে যায় আব অন্ধকারের মধ্যে। বাথহরি শুয়ে আছে দাওয়ায় ! অজ্ঞান, অচৈতন্য রাইমণি একভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। ওর মুখে স্পট লাইটের আল পড়ে। থর থর করে কাঁপছে রাইমণি। শেষ-পর্যন্ত আর উদ্গত অশ্রু দমন করতে পারে না, ককিয়ে কেঁদে উঠে অচৈতন্য রাথহরির পা আছড়ে পড়ে বজ্রাহত বনস্পতির মত।]

*রূপাট ব্রুকের "লিথয়ানিয়া" নাটকের অনুসরণে

নাট্যকার পরিষদের পক্ষে রমেন লাহিড়ী কর্তৃক ১৩, নবীন
হইতে প্রকাশিত ও তৎ কর্তৃক শ্রীবাণী প্রিন্টিং ওয়া
প্রেস, কলিকাতা-৯, হইতে মুদ্রিত।